বন্দর

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়

এ ১২৫, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৯

প্রজ্ঞা প্রকাশনের পক্ষে অরূপ চট্টোপাধ্যায়, শৈবাল সরকার ও অতনু পাল কর্তৃক এ-১২৫ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০০০৭ থেকে প্রকাশিত ও নিউ রামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৩এ/২ হরি ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

দেবেশ রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের অন্য বই

যাত্রীনিবাস

বন্দর

বুড়ো জুব্বার কালো জন্তুর পালটা তাড়াতে তাড়াতে সি পি টির মাঠটা ডিঙোয়। এদিকটায় জল বৃষ্টির ঝারানিতে নিচু, মাঝখানটা উঁচু হতে হতে একেবারে উটের পিঠ। পশ্চিম দিকটা এবড়ো-খেবড়ো ঢালু। তারপর হা-হা গাঙ। বুক শুকিয়ে যায় জুব্বারের। এখান থেকে ওদিকটা একদম ফাঁকা, গভীর মহাপাতাল, মাথার উপর চড়া রোদ।

কোমরে লুঙি ঘিরে গামছাটা কাছি করে বাঁধা। গা গলা ঘামছে। গামছাটা খুলে কপাল মুখ মুছে গামছা নাড়িয়ে একবার হাওয়া খায়। তারপর মাথায় আলগা করে জড়িয়ে নিতে নিতে আকাশ দেখে বুড়ো জুব্বার। শাদা মেঘ, অনেক উঁচুতে নীলচে ছোপ, মাথার উপর গনগনে সূর্য। নীলচে ছোপে চোখ জুড়োয়। বুড়ো জুব্বার ভাবে, ওগুলো কি বে-হেস্তের পথ ঘাট!

তখন কালো জন্তুটার পিছু নেয় আরও খান তিনেক কালো জন্তু। বু-ব-বু-হু শব্দের বিশ্রী ডাকে জুব্বারের আচ্ছন্নতায় টাল ভাঙে। পাশে তাকায়। মেঠো রাস্তা ফেলে অনেকটা দূরে ওরা। রাস্তার ঢালে খাবলা খাবলা কাঁচা ঘাস। ঘাস ফেলে জন্তুটা পিঠোপিঠি আছাড় খায়। তিড়িং বিড়িং লাফিয়ে ঝট্‌কে ফেলে দেয় কালো মাদীটা। জুব্বার চেঁচায়, এই শালার পাঁঠার বাচ্চা পাঁঠারা। ফাঁকা মাঠে মাদী মদ্দার লোম ঘিরে দোজখ নেমে আসে। আচম্‌কা তেজি সূর্যটাকে ভারি মেঘের পরদা ঢেকে দেয়। খানিক ছায়া ফেলে। সাড়ে তিনশ একর জুড়ে সি পি টির মাঠে ক্ষীণ আঁধার। বুড়ো জুব্বার হাঁটে। নরকের বাচ্চা কালো পাঁঠা পাঁঠির পালটা তাড়াতে এগোয়। বুক খাঁ খাঁ ধু ধু। খানিক পথ উজোতেই মেঘ কেটে ঝলমলে রোদ। তখন গাঙ পাড়ে শাদা স্তম্ভটা রোদ মেখে ভীষণ চকচকে। একলা দাঁড়িয়ে সূর্যের মুখোমুখি। জল বৃষ্টির ধকল, রোদে তাতে পুড়েও চুপচাপ দাঁড়িয়ে দিশারা দেয় স্তম্ভটা দেশী বিদেশী জাহাজকে। গাঙের বুকে ডুবো চড়া খাদ খন্দের যা ছল ছেনালি! জাহাজ ফেলাট একটু বে-পথু হলেই একেবারে চড়ায় আটকে জখম। গাঙ তো নয় পাক্কা মেয়েমানুষ।

ঝোঁক বুঝে কাউকে বাঁধে আঁচল জড়িয়ে, নয়তো দূর দূর করে চৌ-কাঠ পার করে খটাস্ শব্দে খিল আঁটে। ঘাট গঞ্জের মেয়ে তো! জাহাজ ফেলাট তো যাবে জাহাজ ঘাটায়, এটুু এগোলে তো ওয়াটগঞ্জ। আলোর টিপ ছোপে রাতকালে সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে কলকাতা। বাছারা বড় গাঙ সাঁতরে এ গাঙে ঢুকলে একটু সাবধান। সে ঘরের বউ হোক আর পরের মেয়েছেলে হোক, হুড়োহুড়ি করলে পিছলে যাবে।

এতক্ষণ বকবক করছিলো জুব্বার একলা জাহাজ দিশারা স্তম্ভটার সঙ্গে। ইট বালি সিমেন্টের গাঁথা দিশারাটা তেরছা রোদে দাঁত ছড়িয়ে হাসে। জুব্বার মাথার গামছা খুলে কপাল গলার ঘাম মুছে সি পি টির মাঠটায় একবার চোখ বুলোয়। উত্তরে কটা নারকেল গাছ রোদে পুড়ে মুখ ঝলসে দম নিচ্ছে। ডাঁটো তাল গাছ গুলো হাওয়া পেলেই খড়খড় করে নেচে ওঠে। বাবলা খিরিসের তলায় টালি খড় ছাউনির ছায়ায় সারাগঞ্জ মৌজার শেষ ক'ঘর মানুষ। তাদের জমি-জিরেত তো সব সি পি টির থাবায়। জুব্বার একটু চমকে ওঠে। সারাগঞ্জের ওপারে খাল, খালের গা জুড়ে কেল্লার বাঁধ। বাঁধের গায়ে ফাঁকা নলের বিশাল খুঁটি। খুঁটির পাউ ভাগ করে শাদা কালো রঙ মারা। খুঁটির মগ ডগায় কপিকলে জিনিশটা উঠছে। বাঁখারি বুনে বড়ো ঝোড়া। ঝোড়ার গায়ে শাদা কালো রঙ ভাগ করে মার্কাটা!

জুব্বার ভাবে, ছি পি টির বড়ো ঝোড়া আকাশে টাঙাচ্ছে···তাহলে হঠাৎ ঝড় জল হবে না কি।

বুড়ো জুব্বার চারদিকে, শেষে আকাশের দিকে তাকায়। এক চিলতেও জলো মেঘ নেই। তবু কেন ওটা উঠলো!

ছেলেবেলা থেকে এই গাঙপাড়ে, বয়েস কাটিয়ে এই শেষের দিনগুলোও গাঙ বাদা উদোম আকাশের নিচে হাঁটা চলা, তবুও কেমন সংশয় বুকে বাজে জুব্বারের। দেখাটা কি ভুল হচ্ছে। কত রকম কলকব্জা বেরিয়েছে ঝড় জল আগাম বুঝবার জন্যে। হলেও হতে পারে। বাঁ-হাতের কুনকে ছায়ায় আর একবার আকাশ, সুর্যটাকে দেখে একলা হেসে ফেলে জুব্বার।—দুস্। রেডিও ছি পি টির আগাম খবর গুলিখোরি গপ্পো। জলের দিন আকাশ ভালো; ভালোর দিন জল ঝড় হয়।

হুট্ হাট শব্দ করতে জন্তু কটা সামনের দিকে এগোয়। চেনা পথ। উঁচু মাটির ঢিবি এবার ঢালু হয়ে গাঙের দিকে। কত মাটি যে জমে ছিল। কোথায় গেল সে সব! সব গাঙের গব্ভে। ভাবতে ভাবতে একবার ঢিবি, ঢিবিটার মাথায় আগাছার ঝোপটা দেখে জুব্বার। সেই, সেবার বার্ট কোম্পানী বড় বড় লোহার পাইপ এনেছিল। পাইপের একমুখে মানুষ সেঁধোলে হামাগুড়ি দিয়ে আর এক মুখে অনায়াসে বেরিয়ে আসতে

পারতো। ওই তো…ওই জাহাজ দিশারার গা থেকে কলতার থানা অব্দি জাহাজের হাল ঠিক জল পেতো নি। বড্ড চড়া জমে গেছিল গাঙে। তাই সি পি টি কনটাক্ট দিলো বাট কোম্পানীকে। বাট কোম্পানী বড় মাটি কাটা জাহাজ এনে গাঙের পেট থেকে মাটি ছেনে ছেনে পাইপের খোলে ঢুকিয়ে দিতো আর লোহার পাইপগুলো জুড়ে জুড়ে গাঙের তলা থেকে তলতলে কাদা উগরে দিতো হুড় হুড়িয়ে এই ফাঁকা ধানের মাঠে। আচমকা এক টুকরো মজা তাকে বেশ নাড়া দেয়। জুব্বার বড় পাইপের সঙ্গে আর একটা নতুন পাইপ জুড়ে দিচ্ছিলো তখন খানকয়েক গাঙ চেঙো উগরোনো পাঁকে কিলবিল করছে। গামছার কোঁচড়ে একটা একটা করে গাঙ চেঙো ধরে রাখছে। এদিকে পাইপ জোড় লাগানোর কাজে ঢিলে। বাট কোম্পানীর সাব কনটাকটার চেঁচিয়ে বলেছিল, এই শালা, কাজের বারোটা বাজাচ্ছো। রোজ কাটবো—

টানা ছমাস ধরে কাজ চলছে। একবার পেছনে তাকিয়ে দেখে নেয়। লোকটা ফুল প্যান্ট বুট জুতো পরে দূরে দাঁড়িয়ে, তলতলে পাঁক কাদার উপর তক্তা পাতা। তক্তায় পা হড়কালে এক কোমর কাদা। জুব্বার চেঁচিয়ে ছিলো,—না বাবু। কাজ হচ্ছে—বলে শুধু হাতুড়ি ঠুকেছে লোহার গায়ে। লোহার শব্দে প্যান্টপরা বাবু আশ্বস্ত হয়ে অন্যদিকের কাজ তদারকিতে যায়। সেই ফাঁকে মোটা মোটা চেঙো কটা কোঁচড়ে পুরেছিল। সে রাতটা জমিয়ে রান্না করেছিল বউটা। দু-থালা ভাত এক নিমেষে পোষ্কার।

বউ হাসিনা বলেছিলো, বড্ড কষ্ট না পাইপের কাজে ?

দেখে বুঝিস না ?

—তা আর না বুঝে আছি। শুলে সাড় থাকে না এক মোরগ ডাকে। পাশের লোক মরলো কি বাঁচলো খবর রাখো ?

অনুযোগে জুব্বার হেসেছিলো, গলায় ফিস ফিস আওয়াজ…তা হোক, একটু খাটাখাটুনি দিলে কটা পয়সা বেশি আসে। ভিতর বাগে বিঘে তিনেক জমি আগাম নুবো পরের সনে এক বিঘে নগদ কিনতেই হবে।

—দরকার নেই অমন রোজগেরে।

—কেন রে…

হাসিনা চুপচাপ। রাতের লম্ফো জ্বলছিলো শিস কেটে। সে রাতের ভোরে মোরগটা ডেকে ডেকে ক্লান্ত। ঘুম ভাঙে নি হাসিনার, ভাঙে নি জুব্বারের। পুব আকাশে সূর্যটা কাঁসার থালা। সি পি টির মাঠে নরম পাঁক কাদার এক পরত শুকিয়ে টান্‌টান্‌।

জাহাজ দিশারা স্তম্ভটার ছায়া এখন বেঁটেখাটো। জুব্বার দেখে, মাদীটাকে ঘিরে মদ্দা কটা ঘাস খাচ্ছে মস মস করে। গত বর্ষা জেঁকে

বসেছিল তাই ঘাসগুলো গা গতরে শাঁস মাসে ভরাট। জাহাজ দিশারার ছায়ায় বসে মাথার গামছা আলগা করে দেয় জুব্বার। গাঙের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসা ফুরফুরে হাওয়া। গলা বুক জুড়োয়। বুকের রোমকটা সির-সিরিয়ে নাচে। নাচে কুড়ি একুশের হাসিনা বুকের মধ্যে। এখন···মেয়ে মানুষটার শরীর কেমন জবুথবু। রুপোর নথের ভারে নাকের পাটা ঝুলে বড় হাঁ-ফুটো। গাঙের পাতা থেকে ডাকটা আসে, ও সাহেব—

খেয়াল করে না।

—ও মিঞা।

ঘাড় ফেরায়। বড় ডিঙিটা চোখে পড়ে নি। প্রায় দু-শো মনি ডিঙি। ডিঙির পেট বোঝাই করে নিয়েছে গাঙের কালো পলি। কোদাল চাগিয়ে চাপ চাপ করে কাটা। নোঙর গাঁথা চড়ার মাটিতে।

—আরে একবার টানবে নি? হুঁকোর জল পালটালুম যে।

—না। বিড়ি আছে গেঁটে।

—আমাদের থাকতে নেই, নাকি?

—থাক গ্যে—

—মেজাজ কেমন গরম মালুম হয়।

জুব্বার উত্তর ছাড়ে না।

—এই জন্যিই বলি, এখনও তাগদ আছে একটা নিকে করো—

বুড়ো জুব্বার খেপে যায়। গলা চড়িয়ে বলে, তুই কর না আর একটা। কোথায় হওড়া জেলায় বউ ফেলে চব্বিশ পরগনায় মাটি কাটিস বয়ে নে-যাস কলকাতায়। বউয়ের মুখ দেখা কপালে জোটে—?

ডিঙির গলুইয়ে দাঁড়িয়ে গুরুপদ। হাতে হুঁকো-কলকে। একটু ফ্যাক ফ্যাক হেসে বলে, মাইরি চাচা তোমার পাশ গাঁয়ে একটা ব্যবস্থা করো না।

—হুঁ। দু-বিয়েনে বাগদির বেধবা আছে—নিবি—?

তড়াক করে লাফ দেয় গুরুপদ। গলুই ডগ থেকে চড়ার মাটিতে, হাতে সাপটে ধরে আছে হুঁকো-কলকে। টাল সামলে দম নেয় গুরুপদ, চাচা কথা রাখতে হবে কিন্তু—

—চল না। বাগদির হাতে রোজ মাছখাবি—।
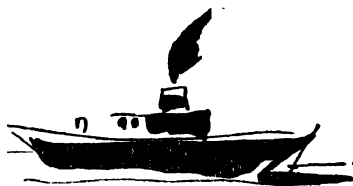
বাড়ির পিছনে পুরনো আম গাছটায় পাখি কটা কিচিরমিচির ডেকে ওঠে। এক সঙ্গে আঁতকে ওঠার শব্দ। গাছটার কোটরে নয়তো কুটোকাঠির বাসায় সাপটা মুখ বাড়িয়েছে পাখির ছানা গিলবার লোভে।

একটানা কিচিরমিচির ডাকে বিনোদ কাঞ্জির ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় একটু আড়মোড় দেয়। জানালা দিয়ে আকাশ দেখলে বুঝতে পারে, রাত কতোটা হয়েছে।

ঝটপট উঠে ঘরের কোণে টুনটুনি আলোয় বিড়িটা ধরিয়ে নেয়। প্রথমটা খুব ছোট্ট করে দম মারে। সারা রাতের শুকনো টাকরা। দু-একবার কাশে। কাশিতে শরীরটা ঝাঁকিয়ে নেয়। ঘুমটুম আলস্য সব ছুটে যায়। আর একবার টান দিয়ে ভাবলো, আজ বায়না-পত্তর সেরে আসাটা ভালো—

জামা কাপড় পরে পলিথিনের অ্যালবার্ট কাটিং জুতো জোড়াটা পরে নেয়। এখন বর্ষাটা থমকে আছে। তবুও কোথায় কখন আকাশ বেয়াড়া কাণ্ড করে বসে ঠিক নেই। টিনের সুটকেস থেকে কটা পাঁচ টাকার নোট বের করে কোঁচার খুঁটে বেঁধে নেয়। গোলগাল ফোলাফুলো মুখ, বেঁটে খাটো চেহারায় মাঝারি ভুঁড়ি, কাঁধে সাইড ব্যাগ, ব্যাগে লেডিস ছাতাটা গোছগাছ করে একবার মাথায় চিরুনি টেনে বেরোতেই মনে হয়, সাক্ষাৎ নাড়ুগোপাল।

দরজার হুড়কো খুলতেই এক চৌ-কাঠ ফ্যাকাশে ভোর। সারা শরীর জুড়ে হিমের ছোঁয়া। শাঁখা চুড়ির শব্দ, বেলাবেলি ফিরবে?

—ঠিক নেই।

—আমাদের বাজার হাট?

—শৈলেনের দোকানে খাতায় চাইলেই পাবে, বলতে বলতে চৌ-কাঠ ডিঙিয়ে বারান্দায় পা রাখে। বেরোতে গিয়ে পিছন ফিরে দেখে, বউ মেনকা তখনও দাঁড়িয়ে। বিনোদ কাঞ্জি চোখে মুখে কাজের ভার ফুটিয়ে বললো, ছামাদ এলে বোলো—তার কাজেই বেরিয়েছি। অগ্রিম কিছু চেয়ে রেখো—

উঠোনে পা ফেলে বিনোদ কাঞ্জি। শেষ রাতের ঝাপসা কাটিয়ে ভোরের আলোর আভাস।

মেটে রাস্তায় রাতের হিমে স্যাঁতসেঁতে ধুলো গোড়ালিতে নেতিয়ে আছে। গাছ-গাছালির পাতা নাতায় এক টুকরো থম মারা অপেক্ষা। একটা নতুন আলোর আশা।

নিজের মৌজা মিশড়া পার হয়ে নেপালপুরের শেষ ঘেরিতে পড়লো। তখন পুব দিকটা একদম পরিষ্কার। মানুষ চেনা যায়। মাথার কাঁচা পাকা চুল বেছে বেছে বাদ সাদ দেওয়া যায়। বিনোদ কাঞ্জি একটু জোরে পা-চালায়। সি পি টির মাঠের ধারি বেয়ে জল নিকাশি নালা-খাল। খালের চড়ায় ঝিঙে বাগান। সরু তারের জালতিতে ডগমগিয়ে লতিয়ে আছে ঝিঙে ঝোপ। জালতি ফাঁস থেকে ঝুলে আছে তরতাজা ঝিঙে। বিনোদ কাঞ্জি একটু দাঁড়িয়ে দেখে, ভাবে, বাগান বাণিজ্য নিয়ে থাকলে কেমন হয়? নিজের যে বিঘে খানেক আছে তাতে বাগান চাষ দেখালে ব্যাঙ্কের লোন ফোন পাওয়া যেতে পারে··! মনে মনে ভাবলো, আজ বায়না সেরে, কাল, কালই একবার হাজিপুর ব্যাঙ্কে যাবো—

সারাগঞ্জের বুড়ো তেঁতুল গাছ থেকে এক ঝাঁক বক সি পি টির মাঠ পেরিয়ে বিনোদের মাথা ডিঙোয়। শাদা ডানায় ভোরের রঙ, বাতাসে পাখনার শব্দ। গাঙ চড়ায় চলেছে আহারের খোঁজে। মানে দিনের শুরু। বিনোদ আর দাঁড়ায় না। পা ফেলে রামনগর মুখো—

লোহার একখানা বড় পাইপ পড়ে আছে। একমুখে জংধরে ঝরে খয়ে গেছে। বর্ষার জল নিকাশি নালার কাজ করে। সেই কবে, কতদিন আগে বাট কোম্পানীর ঝড়তি-পড়তি মাল। এখন এটা নালার মুখে পোল হয়ে বাট কোম্পানীর স্মৃতিচারক বস্তু। বিনোদ সাবধানে পা ফেলে, হিমে ভিজে জল সপসপে। পা হড়কালে তেমন কিছু নয় তবুও সাবধানে এগোয়। হলকলমির ঢল, ঝোপে জায়গাটা ঘেরা। তারপর ক্রমশ উঁচু হয়ে ছোটখাটো মাটির পাহাড়। গাঙের মাটি উগরে এই মাটির পাহাড়টা গোটা কাঁকালমেঘ মৌজাটা গিলে রেখেছে। মাটির পাহাড় ফুঁড়ে তিনখানা ঢ্যাঙা লিকলিকে নারকেল গাছ। চারপাশে বহুদূর ফাঁকা। গাছ তিনটের পাতায় সকালের হাওয়া ঝিরঝির শব্দে বাজনা তোলে। বিনোদ কাঞ্জি দেখে, গাছ তিনটের মাথায় দু-এক ফোঁটা রোদ। বুকের ভিতরটা মুচড়ে যায়! গাছগুলো সুরথ কয়ালের বাস্তু ভিটের সাক্ষী। সুরথেরা শিয়ালদা ইস্টেশনে শুয়ে ভিখ মেগে দিন কাটায় তাদের গাছপালা গলা অব্দি মাটি ঢাকা পড়ে দম নিচ্ছে। আর মানুষগুলো যে কোথায় উঠে গেছে···তাদের হাতে পোঁতা গাছ কিন্তু ঠাঁই নাড়ে নি। মানুষ শিকড় গাড়ে···! শিকড় চালায় গাছগাছালি। মাটি যার ঠিক সে কামড়ে আছে।

হলকলমির ঝোপটা একটু বাঁক নিয়েছে নিজের মতো। তাই পায়ে চলা

পথটাও ঝোপের গা ধরে এদিক ওদিক। চওড়া পাতাগুলো সকালের গাঙের হাওয়ায় মাতাল।

হঠাৎ পাতা ফুঁড়ে মুখটা ভেসে ওঠে। ক্রমশ এগিয়ে আসে, একদম হন্তদন্ত। তরন্ত গলায় হাঁক দেয়, ও কাঁজীর পো—এত সকালা?

বিনোদ চমকে ওঠে! মানুষটা অচেনা নয়, তবুও বুকের মধ্যে নাড়া খাওয়া যন্ত্রপাতিগুলো বাগে আনতে একটু সময় লাগে। তাই মুখ খুলতে দেরি হয়,—ফারসট্ কার ধরবে নাকি?

—তা আর বলতে। কটা বাজে বলো দেখি—?

—কটা আর···, বলে কবজি ওলটাতে গিয়ে দেখে ঘড়ি আনা হয় নি। বিয়েয় পাওয়া যৌতুক।

মানুষটা ঠোক্কর মারে, ওই জন্যে বলে আগে গ্যাঁটের পয়সায় অভ্যেস করতে, তা নাহলে আনাড়ি হাতে সইবে কেন?

এত সকালে গাঙের জলো হাওয়ায় মাথাটা গরম হয়ে যায়। ধমকে দেয়, দু-পয়সার লোক দু-পয়সার মতো থাকো, আট আনার বাড় ফাজলামি মানায় নে—

লোকটা একটু দাঁড়ায়,—এমন কি বললুম রে বাবা অত গরম। এমন ঠাট্টা কি আর তোমার আমার হয় নে?

—তা বলে মেজাজ মরজি টাইম জ্ঞান নেই রে তেওয়রের বেটা তেওয়র—।

দাঁত কড়মড়িয়ে চুনী পথ হাঁটে। ব্যাগের মধ্যে ব্লাডার। ব্লাডারে ছলাত ছলাৎ শব্দ। একটু বে-সামাল অবস্থায় আছে। আর এক ধাপ এগোলে মনটা বিগড়ে যাবে। ব্লাডার ঝুঁঝিয়ে চোলাইয়ের গন্ধটা বাতাসে পাক মারছে। বুকের ভেতরটা আঁকুড় পাঁকুড় করে চুনীর। বাতাসটা যদি বাঁক ধরে বিনোদের নাকের ফুটোয়, আরও দশ কথা শুনতে হবে। ফারসট্ কার ধরে ব্যাগের জিনিসটা সিরাকোলে গিরির হাতে পেঁছলে ঠিক হাত ফিরি হয়ে খড়িবেড়ের বাজারে চালান। তখন হাঁফ ছেড়ে দায় নিষ্পত্তি। দু-চার ঘণ্টা বকবকানিতে খরচ করলে আর কি?

নিজের মনে ভাবতে ভাবতে হাঁটা থামিয়ে একবার পিছনবাগে তাকায়। বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচায় চুনী—ও কাঁজীর পো, দু-জনারই কি দিনটা খারাপ যাবে?

ঘাড় ফেরায় বিনোদ।

কাঁধে সাইড ব্যাগ নাটা চেহারায় নাড়ুগোপাল। এতক্ষণে মাটির পাহাড়ের কোল বেয়ে প্রায় গলা ডিঙোনোর মুখে।

মেটে পাহাড়ের ওপারে ঢালের জমি দখল করে জনা পঁচিশেক সংসার।

চাঁদের আলোয় বউ ছেলেমেয়ে বুড়ো বাপ মায়ে কোদাল চালিয়ে বাসযোগ্য করে তুলেছে। এখন সেখানে লাউমাচা, লংকা পেঁয়াজের বাগান। একদম চুড়োয় দাঁড়িয়ে বিনোদ ডাক সাড়া দেয়, আবগারির পুলিস মোড়ের মাথায় ঘোরাঘুরি করতেছে—

চুনীর বুকটা চড়াত করে ওঠে।

আবার গাবজায় নিজের মনে চুনী, বেরোনোর সময় কত করে বললুম যতীশ আঁটাকে, দু-পাঁচ টাকার খুচরো দাও। পথ ঘাট পারাতে গেলে কত ঠেক ঠোক্কর সামলাতে হয়। শালার আঁটা বুঝ মানলো নি। নে শালা! এবার যায় যাক তোর যাবে—আমার কি? গিরি কত দরের মানুষ রক্ষে করুক সব কিছু—

বিনোদ টাল সামলে ধীরে ধীরে নামে। পায়ের গোলমাল হলেই গড়গড়িয়ে একদম ধানবাদার এবড়ো খেবড়ো ঢেলায় চামড়া চিরবে। পঁচিশ ঘর মানুষের পায়ে পায়ে সরু রাস্তা। খানিক পাহাড়ি চমক। নদী এখান থেকে স্পষ্ট। তার বুক, পেটের খোল, খোলের জল, জলে নোঙর ফেলে মেছো নৌকা, নৌকার মানুষগুলো সব পরিষ্কার দেখা যায়।

আকাশের পুব কোলে নিটোল সূর্য। মেঘের খাঁজ খন্দে সোনার গুঁড়ো। গোটা আকাশে জেল্লাদার পাথর সোনার চকমকি।

কণ্ঠি বাবলার বেড়া দু-পাশে। রাস্তাটা সরু হয়ে খান পাঁচেক ঘরের উঠোনে মুখ থুবড়ে আছে। আরও ওদিকটায় খান কুড়ি ঘর, কুড়িটা সংসার কাচ্চা-বাচ্চার মেলা। মাটির দেওয়াল দো-চালা টালি খড়ের আওতায় মানুষগুলো রোদ রাত পার করে। বিনোদের অ্যালবার্ট কাটিং জুতোয় অচেনা পায়ের শব্দ। ঘরের কাজ ফেলে বউরা দাওয়ায় বেরয়, বাচ্চারা বায়না ভুলে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে।

পাশের নিকোনো উঠোন, খড় ছাউনি ঘরটার দাওয়ার দিকে তাকিয়ে দেখে, গরমেণ্টের দোকানে রেশন কার্ড দেখিয়ে চোদ্দ টাকা দামের ডুরে শাড়ি পরে বউটা দাঁড়িয়ে। বিনোদই গুমোট কাটায়, এটা অঘোরের বাড়ি না? অঘোর আছে নাকি?

বউটা নড়ে ওঠে। আঁচল গুছিয়ে নিয়ে বলে, না। কাজে গেছে—

—কোথায়?

—নতুন রাস্তায়। পঞ্চায়েতের মাটিকাটায়।

—ও। বলে এগিয়ে যায়। অঘোরের ঘর বাড়ি পিছনে পড়ে থাকে। বিনোদ চারদিকে তাকায়, বেলা হয়েছে অনেকটা। এখানে কাজ সেরে রামনগরের দিকে তো যেতে হবে। সুতরাং একটু জোরে পা-ফেলে।

এক দুই করে প্রায় বিশ বাইশটা ঘর পার হয়। ঘরের চালে লাউ চিচিঙে

লতিয়ে এখন শুকনো, শিরা উপশিরা হয়ে জঞ্জাল। সামনের উঠোনে ছাগল গোরু আটকাতে কঞ্চি, গাঙ পাড়ের গেঁয়ো ক্যাওড়ার ডালপালায় ঘেরা বাগান বেড়া। দু-চারখানা চারা জল না পেয়ে ধুঁকছে। পোর্টট্রাস্টের বুড়ো সাহেব বলেছিল অঘোরদের, তোমরা ঘর করবে আমার তেমন সম্মতি নেই। তবে গরমেণ্টের জায়গা বুঝেসুঝে খরচখরচা করবে। তাতেও রাজি হয়েছিল অঘোররা। কাঁকাল মেঘের তলায় এই পঁচিশ ঘর। পালং ঢেঁড়শ বেগুনের ঝুড়ি মাঝে মাঝে বুড়ো সাহেবের বারান্দায়।

বুড়ো সাহেবের মেমটা বলতো, থাকনা মানুষ ক'টা। হলেই বা গরমেণ্টের জায়গা—এটাও তো ওদের বাপ ঠাকুর্দার জন্মস্থান। ভাবতে ভাবতে বিনোদ থমকে দাঁড়ায় লম্বা তিন কামরার টালি ছাউনি ঘরটার সামনে। ঘরের দাওয়ায় গোবর মাটির ন্যাতা পোঁছ দিচ্ছে মেয়েটা। হাঁটু ফাঁক দিয়ে কলাপাতা রঙের শায়া, গায়ে টকটকে লাল ব্লাউজ। ফর্সা শরীরটায় এত লাল সবুজ রঙ। বিনোদ থমমেরে দেখে খানিকটা। কনুই থেকে হাতের আঙুল অব্দি পুরুষ্টু মাংস, দু-কানে খুব অল্প সোনার রিং। ডান কানের রিঙে রোদ চিক মিকিয়ে ঝুলছে।

বাঁ দিকে ন্যাতা পোঁছ দিয়ে ডান দিকে ফিরতেই দেখে বাতাসে মানুষের গন্ধ। ঝুমরি চমকে ওঠে। একটু অবাক আর খুশির স্বরে বলে, বিনোদ কাকা তুমি? ভেতরে আসো—

বিনোদ হাসে, বউদি কোথায়?

—মা। গাঙ পাড়ে ওদের চরাতে গেল—

—এই যা, তাহলে তো কাজের বারোটা বাজলো—

ঝুমরি ন্যাতাটা পাশের গোবর বালতিতে রেখে সোজা দাঁড়ায়, আরে দুস্ তুমি ভিতরে আসো দিখি—

রাঙ চিত্তির কঞ্চির বেড়া কাটিয়ে উঠোনে ঢোকে। উঠোনময় ছোট ছোট খোঁটা পোঁতা। ছাগল নাদি ছড়িয়ে আছে, দমকা বাতাসে জন্তুগুলোর পেচ্ছাপের বিশ্রী গন্ধ। উঠোনে এখনও গোল করে ভেজা দাগ। বিনোদ উঠোনে দাঁড়িয়ে।

ঝুমরি দাওয়া থেকে লাফিয়ে নামে। বিনোদের সামনে উঠোনে ঢেউ। ঢেউ কাটে ঝুমরির গা বুকে। যেহেতু ডান হাতে গোবর কাদা, বাঁ-হাতেই টান দেয় ঝুমরি, এসো না বিনোদকাকা—। কতদিন তো এদিকটা মাড়াও নি।

—তোর মা নাহলে যে কাজের কাজ সারা হবে নি।

কথাটা শুনতে শুনতে ছোট জল চৌকিটা বের করে আনে ঝুমরি। যে দিকটায় ন্যাতা পোঁছ টেনে গেছে, দেওয়াল ঘেঁষে বসিয়ে দেয় বিনোদকে।

সারা ঘরটায় বোঁদা বোঁদা গন্ধ। ওদিকের দুটো বড়ো কামরা থেকে হাওয়া ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে গন্ধটার দমক নাকে আসে। মাসখানেক বয়েসী তিনটে চাঁদকপালী ছাগল ছানা শেষ দাওয়ায় বাঁধা। মাঝে মাঝে চেঁচায়। পাঁঠীটাকে বোধ হয় চরাতে গেছে।

ঝুমরি হাত পা ধুয়ে এসে বললো, এক গেলাস দুধ খাবে?

আঁচলে হাত মুছতে সামনে দাঁড়ায় ঝুমরি। কপালে জলের দাগ। এতক্ষণের বোঁটকা গন্ধ উবে গিয়ে ঝুমরির বাসি শরীরের গন্ধটা নাকে আরাম দেয়। চট করে না বলতে পারে না। ঝুমরিকে দেখে বিনোদ কাঞ্জি। দু-মাস আসা হয় নি এদিকটায়। মাত্র মাস দুয়েকে ঝুমরি আরো মেয়ে মানুষ হয়ে গেছে। বিনোদের চোখে চোখ পড়তেই ঝুমরি লজ্জা পায়। মনে হল, বিনোদকাকা আর কাকা নেই। অন্য কেউ।

ঝুমরি লজ্জা পেয়ে ঘরে ঢুকে যায়।

বিনোদ একলা। গোবর লেপা দাওয়া দ্রুত শুকোচ্ছে। সামনে উঠোনে ভরা রোদ। বেড়ার ওপারে আরও ফাঁকা, বাদা মাঠ। ঝুমরির গন্ধ তখনও নাকে। সিলভারের হাঁড়ি হাতার শব্দ, শব্দটা গন্ধ ছেনে নেয়। এক গেলাস জুড়োনো দুধ নিয়ে হাজির ঝুমরি। —চিনি দিয়ে ফোটানো। খেয়ে নাও। অনেকদূর হাঁটতে পারবে—

—কার সঙ্গে?

উঁ। সে—তাই তো…

বলতে গিয়েও কিছু হাতড়ে পায় না। একটু হতবুদ্ধি, বিপন্ন হয়ে পড়ে। হঠাৎ উত্তর খুঁজে পেয়ে আঁকুপাঁকু বলে—খাসি পাঁঠার সঙ্গে।

—সে তো হাঁটি, বলে দু-চোখে গোটা ঝুমরিকে দেখতে দেখতে গেলাসের দুধে প্রথম চুমুকটা মারে। পুরু করে শাদা সরটা ঠোঁটে মেখে যায়। জিভ দিয়ে চেটে বাগে এনে বললো, কই একদিনও তো বললি নি, একবার তোমার মার্কেটে নিয়ে যাবে বিনোদকাকা— ?

ঝুমরি মাথা নিচু করে বলে, মা যেতে দেবে?

—বলে দেখেছিস কক্ষুনো?

খুব আস্তে আস্তে মাথা নাড়ায়। যার অক্ষর আদল হল 'না'।

একসেরি খোলের পলকাটা মোটা কাচের গেলাস। অর্ধেকটা খেয়ে বললো, ঝুমরি আর পারতেছি কই? রাখ আর একবার খেয়ে তবে যাবো— ঝুমরি ডান হাতটা বাড়ায় গেলাস ধরতে। গেলাসটা এগিয়ে দিতে দিতে ঝুমরির ফর্সা নিটোল আঙুল, আঙুলের নখের তলায় রক্তের লালাভ রঙটা দেখে বুকের স্নায়ু শিরা চলকে ওঠে। গেলাসটা বাঁ-হাতে চালান করে খপ্ করে ডান হাতটা ধরে বললো, ঝুমরি যাবি…

—কোথায়···

—হাজিপুরে।

—কেন।

—সিনেমা তো দেখিস নি।

ঝুমরি কেঁপে ওঠে! একটু চোরা ঢোঁক গিলে বললো, হ্যাঁ দেখেছি। ইসকুলের মাঠে চট ঘিরে এক টাকার টিকিটে রাজা হরিশচন্দ্র, দাদু।

—দুস্ সে তো মাটিতে বসে। এ তো গদিমোড়া চেয়ার। ঝুমরির কোমর বুক দেখে হাতের মুঠোয় চাপ দেয় ঝুমরিকে, বসলে না কি নরম!

ঝুমরি হাসে।

শেষ দাওয়ায় ছাগল ছানা তিনটে ডেকে ওঠে। অনেকক্ষণ মাকে পায় নি। বিনোদ হাত ছেড়ে দেয়। চঙমঙিয়ে বলে, এই ঝুমরি তোর মাকে যে বড্ড দরকার—

—মা গাঙ চড়ায় ঘাস খাওয়াচ্ছে—

—কোনদিক বরাবর বল দিখি?

—ওই যে বউ ডুবেছিল যে ঘাটায়।

বিনোদ ফাঁকা গাঙ চড়ায় কোনো দিশা রাখতে পারে না। ঝুঁঝকো ভোরে কিংবা খটখটে রোদে চড়ার সব জায়গাকে একই মনে হয়। চোখে তেমন তফাত মনে হয় না। তার মধ্যে যে কোথায় শিবগঞ্জ থেকে ডিঙি বেয়ে বউ এনে মৈনানের জেলে পুত্তুর নতুন বউকে নামাতে গিয়ে সবসুদ্ধ জলে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছিল! সেই থেকে বউ ডুবুনি ঘাট নাম হয়ে গেছে জায়গাটার। চারদিক ফাঁকা, উঁচু বাঁধের পাশে শুকনো চর, শুধু ভরকোটালে জলে ডুবে কাদা হোড়।

কেমন বিপন্ন মুখটা দেখে ঝুমরি জিজ্ঞেস করে, ···বুঝতে পারছো নি জায়গাটা···

বিনোদ কোন সায় দেয় না। তখনও মনটা গাঙচড়া হাঁচাচ্ছে। সাড়া দিতে দেরি হয়ে যায়। ঝুমরি বললো, আমি যাবো— ?

খুশিতে পিছলে পড়ে বিনোদ, খুব ভালো হয়—

—তবে আসি। বলে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। দুম করে দরজাটা বন্ধ হয়। অনুমানে ভরিয়ে নেয় বিনোদ কাঞ্জি, ঝুমরি এখন কাপড় ছাড়ছে। এক ইঞ্চি কাঠের পাল্লাটা হঠাৎ কত ইঞ্চি মোটা ভারি পাথর হয়ে যে দাঁড়িয়ে পড়ল!

উঁচু বাঁধ। ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট বছর বছর টেণ্ডার দেয়। মেরামতি হয় ঠিক বর্ষার সময়। খানা খন্দ ধসের মাটি ধুয়ে যেই-কে-সেই। ধস বেয়ে পায়ে পায়ে ঢালু হয়ে নামার পথ। তর তর করে নেমে যায় ঝুমরি। পাশে গাঙ। খোলা হাওয়ায় আঁচল উড়িয়ে ঝুমরির এলো চুলে আগুন কাঁপে।

অনেকটা নিচে নেমে চরের মাটিতে পা রেখে ঝুমরি খিল খিলিয়ে হাসে, কি গো বিনোদকাকা ধরতে হবে ?

নিজের বে-মানান চেহারায় বয়েসের আশঙ্কা, ধীরে ধীরে পা ফেলে। মেদ ভারে সন্তর্পণে নামে। ঝুমরি দমিয়ে দেয় বিনোদকে। শুধু গলার জোর ফুটিয়ে বল্লে, চল না। চড়ায় দৌড়োবি ?

হেসে বেঁকেচুরে যায়।

দূরে খান তিরিশেক ছোট বড় ছাগল পাঁঠী ঘাস চিবোচ্ছে। কালো তিল আঁচিলের মতো থুপথাপ, তাদের চলা ফেরা তেমন ধরা যায় না এতদূরে। একখানা গেঁমুয়া গাছ ছায়া ফেলে এতটুকু। শাদা থান কাপড়ে মেয়ে মানুষটা ছায়ায় বসে।

ঝুমরি গলা ঝেড়ে ডাক দেয়, —ও—মা—আ—আ—

মা-ডাকটা বহুদূর ছাপিয়ে পুনরায় কানে এসে বাজে। মেয়ে মানুষটা ঘাড় ফেরায়। বুকের তন্তু কাঁপিয়ে সচকিত করে তোলে। ফাঁকা জায়গায় মা-ডাকটা বড্ড বুকে বাজে। উঠে দাঁড়ায় শাদা থান কাপড়।

—তোমার মহাজন এসেছে গো—

বিনোদ চেঁচায়, আরে কাছে চল্ না। দেখা দেখি করে সব কথা হবে—

—সব নেবে নাকি বিনোদকাকা ?

—আগে জানোয়ারগুলো চোখে দেখি।

—বেশি দেখলে বেশি দাম দিতে হবে।

—দেখার মতো হলে তো ; বটেই।

শাদা থান কাপড়ে মা এগিয়ে আসে। রোদ পড়তেই ঘামে জ্বলতে থাকে মুখটা। ব্যস্ত হয়ে বলে, তা আগে খবর দাওনি কেন ?

বিনোদ দাঁত মেলে হাসে। দু-গালের মাংস ফুলে ওঠে।—বউদি ভালো আছো তো— ?

—যা হোক আছি। কোথায় বসতে দিই গাঙ চড়ায়—

—আমি তো তোমার ঘর হয়ে আসতিছি।

—বড্ড কষ্ট হলো তো ?

—কেন ? আধসের তিন পো দুধ মেরে এলুম, কষ্ট কিসের ?

ঝুমরি দাবড়ি দেয়, মা ছায়ায় চলো দেখি।

ফাঁকা গাঙ চড়ায় গেঁমুয়া গাছটা দাঁড়িয়ে। ঝড় ঝাপটায় খান কয়েক ডাল পালা টিকে আছে। স্বল্প ছায়ায় তিনজন বসে। ফুরফুরে হাওয়া, মাঝে মাঝে রূপনারায়ণ ডিঙিয়ে দমকা হাওয়া এসে পড়ে এ গাঙে। তখন গা ঠাণ্ডা।

বিনোদ বললো, বউদি কটা মাল ছাড়বে ?

—খান দশেক তো ছাড়ার মতো হয়েছে। কত করে দেবে বলো দিখি?

—মাল দেখি, তারপর দরদস্তুর।

বউদি গায়ের কাছে চলে আসে। গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে বলে, হ্যাঁ ভাই বিনোদ, হাজিপুরে তো মাংসের দাম বত্রিশে উঠেছে। তা আমার ছানাগুলোর দাম বাড়বে নি?

—চলো না দেখি বাচ্চাগুলো।

এগিয়ে যায় দু-জনে। থিক থিক করছে নোনা ঘাস, মস মসিয়ে খাচ্ছে জন্তুগুলো। রোদে গায়ের কালো লোম জ্বলছে। বউদি খান পাঁচেক গা গতরে নধর ছাগল বাচ্চা দেখিয়ে বললো, ওই ওগুলো কেমন দর ধরবে বলো দিখি—?

বউদির মুখের দিকে তাকিয়ে একবার ছাগল কটা দেখে। পরে বলে, আর কোনগুলো দেবে?

—আগে একটার দামে পুষুক।

বিনোদের মনে একটু খটকা লাগে। কেউ তেমন বোকা নেই। দাম অপছন্দ হলে সত্যি যদি বায়না পততর ভেস্তে যায়। তাই একটু সময় নিয়ে সাত পাঁচ ভাবে। একটু ঘুরিয়ে বলে, তুমি কত চাও?

—ঘাট পোট তোমার, আমি কী আর দাম চাইবো। যেন ঠকিনি এটাই বলি।

বড় করে জিভ কাটে বিনোদ। নাটা গড়ন চেহারায় গোলগাল মুখটা কেমন চতুর মনে হয়।—ছিঃ! বউদি, তোমাকে ঠকালে আমার সইবে? একে জান খর্তাম ব্যবসা করি, এক জাহাজ পাপ তায় তোমাকে বাজার দর থেকে ঠকাবো? অতো পাপ রাখবো কোথায়?

বউদি একটু হাসে, পরক্ষণে হাতটা ধরে অনুনয় রাখে, পুরুষ মানুষটা নেই। সব তো ওই ছানা কটা বেচে। একটু ধম্মজ্ঞান করে বলিস ভাই।

একবার পিছনে তাকায় বিনোদ। গেঁমুয়া গাছের ছায়ায় ঝুমরি। হাওয়ায় আলু থালু। দু-হাতে নাক কান মলে মা কালীর নাম স্মরণ করে। শেষে বলে, বউদি তোমাদের কাছ থেকে লাভ আমি করি, তবে সামনে সাক্ষাৎ গঙ্গা ··· তোমাকে ঠকাই নি, ঠকাবো নি—

বউদি গলে যায়। বিনোদের সব কথা মন দিয়ে শোনে।

বিনোদ আস্তে আস্তে কথা ছাড়ে, তা···দুশো পাঁচ করে দর রইলো। কেজি দশেক করে কি আর রয়েট হবে?

বউদির চোখের আলো কমে যায়। দু-এক মিনিট চুপ থেকে বলে, দূর বাবু। দশ কি তেরো চোদ্দোর এক তিলও কম হবে নি।

অবহেলায় হাসি ফুটিয়ে তোলে বিনোদ।—ওই কি তেরো চোদ্দোর চেহারা?

চড়ায় চরছে জন্তুগুলো। দরদস্তুর খোলা আকাশের রোদে তাতে। ঘামছে দু-জন। বিনোদের কষ্ট হলেও তেমন অভিব্যক্তি নেই।

বউদি বললে, ছানাগুলো তো দেখলে, চলো গাছ তলার ছায়ায় কথা হবে।

—না না। কিচ্ছু হবে নে। মাঠের জন্তু মাঠে কথা হোক। কাছাকাছি একটা রোগা রোগা ছাগল দল ছাড়া হয়ে অন্যত্র ঘাস খুঁজছে। বিনোদ সট করে ছুটে যায়। ছাগলটার পেছনের ঠ্যাং খাপটে ধরে একেবারে দু-হাতে পাঁজা কোলা করে তুলে আনে বউদির সামনে।—দেখো এই তো তোমার ছানার রয়েট, জোর কেজি আষ্টেক কি নয়েক ?

বউদি সরে দাঁড়ায়।

বিনোদ সূর্যটাকে মনে মনে বলে, দেনা বাপ আর একটু কড়া রোদ। ঘামুক মেয়ে মানুষটা। সত্যি কি আজ সওদাটা বিফলে যাবে? ছামাদ শেখের দোকানে না যেতে পারলে যে টাকা পয়সা সব ঘেঁটে যাবে। ফিল্ডে অনেক কাক শকুনি নেমে গেছে। যদি ফসকে যায়। তাই একটু ভেবে চিন্তে বললো, বউদি !

—বলো।

—আমার কথা রাখবে ?

বউদির কোনো উত্তর নেই। শুধু নাটাগড়ন বিনোদকে এখন চটপটে মানুষ মনে হয়।

বিনোদ ছাগলটাকে ছেড়ে দিয়ে বলে, আর কোন গুলো ?

বউদি খুব অনিচ্ছায় আর খান চারেক ছাগলকে দেখায়।

বিনোদ চরে ঘাস খাওয়া ছাগল কটা দেখে, বউদিকে আর একবার দেখে। শেষে বললো, বউদি আর দরাদরিতে কাজ নেই। শেষ কথা, এককথা রোগা-মোটা সব মিলিয়ে গড়ে দুশ পনের হোক। রাজি তো— ?

বউদি হাসে, হাসিতে খানিক বাণিজ্য আর খানিকটা চেনা বউদির প্রশ্রয় মিশিয়ে আছে।

বিনোদ ভাবে, এই তো কাজটা হয়ে এলো মনে হচ্ছে। খুব দ্রুত পেট কাপড়ে কোঁচার খুঁটে বাঁধা পাঁচ টাকার নোটগুলো বের করে। মুঠোর মধ্যে যা ওঠে। বউদির হাতটা ধরে গুঁজে দেয়, এইগুলো রাখো। বায়না করে গেলুম—আর শলা কোন পার্টি এলে যেন নড়চড় হয় নে।

বউদির তেমন সাগ্রহ সম্মতি নেই। মেয়ে-ছেলের নরম হাতে হাতটা তখনও সেঁটে আছে। বউদি যেন অন্যকথা বলতে চায়। বিনোদ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

বউদি মুখ খোলে—ভাই আড়াইশো হলে ভাল হত। যাকগে দুশ পঁচিশ করে দিও।

বিনোদ ছিটকে ওঠে, মাইরি বউদি, এখান থেকে ভ্যান ভাড়া করে নে যাওয়া, রাস্তায় এর খরচ ওর চাঁদা পুলিসের নজরানা সব দিতে দিতে যা থাকবে, পোষাবে নে।

—ঠিক পোষাবে।

বিনোদ ঝট করে বলে, যাক একদম শেষ কথা। দুশো কুড়ি। লোকসান হয় আমার হবে। আর ভালো লাগে না।

গাঙে জোয়ার লেগেছে। নদীর চরে জলের ছোঁয়া। বাতাসটা ভিজে ভিজে। পর পর তিনখানা বোট বোঝাই খড়ের ভুর। সুদূর আবাদ থেকে খড়ের চালান যাচ্ছে কলকাতার দিকে। দু-একখানা বোট পাল তুলে কলতা থানা পেরিয়ে বজবজ আছিপুরের দিকে চলেছে। ওপারে হাওড়া জেলায় গাঙ পাড়ে ইটভাটা। একটা লরির চেহারা অস্পষ্ট। বোধহয় ইট ভাটায় ইট লোড করছে। এদিকের চড়ায় এক ঝাঁক বক, দু-চার খানা মাছ রাঙার পালকে রঙিন রোদ।

গেঁমুয়া গাছের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল ঝুমরি। এখন মাথার উপর রোদের তেজ। বিনোদ কোঁচার খুঁটে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে বলে, বউদি এবার চলি। দু-তিন দিনের মধ্যে ভ্যান নিয়ে আসবো।

—কোথায় যাবে? ঘরে?

—না। মৈনান হয়ে রামনগরের দিকে।

—সেখানেও মাল ধরতে নাকি?

—না। অন্য কাজে।

—এই ভর দুপুরে। চলো না, খেয়ে নেয়ে বেরোবে।

—এই জন্যেই বলে পুরোনো বউদি। আসি, বলে এগিয়ে যায়। আবার পিছু ফেরে, বউদি তুমি থাকলে আমি আছি।

পায়ে পায়ে অনেকটা এগিয়ে যায়। বউদি দাঁড়িয়ে দেখে একটা পুরুষ-মানুষ এগোচ্ছে।

ঝুমরি চেচাঁয় কই, আমাকে হাজিপুরে নে যাবে নে?

—বড্ড বোকা বানিয়ে দিলি তো! শালা ব্যবসা করতে তো কথার ঠিক থাকে নে। বল, কবে যাবি?

বউদির চোখে জিজ্ঞাসা। বিনোদের মুখের দিকে তাকায়, কোন উত্তর পায় না।

বরং ইঙ্গিতে দেখায় ঝুমরির দিকে। ঝুমরি হাত দিয়ে মাকে থামায়। ঝুমরি শুধু বুগ বুগ হাসে। কোনো কথা কেউ খরচ করে না।

এই রোদ্দুরে হাসি ছিটিয়ে লাগে দু-জনের চোখে মুখে। হালকা হয় বুকের মধ্যে। হালকা মনে এগোয় বিনোদ। বাঁধে ঢালু বেয়ে উপরে ওঠে।

মাথার উপর মাঝ দুপুরের সূর্য। যেহেতু নাটা গড়ন বিনোদ, তার আরও বেঁটেখাটো ছায়াটা পাশে নিয়ে গুড়গুড় করে হাঁটে।
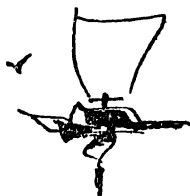
জন্ম থেকে ছেলেটার নাকের নিচের ঠোঁট কাটা। দাঁতের মাড়ি টকটকে লাল। কেরালিয়ান ফাদার নাম দিয়েছে গণেশ। ইয়ামোটা, মাথাটা আচমকা বেমানান বড়ো, পা দুটো বাঁকা বাঁকা, ফাদার ডাকে ভীম। ঢল ঢলে হাফ প্যাণ্ট পরে গণেশ ফাদারের হাত ধরে গাঙ পাড়ে বেড়াচ্ছে। বাকি জন বারো বাচ্চাদের ভীম তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। গাঙের আলগা হাওয়ায় ছেলে গুলোর কম দামি জামা উড়ছে।

লঞ্চটা ঘাটে ভিড়তেই মানুষগুলো তড়বড়িয়ে নামে। কাঠের জেটি ঢালু হয়ে একেবারে গাঙের জল ছুঁয়ে আছে। পায়ের জুতোয় জেটির কাঠে খট্‌মট্‌ শব্দ। কাঁধে ব্যাগ হাতে সুটকেস নিয়ে মেয়েটা দ্রুত হাঁটে। দুরন্ত হাওয়ায় আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে যেতেই পথের মাঝে বসে লজ্জা সামলায়।

ষোলো বছরের গণেশ আবলা স্বরে বলে, ওই যা—

ফাদার ধমক দেয়, গণেশকে ননসেন্স।

প্যাসেঞ্জারদের ভিড় দেখে পাঞ্জাবী ড্রাইভার হর্ন দেয়। বিকট আওয়াজে চারদিক চৌচির। প্যাসেঞ্জাররা জেটি থেকে গাঙের বাঁধ দ্রুত উজোয়।

অনাথ ছেলেগুলোকে নিয়ে এক পাক ঘুরে গাঙের দিকে তাকাতেই দেখে, নদীটার একটা হাত হয়ে রূপনারায়ণ নদী বেয়ে চলেছে দু-দুটো জেলা চিরে। বাঁয়ে মেদিনীপুর ডাইনে হাওড়া। সেই আদ্দিকালের পাল তোলা জাহাজ তাম্রলিপ্তে নোঙর গাঁথতে কতবার যে এইসব জল তোলপাড় করেছে। এপারের রাধাপুরের ইলিশ পাক খায় রূপনারায়ণের জলে চরানি খেতে এসে। পূর্ণিমায় চাঁদ যেন সব ঢেলে দেয় নদীর এই সন্ধি সঙ্গমে। তরল রুপো চিকমিক করে গোটা নদীটার বুকে। হঠাৎ সূর্যটা গোল, নিখুঁত গোল হয়ে ডুবে যাচ্ছে জলের মধ্যে। জলের মধ্যে লাল রঙের ছোপ যেন বিদ্ধ যীশুর ক্ষরিত রক্তের ধারা। ফাদার একটুক্ষণ চুপ থেকে অরফ্যান ছেলেগুলোকে বলে, ব্যাক।

ছেলেগুলো আব্দার জানায়, ফাদার বড় রাস্তা।

জেটির জন্যে বাঁধের ইট বিছিয়ে চলাচল রাস্তা। জেটির গা-ছুঁয়ে টিকিট-ঘর। জালতি ঘেরা জানালা। তারপাশে মোটা মোটা কাঠের গায়ে টিন চাপিয়ে জম্পেশ করে তৈরি প্যাসেঞ্জার শেড। আষাঢ় শ্রাবণে ঝড় ঝাপটায় যাত্রীদের মাথা রক্ষের জায়গা। প্যাসেঞ্জার ওয়েটিং শেডের গায়ে তক্তা মেরে হাওয়াখানা দেওয়াল, দেওয়ালে হরেক রঙের চিত্তির বিচিত্তির। টিকিট মাস্টার চা খেতে খেতে গেলাসটা নামিয়ে রেখে সসম্ভ্রমে বলে, ফাদার গুড ইভনিং।

—গুড ইভনিং। কালো চেহারায় সাদা গাউন গলায় ক্রস। একটা পবিত্রতা ছিটিয়ে আছে আর সেবার শ্রম ও আনন্দ জ্বল জ্বল করে মুখে।

টিকিট মাস্টার আবার চায়ের গেলাসটা ঠোঁটে ঠেকিয়ে ভাবে, খেরেস্টান হোক আর যাইহোক, তবু ত শালা রাস্তার ছেলে পিলেকে খাইয়ে পরিয়ে একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়ে বাঁচাচ্ছে···বাপের কাজ করছে। আর আমাদের আশ-পাশে অমন বাপ আছে।

ছেলেগুলোকে সঙ্গে নিয়ে ফাদার বিকেলের ভ্রমণ সেরে এগিয়ে চলে। মেন গেট দিয়ে 'হোম' এ ঢুকবে। হোমের সীমানায় ডাব গাছ খিরিস বকুল। লাইন্ ধরে দাঁড়িয়ে। ছিমছাম ঘন সবুজ পাতায় সুপুরি গাছগুলো সব সময় বাধ্য প্রহরীর মতো সতর্ক। ভিতরের বড় পুকুরটায় সানের ঘাট, ওপাশে কাঁচের জানালা ঘেরা পিরামিড আদলের টি. বি. স্যানাটরিয়াম। ছোট্ট ঘর, প্রচুর আলো, গাঙের বাতাসে যেন একদম জীবাণুমুক্ত মন্দির।

ফাদার হাঁটছিলো, ডান দিকের চরে কাঠের গায়ে পেরেক পোঁতার ঠক্ ঠক্ শব্দে ঘাড় ফেরায়। দেখে, এক সঙ্গে অনেক মিস্ত্রি লাগিয়ে বড় বড় মেছো ডিঙি তৈরি হচ্ছে। ফাদার থমকে দাঁড়িয়ে যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। ত্রিপল টাঙিয়ে দো-চালা ঘর করে সামনে প্রচুর তক্তা মোটা মোটা লম্বা কাঠ গুছিয়ে রাখা হয়েছে। এজাহার মোল্লা তদারকি করছে, মিস্ত্রিরা করাত চালাচ্ছে। হঠাৎ ছোকরা বি ডি ও-র মুখটা মনে পড়ল।

গেটের কাছে ঘাস পাতা পরিষ্কার করছিল সেদিন মোবারক। বড় গেট, রেলিংয়ের সঙ্গে মোটা টিন সাঁটা, একটা বেড়ালও গলে যাবার সুযোগ নেই। শুধু তলার দিকে ফুট দুয়েকের একটা ঢাকনা। মাথা নিচু করে যাতায়াত করতে হয় কষ্ট করে। 'হোম'-এর তেমন দরকার ছাড়া গেটের বড় তালা খোলা হয় না।

উলটো বল্লমের ফলার আকারে রেলিংয়ের গায়ে করোগেট টিন সেঁটে বড় গেট। কৃষ্ণচূড়া গাছটায় তখন সবুজ পাতার হিলমিলি ঠাণ্ডা ছায়া। জীপ গাড়িটা এপ্রোচ প্যাসেজে ঢুকিয়ে হর্ন টিপছিলো ড্রাইভার নিতাই। কেউ কোথাও নেই। একজন গেটম্যানও না। ছোকরা বি ডি ও সিট থেকে

নেমে দরজা ঝাঁকিয়ে শব্দ করে। ঘাস পাতা পরিষ্কার করতে করতে মোবারক নিড়ানি হাতে এসে দু-ফুট ফাটক থেকে মুখ বাড়ায়, কাকে চাইছেন?

বি ডি ও বলেছিল, একটু ভেতরে যাবো—

—কোথ্ থিকে আসতেছেন বাবু?

—ফাদারকে বলো।—বি ডি ও।

ঝকমকে মেঝেয় আরাম কেদারা পেতে চা খাচ্ছিলেন ফাদার। কত স্বল্প বাসন কোসনে পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন। অয়েল পেণ্টিংয়ে নিরাসক্ত চেহারায় ক্রসবিদ্ধ যীশু। ছবির গাছটায় দু-একখানা পাতা খসে পড়ছে তখনও।

অরফ্যান ছেলেদের কুঠির বারান্দায় অন্ধ ছেলেটা ভায়লিনের তারে সুর জাগাচ্ছে।

—বলুন, সামনের বেতের চেয়ারে বসিয়ে বি ডি ও সাহেবকে পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন ফাদার।

—একটা ইন্সপেকশনে এসে···তখন থেকেই ভেতরে ঢোকার লোভ হয়েছিল।

—ইন্সপেকশন···। হোমে···?

—না। নদীর ফিশারমেনদের লোন, মেকানাইজড্ বোট এইসব দিয়ে মোর ফিশিং, ডিপার সি-ফিশিং—এই সব এনক্যুয়িরি আর কি। ফাদার হাসেন। কালো চেহারা ঝক ঝকে শাদা দাঁত। ঢিলে ঢালা গাউন, কোমরের নট-টা তখন খুব আলগা। হাসতে হাসতে ফাদার বলেন, আমরা অনেক আগে রিভারিয়ান গির্জা থেকে নৌকো জাল ফিশারমেনদের দু-একখানা করে দিয়েছি—দেখেছি প্রথম প্রথম ভালো মাছ ধরে, বাজারে বিক্রি করে—তারপরে নৌকো অকেজো পড়ে থাকে।

বি ডি ও হামলে জিজ্ঞেস করে, কারণটা কি?

ফাদার মৃদু হেসে বলেন, আপনিও বুঝতে পারবেন। কিছুদিন যাক—

—তবু আপনার অভিজ্ঞতা বলুন না—

—বোরডম। এক ঘেয়েমি। কতদিন আর নদীতে থাকতে ভালো লাগে। শহরের মজায় আটকে গেছে।

গেটের রাস্তায় কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে বিকেল ফুরিয়ে ছায়া। অন্ধকারের ছায়া। অরফ্যান ছেলেগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছেন ফাদার। বড় রাস্তায় প্যাসেঞ্জারি বাস থেকে ইলেকট্রিক হর্নের ভয়ঙ্কর আওয়াজ। সন্ধের ট্রিপের বাসটা এখনই ছেড়ে দেবে। সব কটা ছেলেকে গেটের মধ্যে ঢুকিয়ে শেষে ঢুকলেন ফাদার।

সমস্ত চরাচর জুড়ে কালো পর্দাটা আস্তে আস্তে নামছে। আর একটু পরে সব আঁধারে ঢেকে যাবে। দিনের শেষ রেশটুকু মুছতে আরম্ভ করেছে। লঞ্চঘাটার জেটি, জেটির গায়ে কাঠের খুঁটি সোজা উঠে দু-পাশের রেলিং, টিকিট ঘরের জালতি খোপ আর চোখে পড়ছে না। ফাদারের অরফ্যান হোমের গাছপালার মাথায় অন্ধকার চাপ চাপ জমে।

জেটি থেকে বেরোনোর মুখে বাঁ দিকের চ্যাটালো জায়গাটায় তক্তপোষের সঙ্গে চারখানা খুঁটি বাড়িয়ে কেরোসিন সরষের তেলের টিন সেঁটে আলকাতরা মাখানো গুমটি। পান বিড়ি বিস্কুট মুড়ি নিয়ে চা-দোকান।

দোকানদার কালোসোনা বসে বসে জাঁতিতে সুপুরি কুচোচ্ছে। সামনের বেঞ্চে এজাহার মোল্লা গায়ের গেঞ্জি খুলে বারে বারে বুক ভুঁড়ির উপর জমা ঘাম গেঞ্জিটা দিয়ে মুছতে মুছতে নদীর দিকে তাকায়। দোকানের হ্যারিকেনের দম কমানো আলোয় কালোসোনার মুখটা অস্পষ্ট দেখে এজাহার। এজাহারকে দেখতে পায় না কালোসোনা। শুধু ঘাম চোবানো গেঞ্জিটার বোটকা গন্ধ হাওয়ায় ঝলক মারে। বিরক্তিতে এজাহারের মুখ হড়কায়, শালা নগেন ওপারে কি মাগি পটিতে ঢুকলো নাকি কে-জানে ?

কালোসোনা হাতের সুপুরিটা খুটুস করে কেটে নিয়ে বললো, পটিতে না ঢুকুক ঘাটের চালায় যেতে পারে।

এজাহার ঘ্যাস ঘ্যাস করে পিঠ চুলকোলো বার কয়েক। ঠিক আরাম পাচ্ছে না। স্বস্তি হচ্ছে না। এজাহার বললো, কালো জাঁতিটা রাখ। একটা পাঁচ নয়ায় পিঠটা দে-দেখি—

মোটা চেহারায় কালো পিঠে এক ফালি সেলাই করা মাংস ঢিবি। লঞ্চঘাটায় ভিন দেশী মালিক লঞ্চ চালাবে বলে সব ঠিক ঠাক। তখন এজাহারই লাঠি নিয়ে তেড়ে গেছিল সারেঙকে। সারেঙ ছিলো বর্ধমানের আগুরি। হাতের কাছে লোহার রডে দিয়েছিল মরণ ঘা। তারপর পেটাপিটি। এজাহার কাটা পিঠে গাঙে পড়ে তড়পাচ্ছিলো। নোনা জলে পিঠে জ্বালা। ঘোলা জলে খানিক লাল। তারপর হাসপাতাল। হাসপাতাল ফেরত ঘাটে দাঁড়াতেই দিশি মালিক মুরগি মেরে বলেছিল, দোস্ত তুমি সাত

পীরের এক পীর। তোমার দয়ায় মানুষ পার করে ভাত পাচ্ছি—পয়সাটা দিয়ে জায়গাটা ঘষে ঘষে চুলকে দেয়। আরামে আয়েসী মুখটা বেঁকে চুরে যায়। তখন কালোসোনা কথাটা জপতে থাকে, বললুম, চাচা—নগেনের সঙ্গে কাঠকুটো আনতে আমাকেও জুতে দাও—

এজাহার পিঠটা বেঁকিয়ে চুলকুনি সয়ে বললো, দু-পয়সা হোক আর এক পয়সা হোক, দোকানটা তো, তোর— ?

হাতের আঙুলে নয়া পয়সার চাপটা জোর হারিয়ে ফেলে। এজাহার ধমকায়, দোকানটায় ঝাঁপ ফেলে কাঠ বইতে গেলে ত তোর দোকান জব্দ হয়ে যেত—

—তা খারাপ বল নি।

—তবে ? বড় জোর দু-মাসে ডিঙি তৈরি হয়ে যাবে। তারপর ?

—মাত্র দু-মাস ?

—তা না তো কি ? খেলা ? বাহান্নখানা ডিঙি বাহাত্তর দিন টাইম দেছে। গরমেণ্টের আই আর ডি পির টাকা—টাইমের মধ্যে কাজ করে খরচ ভজাতে হবে, না হলে সব টাকা বেবাক ফিরে যাবে—

—তাহলে তো ভালো। লোক বাড়াও কাজ উঠবে—

এজাহার দাবড়ি মারে, দূর বাঁদর। চল তোকে কলকাতায় মুন্ত্রীর চিয়ারে বসিয়ে দিই।

পাঁচ নয়ার এলোপাথাড়ি টানা হেঁচড়া থমকে যায়। পিঠের ঘামাচি চিড় বিড়িয়ে ওঠে। এজাহার বোঝায়, আরে মিস্ত্রি দেখ দিকি, আরও ডিঙির মিস্ত্রি দরকার—তোকে হেল্পার করে দোবো খোন।

বাস রাস্তার ওপাশে ভাঙা বাংলোর ডাঙায় হঠাৎ আলোর ঝলক। হ্যাজাক জ্বলছে। করাতের শব্দ কানে আসতেই ঘাড় ফেরায় এজাহার। ধারালো করাতের দাঁড়ায় আলোর চকমকি। ফুরোনে কাজ তুলছে জটাধারি ছুতোর।

ঘন অন্ধকার। নদীর জলে টান। কুচো ঢেউ তির তির করে বয়ে চলেছে দক্ষিণের চুম্বকটানে। সমুদ্রের পেট খালি, জল টানছে শুধু জল। পাতালের পিপাসা গহীন সমুদ্দুরের বুকে।

ঘাটের জেটিতে লোহা লক্কড়ের পিলারে জল কাটার শব্দ। বড় ডিঙির গলুই এগোতেই দু-হাতে ধরে ধাক্কা সামাল দিয়ে হাঁক মারে, —লগিটা মাররে—লগি—মার—

কথাবার্তার আওয়াজ কানে আসতেই এজাহার বলে, থাম দিকি—

কালোসোনা এক ছুটে জেটির কাঠ পাড়ায়। দুপ দাপ শব্দ। হাঁক মারে—কে গো ? নগেনদা—

মোটা মোট তক্তা লংপিস কাঠ গোড়ে ভর্তি ডিঙি। হিমসিম খাচ্ছে বাগে আনতে, বিরক্ত হয়ে বলে, তোর ঠাকুর্দারে শালা।

কালোসোনা উলটো মুখে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয়, ও চা-চা-আ নগেন এসেছে গো—

লম্বা চওড়া এজাহার ভুঁড়িতে গাঙের হাওয়া লাগাতে লাগাতে দুশ্চিন্তা ধুয়ে ফেলে এগিয়ে আসে জেটির দিকে। নগেনের কাছাকাছি এসে চারদিক সমঝে নিয়ে বলে, এত দেরি করলি?

—আর বলো কেন—

—কি হ'ল আবার··· !

—শুধু চিঠি চালানে যদি কাজ হ'ত তাহলে মন্ত্রী ম্যাজিস্টেররা হিল্লি দিল্লি লণ্ডন আফ্রিকায় উড়োজাহাজে করে যেতু নি—

এজাহার অন্ধকারে দু-চোখ চালিয়ে আন্দাজ নেয়, ডিঙিটা কাঠ তক্তায় ভারি। নগেনের সঙ্গে দাঁড়ি মাঝি লোকজন বেশ ক্লান্ত। সকলে একটু জুড়িয়ে গেলে এজাহার কৃতজ্ঞতা আর মমতা মিশিয়ে বললো, ব্যাপার কিরে নগেন?

—কাঠ গোলায় ম্যাসিন চালাবার লোক নেই। লেবাররা হাত গুটিয়ে বসে।

—এঁ্যা! যেন শোনা যাচ্ছে না সেরকম জিজ্ঞাসা, নাকি ব্যাপারটা ধরতে পারছে না, বোঝা গেল না।

—আগো ইলেট্রিক করাতে কাঠ চেলাই করতে গে অবনীর কব্জি দু-ফালা। হাসপাতাল বলেছে কলকাতায় নে-যাতে।

—হঁ্যা। অমন এ্যাকসিডেন কি দেশের হাসপাতালে হয়?

নগেন বলে, গোলাওলা থোক তিন হাজার টাকা ধরে দিতে চায়, লেবাররা বলেছে, উঁহু। ডাক্তার ওষুধ খরচ দিতে হবে, যদ্দিন না অবনী কাজেজুয়েন দেয় মজুরি সমান টাকা দিয়ে যেতে হবে অবনীর সংসার বাঁচাতে—

—অ। বেশ গোলমাল। মাল আনতে বড্ড ধকল গেল তোদের—

নগেন একগাল হাসে। বলে—ধকল। নিজেরা বওয়া ছওয়া করে লাট থেকে মাল নামাই। টানাটানি করে ডিঙিতে তুললুম—নেহাত গরমেন্টের জিনিস বলে হাতে পায়ে ধরে লেবার সামলাই—

এজাহার খুশি হয়ে বলে, নে তোরা সক্কলে হেবলো ময়রার দোকানে চলে আয়। পেটভরে মিষ্টি খাবি—

গোটা ডিঙি আনন্দে নেচে ওঠে। নগেনদের শুকনো টাকরায় জল সরে। দু-মাড়ির ধারি বেয়ে নোলার রস সুড়ুত করে গিলে নিয়ে নগেন বললো,—আচ্ছা সব গুছিয়ে নিই।

জেটির পিলারে কচি কচি গাঙ শামুক লেপ্টে আছে। জল খেয়ে খেয়ে শ্যাওলা। মোটা কাছির বেড় দিতে গিয়ে একটু চির চিরে জ্বালা। আঙুলের ডগাটা ছড়ে গেছে। তারপরই নগেন মন দিয়ে কাছিটা বাঁধা ছাঁদা করে। ওদিকে নোঙর ছোঁড়ে গয়ারাম। গাঙের জলে ঝপাং শব্দ। মাথা নিচু করে হাঁক মারে নগেন—কিরে কেউ হড়কালি ?

—না গো মামা।

—সামলে—হেবলোর রসগোল্লা শালপাতার ঠোঙায় রস সরকাচ্ছেরে বাপ।

—নগেনদা···

খেয়াল করে নি নগেন বর।

—ও নগেনদা।

স্বরটা পুরোনো, তবে চেনা। খুব চেনা। কাছিতে শেষ গিরোটা মেরে ঘাড় তোলে নগেন। কাজের চাপে চোখ ধোঁয়া। অন্ধকারে জেটির পাটায় মূর্তিটা ছায়া ছায়া। চমকায় না, বরং হাতড়ায় মনের মধ্যে, কে হতে পারে! এই এত রাতে! ভালো করে তাকাতে আন্দাজ নেয়, ছায়াটা বেঁটে খাঁটো, নাটা গড়ন। কাঁধে একখানা সাইড ব্যাগ, হাওয়ায় ভুঁড়িটা চোখে লাগে। কে বলো দিখি···?

—আরে বিনোদ।

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নগেন বলে, হড়কে গেছিলো আর কি। কাঞ্জির-পো বলতে গে থেমে গেলুম।

—আমি তো ঘেবড়ে গেছি।

—ঘেবড়োবে কোন দুঃখে? এতদিনের কাজ কারবার তোমার আমার। তা ভাই ভালো? আমার খারাপ খবর নেই তো—

—দুস্।

—চল্। একটু মিষ্টি মুখে দিই দু-ভায়ে।

জেটির পাতা কাঠে এক পা এক পা করে ফেলে বিনোদ। একটু থমকে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে। রাত ক্রমশ ভারির দিকে। ভাবে, কথাটা এখন বলবো, নাকি সারাদিনের খাটা খাটুনি একটু জিরিয়ে নিক, তারপর। ওদিকে তাকাতেই বিনোদ দেখে, টিকিটঘর ফাঁকা। হঠাৎ বিনোদের মনে হল, আরে ফাস্ট কেলাস জায়গা তো! কেন আর মাথায় বিপদ নিয়ে এতরাতে ঘরে ফিরি। তার চেয়ে প্যাসেঞ্জার শেডে বেঞ্চি জুড়ে রাতটা দিব্যি কেটে যাবে।

পাশাপাশি হাঁটে নগেন বর। কিছুটা আনমনা, সেঁধিয়ে যায় নিজের মধ্যে! হঠাৎ বিনোদ এত বে-টাইমে!

—নগেনদা।

—বলো।

—আমার ঝাড়ের প'চিশখানা দিলুম আর ক্ষিতি বাঁড়ুজ্যের এক'শ খানা পাকা বাঁশ নিয়ে সেই যে হাওড়ায় চালান পাঠালে আর তো দেখা করলে নে। আমারটা না হয় পরে দিলে কিন্তু ক্ষিতি বাঁড়ুজ্যে যে ছিঁড়ে খেলো—

জেটির শেষ কাঠ ডিঙিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় নগেন বর। —তোমাকে ছিঁড়ে খাবে কেন? খেতে গেলে আমাকেই খাক—

—বাঁড়ুজ্যেকে মাত্র পঞ্চাশ টাকা ঠেকিয়ে বারোশ টাকার মাল—তা আমি জামিন ছিলুম,—নাকি?

একটু গলা চড়িয়ে নগেন বললো, আমি কি ঘর সংসার তুলে দেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি, নাকি?

—ও কথা কেউ বলেছে? শুধু বাঁড়ুজ্যের দাবি, বিনোদ তোমার দেখতা নগেনকে ঝাড়ের বাঁশ ছেড়েছি—তুমি যে করে হোক টাকা কটা পাইয়ে দাও। মেয়ের বিয়ের দেখাশোনা হচ্ছে—

নগেনের চোখের ঘোর কেটে চক চক করে।—তো এক গণ্ডা মেয়ে। কোনটার দেখাশোনা?

—মেজটার।

—সে কি! মেজটাকে তো বড় ভগ্নিপতির ডেরায় তুলে দিলে পারে। বে-দিলে ঘর করবে? যা পিরিত শালি ভগ্নিপতির—। আচ্ছা এত ঘন ঘন শ্বশুরবাড়ি রাত কাটিয়ে যায়, মেজটার দিদি কিছু বলে নে?

—জামাইয়ের পয়সা থাকলে শাউড়ি অব্দি জমে দই হতে চায় গো ভাই—, বলে নাটাগড়ন দেহটা দু-একবার টোল খায়।

—সে আর বলতে?

দু-শেল্ফের ছোট্ট শো-কেস। সামনে পুরানো কাঁচে ধোঁয়ার কষ। সিলভারের গামলায় শুকনো জিলিপি, চিনির রসে ডুবিয়ে ময়দার গজা। একটু লালচে রঙের রসগোল্লা হাবুডুবু। দোকানের ভিতরে দম বাড়ানো হ্যারিকেনের আলোয় দাঁড়ি চারজনের মুখ দেখতে পায় নগেন বর। সিলভারের পাতলা ডিশে গণ্ডাকয়েক রসগোল্লা গপ্‌গপ্‌ গিলছে।

এজাহার শুখনো জিলিপি চিবোচ্ছে মৌজ করে। ষণ্ডামার্কা চেহারায় চওড়া কাঁধে আধময়লা সাদা গেঞ্জিটা নেতিয়ে পড়ে আছে। কালো কাঁধে সাদা গেঞ্জিটা দারুণ কটকটে।

বিনোদ বললো—যাও নগেনদা। আমি দাঁড়াই।

—আরে দুস্‌। তুইও চল।

—কে রে—? নগেন? এত দেরি—, হুংকারের মতো সম্বোধনটা ছুটে এসে কানে লাগে।

নগেন হেবলো ময়রার দোকানে ঢুকে চারদিকটা দেখে নেয় একবার। দাঁড়ি ছোকরা-কটার খিদের আগুনে কখানা রসগোল্লা পুড়ে ছাই। ডিশের মিষ্টি রস চেটে চেটে খাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে।

এজাহার কোন রা কাটে না। বরং এক মনে জিলিপি কটা একটু একটু করে চিবোচ্ছে তো চিবোচ্ছে—।

—ময়রা আমাকে যা দেবার শালপাতায় দে-দাও।

এজাহার ঘাড় ফেরায়। অবাক হয়ে বলে, সে কি! বসে খাবি নি?

—না। আমার এক দোস্তো আছে।

—কে? ডাক না—

—বিনোদ, মিশড়ার বিনোদ।

এজাহার তখনও ধাতে আসে না। গোটা মিশড়ার চেনা মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তবুও যে কে বিনোদ···

—আ গো বিনোদ, শরৎ কাঞ্জির নাতি।

এজাহার গাল ফুলিয়ে হাসে। বিশাল ভুঁড়িটা নেচে নেচে ওঠে। —ও তাই বল! ছাগল পাঁঠার বিনোদ মানে বিনোদ পাঁঠা—। হাসির দমক থামলে এজাহার বলে, তা সে কই? ডাক না তাকে—

দোকানের ভিতর থেকে কথাটা স্পষ্ট তার কানে যেতেই বিনোদ, 'পাঁঠা' পদবীতে চোট খায়। নগেন হাঁক দেয়— কইর‍্যো— বিনোদ ভাই-ই—

—না। আমি কাজে যাবো—

এজাহার কালো চেহারাটা নিয়ে ময়রার তক্তপোশে উঠে দাঁড়ায়। —কইরে শালাটার বড্ড মান হয়েছে, বলে সোজা দাঁড়াতেই দোকানের নিচু আড়কাঠের হোগলায় মাথা লেগে যায়। তখন ঝর ঝর করে পুরোনো ধুলো ঝুল মাথায় চোখে পড়ে। খেপে গিয়ে বলে, এই হেবলো শালা বিনোদের জন্যে দু-গণ্ডা ধরে দে—। শালার গাঁয়ের লোক আমাকে এজাহার মোষ বলে ডাকে। দু-পাঁচটা গাঁ এক ডাকে চেনে। শালা কত বিনোদ ছড়া-ছড়ি তার ঠিক নেই। বিনোদ পাঁঠা বললে কি তোর বাপ ঠাকুর্দার দরকার হয় রে—। এক ডাকে চিনে নেবে। শালা তুইও মহাপুরুষ আমিও মহাপুরুষ। আয় বুকে বুক ঠেকাই—

দোকানের ওপার থেকে ফুট কাটে বিনোদ, এজাহারদা—মোষের শিং যে বড্ড বাঁকা। চোখে গেঁথে যায় যদি—

হুরুষে চেঁচিয়ে ওঠে এজাহার, শালা পাঁঠার শিং না বাঁকা রড। তিড়িং তিড়িং গায়ে উঠিস, পাঁঠির চোখ ঠিক থাকে তো? গোটা দোকানঘর হেসে ওঠে।

ব্রিটিশ আমলে কোন সাহেবের জন্যে তাড়াহুড়ো করে একটা ছোট্ট বাংলো

বানিয়েছিল সাহেবরা। সাহেব অফিসার গাঙের বাঁধ বাঁধাই কাজ দেখবে, তদারকি করবে। বড্ড ফাঁকা জায়গা তাই বাংলোটা জরুরি ছিল। বাংলো বাড়ি ঘর সব ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। দরজা জানালা ইট কাঠ একদম সাফ। কোনো খেনো বড়লোকের বৈঠকখানায়। রঙ চাপিয়ে ব্রিটিশ গন্ধ উপে গেছে। শুধু গেটের দু-খানা পিলার, পিলারের গায়ে হুক চারটে এত জল হাওয়ায় যে কী করে এখনও ঠিক আছে সেটা নগেন ভেবে পায় না। তখনকার লোহা-লক্কড় এত টেকসই! একদম জং আসে না! আর এখন বছরখানেক আগে ডিঙির কাঠ জুড়তে যে রাবিট পেরেক লাগালুম সে শালা জং ধরে আবার ডিঙির কাঠ ফাঁক হয়ে যাচ্ছে! তুলোর গুঁজ না দিলে এ বর্ষায় ডিঙি চালানো দায়। মাঝ গাঙে জল লিক করে ডিঙি ডুবিয়ে না ছাড়ে!

বাংলো বাড়ির পোড়ো ডাঙা। ডাঙায় খান ত্রিশেক ডিঙির কাঠামো। বাঁকা কাঠ জুড়ে জুড়ে খোল বানানো হচ্ছে। আশেপাশে চাঁচা কাঠের ভুষিছালি এক জায়গায় জড়ো করে উনুনে কাঠ চোকলা ঠুসে ঠুসে জ্বালানি করে রান্না চাপিয়েছে মিস্ত্রিদের লোকজন।

বিনোদ বললো, এই তো এইটুকুনি করে ডিঙি মাঝ সমুদ্দুরে মাছ মারতে গে নিজেরা না মরে—

নগেন ঘাড় ফিরিয়ে বললো, নারে। পঁচিশ ঘোড়া ইঞ্জিন ফিট করবে। তাতে আর ভয় কি?

—পঁচিশ ঘোড়া! একটু অবাক হয় বিনোদ। পরে বলে, ছ-সাত ঘোড়ায় তো জল ছ্যাঁচে আলো জ্বালায়—

—আবার কি। এ ডিঙিতে বরফ কেবিন থাকবে। মাছ আর পচবে নি—

—ওফ্। বড্ড কলের ডিঙি তো।

—কল বলে কল। গরমেন্টের মহাকল, খিক্‌খিকিয়ে হাসে নগেন। সাত-আট জনের কো-অপারেটিভ ডিঙি।

—ওহ্। সাত আট ভাগারি।

নগেন আরও হালকাভাবে বলে, সাত-আট ভাতারি—

হাসে দু-জনে। চারদিকে অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। এখন চুপচাপ দু-জনে। পাশাপাশি হাঁটছে বিনোদ। শাল পাতার ঠোঙাটা নগেনের হাতে। মিষ্টির রস ঝরছে মাঝে মাঝে। হাত পালটাই করতে একটু খড় খড় শব্দ। গাছপালায় হাওয়া গেলে অন্ধকারে ঢেউ।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর বিনোদ বললো, কোথায় নে যাবে গো নগেনদা?

—চল না আর একটু। হোলির ঘরে—আরে আমার খুড়তুতো শালির বাড়ি। দু-চার পা হাঁটতে হাঁটতে একটু থমকে যায়, হ্যাঁরে বিনোদ।

—উঃ।

কাছে আসে নগেন। কানের কাছে মুখ এনে বলে, সাত-আট ভাতারি ভাত পায়—

বিনোদ আচমকা কথাটায় ঢুকতে পারে না। ফলে বুঝতেও পারে না, কী কথার ফেরে কোন কথা। সুতরাং কিছু উত্তর না দিয়ে বরং জিজ্ঞেস করে, আর কতদূর? রাত অনেক যে…

—আরে সে জন্যেই তো আসা। তা নাহলে কোথায় থাকবি এই গাঙপাড়ে?

কোনো উত্তর করে না বিনোদ। বরং ভাবে, নগেনকে ধরতে এসে এত রাত। মিশড়ায় ফেরা বহুত ঝামেলা। সুতরাং নগেন, নগেনের ব্যবস্থা ছাড়া আপাতত কোন উপায় নেই। তবুও বললো, নগেনদা ক্ষিতি বাঁড়ুজ্যের ব্যাপারে কী ভাবলে?

নগেন ঘাড় না ফিরিয়ে গম্ভীর গলায় বলে, তোর যেমন ভাবনা, তার চেয়ে আমার কী কম— ?

—তা তো নিশ্চয়ই। তবু ফিরে গে ক্ষিতি বাঁড়ুজ্যেকে কী বলবো—?

এবার হাঁটা থামিয়ে পিছন ফেরে। চারদিকে ঘন অন্ধকার। নতুন মাটি ফেলে উঁচু পথ। নগেন গলায় মিনতি ঝরিয়ে বলে, এই কটা দিন সবুর করতে বল। গরমেন্টের ট্রলার তৈরি কাঠ কটা বয়ে ফেলি, এজাহারের কাছ থেকে পেলেই এক দফে শোধ করে তবে জল খাবো—

কথাটা শুনে তবে পা ফেলে বিনোদ। পথ চলতে চলতে ভাবে, কই আমার টাকা কটা… ! একবার ভাবলো, বলে ফেলবো, হঠাৎ সেলাই মেশিনের ঘ্যার ঘ্যার শব্দ। চমকে ওঠে! একটা চারচালা খোড়ো বাড়ি থেকে শব্দটা বেরিয়ে আসছে। ছোট্ট জানালা থেকে চকচকে করে মোছা কাচের আলো গড়িয়ে পড়েছে। সেলাই মেশিনের দ্রুত শব্দ বাড়িটার নির্জনতা ভেঙে অবসন্ন চরাচরে একটু আলাদা, অন্যরকম।

—কার ঘর নগেনদা?

—ওটাই তো।

—এসে গেছি!

—আবার কি? বেশ প্রত্যয়ে গভীর নগেন বর।

ঘন করে গোবর কাদায় লেপামোছা ঝকঝকে দাওয়া দেওয়াল। নিচু চালায় ঝুল ঝালর একটুও নেই। খাওয়া দাওয়ার পর ডিমলাইটের আলোয় সব দেখতে পাচ্ছিলো বিনোদ। মেঝেয় হ্যারিকেন বসিয়ে জোন সুপুরি হাতে করে এনে হোলি বললে নিন। সরে গিয়ে নাও গো—, নগেনদা হাত পাতো।

আধ ফরসা রোগা রোগা মেয়েটা মোটেই বড়লোক নিরাপত্তা নেই ভাত কাপড়ের, তবুও যে কী করে এত ছিমছাম পরিচ্ছন্ন…ভাবে বিনোদ! পঞ্চাশ বিঘে ধেনো জমির মালিক দালান পুকুরে রমরমা সংসার তার পাশ বাড়ির খাঁয়েদের সঙ্গে হোলির যে কত তফাত! পৈঠে দিয়ে দুপদাপ নামে হোলি। উঠোনের কোণে দাঁড়ায় পথের দিকে চেয়ে। তার কাচা কাপড়ে আঁচলের গন্ধটা এখনও লেগে আছে বিনোদ কাঞ্জির নাকে। মেঝেয় হ্যারিকেনের আলোয় সেলাই মেশিনের সূঁচের ডগা হীরের মতো জ্বলছে। ঠিক উপরে বড় কাচের ফ্রেমে কোঁকড়ানো চুলে যুবক যীশুর ছবি। খান তিনেক দেবশিশুর সঙ্গে কথা কইছে ধর্মপুরুষটি।

ছবিটায় ডুবে যায় বিনোদ। হঠাৎ চমকে ওঠে ভিতরে, কোথায় খেলুম রে বাবা! নগেনকে শুধোতে মন হিচ পিচ করে। পিছনে তাকিয়ে দেখে হোলি ফিরে আসছে।

নগেন জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কিরে হোলি?

—বড্ড গোলমাল।

—মানে?

—আমার পাশের ডাঙাটা জন চারেক গরীব খেরেস্টানদের ঘর করে দেবে বলে ফাদার গরমেন্টের কাছ থেকে নিয়েছিল।

নড়েচড়ে বসে নগেন। পাশ ঘেঁষে বিনোদও। হোলি বলে যায়, তা মাস খানেক হল পাশ গাঁয়ের সাত আট জন খোঁটা পুঁতে দখল করেছে। মা-টেরেসার চিঠি গেছে এস. ডি. ও. সাহেবের কাছে। তাই নিয়ে আজ সালিশ্যি ফাদারের হোমে।

নগেন দাঁতের সুপুরিটা কুটুস করে ভেঙে কষে রেখে বললো, মহেন্দ্রটা কোথায়?

—ওই সালিশ্যিতে। …আর ফাদারকে বলে কয়ে যদি ছেলে দুটোকে আজ রাতটুকুর জন্যে ঘরে আনতে পারে—। কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়ে হোলি এগিয়ে আসে, অমন ফাদার না থাকলে কি ছেলে দুটোর লেখাপড়া হত নগেনদা—

এলোমেলো হাওয়ার ঝলক দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকে। মেঝেয় সেলাই মেশিনের টেবিল বেয়ে বাচ্চাদের ফ্রক লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। হোলি দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে বলে, ইস্ নোংরা হয়ে গেল নাকি?

—গেলেই বা। যদি হুমড়ি খেয়ে হাত পা ভাঙতো? এতক্ষণে মুখ খোলে বিনোদ।

—ফাদার নেবে না গো দাদা।

—সেটা কি… অবাক হয়ে কথাটা বলে ফেলে বিনোদ।

—নোংরা জিনিশ আপনি কিনবেন? তবে, ফাদার বেচবে কি করে? বোঝা না-বোঝার ধন্দে জল পাক মেরে ঘুলিয়ে ওঠে। দরজা থেকে সোজা দেওয়ালে যীশুর মুখ মুছে জ্যাক্ ফাদারের মুখটা চুপচাপ কাঁচের ফ্রেমে সেঁটে থাকে বিনোদের দু-চোখ জুড়ে।
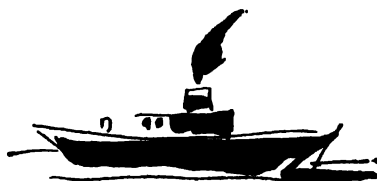
সকালের সূর্য ওঠার আগেই উঠে পড়েছে মানুষগুলো। একটা গোটা দিনের সঙ্গে যুঝতে। কাঁকাল মেঘ শীতলবেড়ে মৌজার আট থেকে আঠারর ছেলেমেয়েরা শাবল কোদাল নিয়ে গাঙ পাড়ে মচ্ছব বসিয়েছে। বড় বড় মেয়েরা, তিন চারটের মায়েরা কোমরে কাপড় সাপটে শাবল গেঁথে ইরিগেশন বাউণ্ডারির মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পিচিং করা ইটগুলো ছাড়াচ্ছে। আস্ত আস্ত ইট। পুরোনো পলি, ঘাস ছাড়ালেই একেবারে নিখুঁত।

দশ বারোখানা ইটের গাছি দিচ্ছে বাচ্চারা। শাবল খুঁড়তে খুঁড়তে মায়েরা দেখে খুশি। যাক ঘাম ঝরলেও রান্না ঘরে পাতা যাবে ইটগুলো। বড্ড সপসপে হয়ে থাকে। ভিতরটাও কাদাকাদা আষাঢ় শ্রাবণে। পাশের ধামসি বউটা কোলের পাঁচ নম্বর বাচ্চাটাকে বাঁধের মাথায় বসিয়ে চোদ্দ বছরের মেয়েটাকে বলে, হ্যাঁরে বাপ্ ভাতারি। ইটগুলো ঠুকে ঠুকে গাছি দিচ্ছিস, ভেঙে যাবে নে? বর্ষায় তো গোটা উঠোন কাদা হোড়। পেতে দিলে তবু পায়ের হাজা থেকে বাঁচবি—

চোদ্দ বছরের মেয়েটার মন খারাপ হয়ে যায়। চেঁচিয়ে ওঠে, পারবুনি যা। মা খিঁচিয়ে ওঠে, হ্যারে মাগি, দু-ডিশ পানতা দিলে তো কোঁত কোঁত গিলতে পারিস। গুছোনোর বেলায় আদুরি—

তখন ওপাশে গোলমাল। বাউণ্ডারি বাঁধের এক পাশে শীতলবেড়ের রুপোচাচির নাতিনাতনির সঙ্গে কাঁকাল মেঘের অঘোরের ছেলেমেয়ের বিবাদ। হাতে রুপোর মোটা মোটা বেড় বালা কানের রুপোর ঝুমকোপাশা নাচিয়ে রুপোচাচি চেঁচায়,—হ্যাঁরা অঘোরের বেটাবেটি এদিকে ভোর বেলায় থাকতে শাবল গাঁথতেছি আমরা না, তোরা, তোর ভাতাররা—আগে বল?

অঘোরের ছেলেমেয়েরা হাতের শাবল থামিয়ে চাচির মুখ ভ্যাংচানি খিস্তি

খেউড়ে মজা পায়। তবুও বলে অঘোরের বড় মেয়ে পঞ্চি— ও চাচি তোমার বাপ এই বাউন্ডারি বেচে দে গেছে যে আমরা ইদিকটায় ইট ছাড়াতে পারবু নি?

একটু পরত ঘাস চাঁচলেই এক নম্বরী ইট, গোটা গোটা, আর শ-দুয়েক হলে রান্নাঘরের দেওয়ালটা পাকা হয়ে যায়। শোওয়ার ঘরের দেওয়ালটা পাঁক দিয়ে ইরিগেশন ইটের গাঁথনি। কী ঝকমকে যে গোটা ঘরটা। চাচি ঝাঁঝিয়ে ওঠে, তোর বাপকে কি দলিল করে দে-ছেরে দোজ ভাতারি—যেখানে ইচ্ছা শাবল গাঁথবি?

অঘোরের বাইশ বছরের মেয়েটা আর শ্বশুরঘরে স্বাদ পায় না। বরটা জুটে আছে খুড়তুতো ভাইয়ের বউয়ের সঙ্গে। হাওড়ার কলে কাজের ছেলে দেখে বিয়ে, ঘর করে সব বিত্তান্ত মনে বড় লাগে। কিছু বললেই পঞ্চির ঘাড়ে চড়-চাপাটি। তাই বড্ড ইচ্ছে ঘরের দেওয়ালটা পাকা হোক মেঝেটায় ইটের পাতনি। ই'দুরের উৎপাত কমবে। দেশের ধান ভাঙিয়ে চালের ব্যবসা, কলকাতার হাটে নয়, বেহালা ঠাকুরপুকুর। মাঝে মাঝে খিদিরপুর —ছাগলহাটায়।

গোটা গোটা ইট যে বড্ড দরকার। কতদিনের রুপো চাচি···রুপোর গয়না মুড়ে থাকতে ভালোবাসে তার ছেলেবেলার রুপো চাচি, এমন করে মুখ ঝামটা দিল···!

—দিদি নে দেখি। আমি শাবল চালাই তুই গাছি দে, সঙ্গের ছোট ভাইটা চাঙ্গা করে তোলে।

ভাইটার পরামর্শে বাইশ বছরের দিদি মনের ময়লা ধুয়ে ফেলে। কোমরের কাপড় গুটিয়ে বলে—নে, শাবল চালা।

আনাড়ি হাতে দ্রুত শাবল চালায় ইটের গায়ে লেগে ঠং শব্দ। রুপো চাচি এগিয়ে আসে বুড়ি শরীরে। নিজেই একটা দাগ আন্দাজ করে শাসায়, দেখ পঞ্চি এর ওপারে যদি ইট ভাঙিস তালে সেই ইট তোর মাথায় ভাঙবো—

পঞ্চি কিছু বলে না। বরং কোমর সাপটে ভাইয়ের তোলা ইট চার-পাঁচখানা এক সঙ্গে বয়ে গাছি দেয়। এক প্রস্থ রান্না সেরে মাও আসবে। নিয়ে একেবারে পুকুরে ফেলবে। ধুয়ে গেলে ঘরের কাজ।

মাথার উপর সূর্যটা খুব বড় হয়ে গেছে। পাঁচ দিনের বরাদ্দ তেজ যেন একদিনে ঢেলে দিচ্ছে। পথ হাঁটতে হাঁটতে সঙ্গী ছোকরাটাকে জিজ্ঞেস করে বিনোদ— হ্যাঁরে শশী আজ হাওয়া গেল কোথায়?

একটা দড়ির ফাঁসে দু-দুটো করে ছাগল বাঁধা। একসঙ্গে আটখানা। কেবল ছুট একটার দড়ি খোদ বিনোদের হাতে। পিছনে চালিয়ে নিয়ে আসছে শশী। তেতে ঘেমে মেজাজ টং। ঝটপট উত্তর দেয়—পোয়াতীদের পেটে।

হাতের দড়ি খিঁচে পিছন ফেরে বিনোদ।

—চার পাঁচখানা গেরাম ঘুরে মনে হল শ-খানেক পোয়াতি। তা ভগবান কত হাওয়া যোগাবে—

—গাঙের জলও তো থির ঃ দরদর করে ঘাম ঝরে বিনোদের গলা বুকে। মাথার চুলের গোড়ায় রোদ পড়ে ঘাস চকচকে। শশী খালি গায়ে লুঙি ফেট্টি করে পরেছে, যেন এই মাত্র পুকুর থেকে নেয়ে এল।

বিনোদ একটু আঁকপাঁক করে, দেখিস বাবা পাঁঠাগুলোকে জ্যান্তজ্যান্ত যেন গোলায় দিতে পারি—

কালো রোমে রোদ বিছিয়ে আছে। জন্তুগুলো জিভ বের করে শ্বাস নেয়। অন্তত পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোনো গাছপালা নেই। ফাঁকা গাঙে ফাঁকা বাঁধ, পথ হাঁটে দু-জন। জন্তু কটার হালকা খুরে অল্পস্বল্প ধুলোর ধোঁয়া।

—হ্যাঁ গো দাদা।

—বল ?

—কলতার হাটে মজুরিটা দেবে তো ?

—বলি নি তোকে ? এখন নিবি ?

ভিতরে ভিতরে নিশ্চিন্তির খুশি, শশী জোর পায় মনে। দু-চার পা হাঁটার পর বলে, সেই কথা বলেছি ?

বিনোদ কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়, তোর ঘর দাবায় ইট গেঁথেছিস ?

—কোথায় পাবো ? অত পয়সা কই ?

—গাঙ পাড়ে থাকিস, ইটের অভাব ? দেখ না কাঁকীলমেঘ শীতলবেড়েয় কার ঘরে ছিটে বেড়া আছে— ?

—তা যা বলেছো। দু-দুবার ভাঙন ধরেছিল, রিং বাঁধ দিল গরমেন্ট। বাতিল বাঁধের ইট কি পড়ে থাকে— ?

বিনোদ পথ চলতে চলতে আশপাশের দু-চার খানা ঘর-বাড়ি দেখে। নানারকম ইট বসিয়ে পাঁকের গাঁথনি দেওয়াল।

গাছপালায় কেমন ছায়াময় শান্তি। কিন্তু নিশ্চিন্ত…। ওপাশে গাঙটা কী বিশাল। ভয়ংকর হতে কতক্ষণ। একটা বর্ষা…না একটা জোরালো কোটাল। কূল ঝাঁপালে—! তোলা ইটের গর্ত ফুঁড়ে জল স্রোত…! তখন…! একটু পাশে তাকাতেই গাঙ। কিলবিল ঢেউ—ওপারে দামোদর। বন্ধ দামোদর…শুনি তো সব ভাসাতো। তার মুখটা না হয় এখন জব্দ! বাঁ পাশে খানচারেক বাচ্চা। আট-দশটা বছর পার করেছে। সঙ্গে ঢ্যাঙা

চেহারার ধান গায়ে মা। শাবলটা মাটিতে শুইয়ে চুপচাপ দাঁড়ায়। মানুষ দুটোর সামনে ইট খুলতে বাধে।

বিনোদের খুব ইচ্ছে করে একবার বলে, হ্যাঁগো মেয়ে শেষকালে যে তোমাদের সাধের ঘরবাড়ি ভাসিয়ে আমাদের গাঁ-গেরাম জল ডুবি হয়ে যাবে। মরবে আর আমাদের মারবে— ?

ঠিক তখন ভোঁ বাজিয়ে একটা শাদা লঞ্চ জানান দিচ্ছে পিছনের লঞ্চগুলোকে।

ধবধবে শাদা লঞ্চ। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা সারেঙের কেবিনের পিছনে সুন্দর সুন্দর চেয়ার পাতা। কোট প্যান্ট পরা চিকন চেহারার মানুষ জনাকয়েক। সকলের চোখে কাচের চোঙ। একদম জল কিনারা ঘেঁষে এগিয়ে আসছে শাদা বড় লঞ্চটা। পিছনের তিনটে কাছাকাছি এলে সামনেরটা স্পীড কমিয়ে দেয়।

কিনারা ঘেঁষে এত কাছে লঞ্চগুলো। অবাক হয়ে হাতের শাবল কোদাল থামিয়ে একবার মাত্র দেখে। গাঙের গুমোট হাওয়ায় কেমন অন্যরকম গন্ধ। বাচ্চারা মেয়ে-বউরা শাবল কোদাল ফেলে ছুট মারে। সায়া-শাড়ি অগোছালো, এলো চুলে ত্রাস কিলবিলিয়ে নাচে।

রূপোচাচি একখানা ইট আঁচল চাপা দিয়ে জড়িয়ে মড়িয়ে বুড়ি পায়ে দৌড়য়।

শাদা লঞ্চের কোটপ্যান্ট বাবুদের নজর কাড়ে না। বরং তিন পায়া টেবিলে ক্লিপ আঁটা ম্যাপে কত সব রেখা মিলোয়। স্পীড একদম জিরো পয়েণ্টে এনে বায়নাকুলার দিয়ে স্পষ্ট দেখে। মাটির শিরা উপশিরা দেখে নিতে চায়। আবার পিছন ফিরে গাঙের চেহারা দেখে। খাস কলকাতা থেকে দূরত্ব বোঝে, হলদিয়া থেকে দূরত্ব হিসেব কষে।

কাঁকাল মেঘ মৌজার উঁচু মাটির ঢিবি-পাহাড়টা দেখে কালো চেহারায় কোট প্যাণ্টে ঝকঝকে সাহেব প্রত্যয়ে বলেন, ম্যাপ-মার্ক। ম্যাপ আঁকড়ে থাকা যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে লাল কালিতে দাগিয়ে দেয়। বাঁধের ওপাশে গোটা কাঁকাল মেঘ মৌজাটা লাল বন্ধনীতে আটক পড়ে টেবিলের ম্যাপে। সংলগ্ন মাটি গাছ পালা মানুষ থেকে একটা আলাদা গোত্র পেয়ে যায়।

কোট প্যান্ট পরা সাহেব গম্ভীর গলায় জানতে চায়, অ্যাকোয়ার্ড ?

—অলরেডি স্যার। ড্রেজিং পিরিয়ডে—

খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় শাদা লঞ্চটা। বিনোদ ছাগল কটাকে নিয়ে জিরোয়। বাঁধের গায়ে দুটো বেওয়ারিশ খেজুর গাছের বাঁকা ছায়ায় গোল হয়ে দাঁড়ায়।

লঞ্চ চারটে শীতলবেড়ের গা ধরে দাঁড়ায়। সারা গঞ্জ মৌজায় গিয়ে

একদম মাটি ছুঁয়ে দাঁড়ায়। শাদা লঞ্চের পাতা কাঠের উপর দিয়ে বাঁ-হাতে লাগির রেলিং ধরে কোট প্যান্টের বাবুগুলো নেমে যায়। ফাঁকা মাঠে জল কিনারে একলা জাহাজ দিশারা স্তম্ভটা সঙ্গী পেয়ে খুশী। তার মনিব, মনিবের লোকজন তার হেলান ছায়ায় দাঁড়িয়ে পরবর্তী কাজের ছকটা এঁটে নেয়।

একটু তফাতে গুরুপদর ডিঙির লোকজন চাপ চাপ কালো মাটি কেটে ডিঙিতে তোলা বন্ধ রাখে। একেবারে বাঁধের পাশে চরের মাটি খোঁড়া বে-আইনি কাজ কিনা, কে জানে?

কোট প্যান্ট পরা বাবুরা সি. পি. টির মাঠে উঁচু ঢিবিতে দাঁড়ায়। এতদিন কালো মাটি কেটে কেটে বরানগর কুমোরটলি চালান দিচ্ছে। কই এমন বাবুদের তো দেখে নি!

বেশ কয়েক পা এদিক ওদিক হাঁটা চলা করে কোট প্যান্ট পরা কালো সাহেব বললো, ইয়েস, এরিয়া?

টেবিল আঁকড়ে থাকা ছোকরা বাবুর বগলদাবায় মোটা ফাইল। চটপট উত্তর দেয়, স্যার তিনশ একর।

—ফ্রি ল্যান্ড?

—ইয়েস স্যার।

সারাগঞ্জ মৌজার ফাঁকা মাঠের উপর রোদ। ঝোপঝাপ ঘাসের ডগায় গাঙের হাওয়া। উঁচু নিচু আল কাটা সীমানা। মানুষের আসা যাওয়ার চিহ্ন। পুব দিক বরাবর তাকিয়ে কালো সাহেব দেখে গাছপালার ওদিকে দূর একটা গ্রাম। তারপর স্লুইশ গেটের বড় বড় পাল্লা। ভাঙা কেল্লার অবজারভেটরি প্রায় আকাশ ধরেছে।—মেটালড রোড ত ইমিডিয়েট্!

আর একজন অফিসার কিছু বলার জন্যেই যেন বললো, ভীষণ উঁচু নিচু স্যার। লেভেলিং?

—ইনফ্রা স্ট্রাকচার সব করে দেবে।

মাটি কাটা ডিঙির গুরুপদ কিছু একটা আঁচ করে। তবে কোট প্যান্ট সাহেবদের কাছে যেতে সাহস পায় না। যেহেতু সূর্য পশ্চিমে সরেছে জাহাজ দিশারা-স্তম্ভটার লম্বা ছায়াখানা গাঙ পাড়ে পায়ে হাঁটা পথে। পথটা সি. পি. টির মাঠ চিরে শীতলবেড়ের গা ছুঁয়ে আরও এগিয়ে গেছে।

উটের পিঠের মতো এবড়ো খেবড়ো শিরদাঁড়া হয়ে সাহেবদের পাশ কাটিয়ে পড়ে আছে পথটা অলস তন্দ্রাচ্ছন্ন। ছায়ায় দাঁড়িয়ে গুরুপদ টের পায়, একটা বেশ কড়া কাজকর্মের তোড়জোড় চলছে···

—এই গুরুপদদা—

ঘাড় ফেরায়, আরে তুই নুরুল! কোথকেরে?

সঙ্গে বড় করে ঘোমটা টানা কচি বউ কোলে কাঁখে বাচ্চাটা পিট পিট

করে তাকায়। ডান হাতে টেনে টেনে আর একটা গুড় গুড় করে হাঁটে। প্লাসটিকের গোলাপী জুতোয় শুকনো মাটি খট্‌ খট্‌ শব্দ তোলে।

—নদে। কৃষ্ণনগর।

—এখন চাকরি ওখেনে?

বাদামী ডিসকো জুতোয় ধুলো। সাদা ফুলপ্যাণ্ট, কলারে রুমাল গুঁজে ঘাটের ময়লা রুখবার অভ্যেস। কথা বললেই বাঁ রগের টিউমারটা নাচে।

—কেন? ওখেনে ত এক বছর আছি।

গুরুপদ ভেতরে ভেতরে লোভী হয়। সাহেবদের টাকায় সেবা প্রতিষ্ঠানে চাকরি। লুকিয়ে চুরিয়ে শীতের জামা কম্বল টর্চের ব্যাটারি আনে নুরুল। ইচ্ছে হল বলতে, হ্যাঁরে গুঁড়ো দুধ? চা খাবো ডিঙিতে।

হাতের ব্যাগে মালপত্তর ঠাসা। খুব কষ্টে দুলিয়ে বলে, এতে। কাল আনবো—তোমার চিজ রেখো।

বউটা দাঁড়িয়ে পা ঘষে।

নুরুল বলে, চল। এগিয়ে চল না।

কানের কাছে ফিস ফিস করে গুরুপদ বলে, টানবি একবার?

—ওদের রেখে আসি, এক পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে আসে নুরুল, প্যাণ্ট পরা লোকগুলো কারা রে?

—আমিও তাই দেখতিছি। তখন থেকে হাত নাড়াচ্ছে পা বাড়াচ্ছে।

—এলো কিসে?

গুরুপদ গাঙের দিকে মুখ ফেরায়। লঞ্চ কটা নোঙর ফেলে চুপচাপ। নুরুল দেখে, দুধ শাদা লঞ্চের গায়ে কালো রঙে গোটা গোটা বর্ণ সি. পি. টি.।

শুধু একটা শব্দ জবেদের বেটা নুরুলের গলায়, হুম্‌।

—যা না, তুই ত জার্মান না লণ্ডন সাহেবদের সঙ্গে কাজ করিস? একটা স্বীকৃতির গর্বের আভাস লাগে! নুরুল নিজেকে জাহির করতে বললো, যাই কি করে সঙ্গে যে ল্যাং বোট। আগে ওদের খোঁড়ে রেখে আসি—বলে গট গট করে হাঁটে।

চার পাঁচজন মেয়ে বউ মাথায় পাঁচ নম্বরী সিলভার হাঁড়ি। হাঁড়ির গায়ে শেষ বেলার রোদ। ওরা কলতার হাট থেকে চাকি গুড় নয় ত গোলা চিটে গুড় নিয়ে রামনগর বা মুলাতলার দিকে যাবে।

গুরুপদকে পাশ কাটাতে কাটাতে জিজ্ঞেস করে, হ্যাগো মাঝি, বাবুরা কি ছেটেলমেণ্টের লোক?

—কি জানি? লঞ্চো থেকে নামলো—

গাঙ পাড়ে থেকে থেকে জল পুলিস চেনে, চেনে পোর্টের লঞ্চ। তেমন গুরুত্ব না দিয়ে একজন বললো, মাঝি আমাদের দোকানে আর যাও নি যে?

—কী হবে গে? তুমি ত ঘর সংসার নে পড়ে থাকো—

—থাকলুম বা। শরবতটা ত আমি জ্বাল দিই। আমার হাতে সোয়াদ নেই?

—নেই কে বললে? সে সোয়াদ ত সারাগঞ্জের বটতলায় পাই,

—আবার কী সোয়াদ?

ফাঁকা গাঙ থেকে এক ঝলক হাওয়া গায়ে বুলিয়ে যায়। দু-বাচ্চার গা-গতরে মা ফুলি। খেয়ে মেখে বেশ মানানসই চেহারা। ফাঁকা গাঙ পাড়ে মেয়েমানুষের গন্ধে শরীরটা চনমনিয়ে ওঠে গুরুপদর। কথায় রস মাখিয়ে বলে, একটু বুঝতে হয় ত—

ঠোঁট বাঁকায় ফুলি, আহা গপ্পের ঢং দেখো। এত নোলায় ভিজে গেছো।

—অমন তেঁতুলে কার না জল সরে বলো দিখি?

ফুলি হাসে। মাথায় অতখানি চাকি গুড়ের ভার। জ্বাল দিয়ে ভাপ্ ফুটিয়ে চোলাই মদ তৈরি করতে হবে। বেশি দেরি না করে বলে, তেঁতুলের লোভ করলেই হবে? গাছ বাইতে হবে নে?

গুরুপদ প্রশ্রয়ে এক পা এগিয়ে আসে। প্রায় নিঃশ্বাসের কাছাকাছি। সস্তা ব্লাউজ শাড়িতে মেয়েমানুষটা গা বুক কাঁপিয়ে দেয়। গলায় হাটে কেনা সরু হার। বাকি অংশটা জামার ভিতরে। একদম কাছে এসে বলে, সায় দিলে তো যাই।

—গোড়ায় জল ঢালতে হয়। তবে গাছ সয়। সঙ্গী মেয়েরা এগিয়ে গেছে। হাঁক দেয়—কিরে থাকবি, না যাবি?

—আসি গো, বলে ঢেউ মেরে চলে যায়।

গুরুপদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে চওমও করে চায় চার দিকে। দূরে লোকজন এখনও কথাবার্তা দেখাদেখি চালাচ্ছে। হঠাৎ নিজেকে বোকা সাব্যস্ত করে আপসোস করে বলে, দুস্ শালা! এত দিন গাঙে কাটালুম···গাঙের জল···গাঙ চিনলুম কই···!

পুরনো খালকে ঘুরিয়ে নতুন জায়গা এ্যাকোয়ার করে লকগেট। পাঁচ পাল্লায় জল আটক। বর্ষায় থৈ থৈ জল বাগে আনতে মোটা গেজের লোহার হুইল। ফর্ক বেয়ে মোটা তারের কাছি অনেক নিচে। দাঁড়ালেই জলের শব্দ···লোহার দরজা চুঁইয়ে ঝর্ণার ধারা। সূর্যের রশ্মিতে জলের কণা হীরে মুক্তোর গুঁড়ো।

ডান দিকে কেল্লা ঘিরে গোল করে কাটা গভীর গড়। ব্রিটিশ আমলে সাহেবদের কাটা। এখন সেখানে সত্তরটা পরিবারের ঘর বাড়ি। কাঁচড়াপাড়া ক্যাম্প থেকে চলে এসেছিল ওপারের দেশের মায়া ভুলতে···একটু নিজের মতো মাটির আশায়। রাস্তাটা গড়ের ধারি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রমশ ঢালু হয়ে মুণ্ডুটা পেতে রেখেছে লকগেটের কংক্রিট ঢালাই ব্রিজে। তারপর···তারপর রোগা সরু মেটে রাস্তা। মুলোতলার দিকে এঁকে বেঁকে।

সরু রাস্তাটায় মাটি পড়ছে। প্রায় শতিনেক লোক কাজে লেগে গেছে। ধারালো কোদালের ফলায় টাটকা ভোর। চার দিকে স্নিগ্ধ হিমেল হাওয়া। তবুও ঘাম ঝরছে মানুষগুলোর কপাল বেয়ে ভ্রূর কাছে। দর দর করে নামছে বুক বেয়ে নাভির কুয়োয়।

দফাদার নতুন খোঁটা পুঁতে এসে বললো, এই তোরা দেখে নে—ওই পুবে আর এই পশ্চিমের খোঁটা। ওর মধ্যে মাটি ফেল্লাবি—বাইরে ফেল্লালে হিসাব পাবি নি।

লোকগুলো একবার কাজ থামিয়ে দেখে নেয়।

দফাদার কড়ার দেয়, আজ সন্ধের মধ্যে অতোখানি মাটি ভরাতে হবে। কাল সকালা কনটাকটারের সঙ্গে বড় অফিসার আসবে। খোদ দিল্লির অফিসার—

কাজে লাগতে গিয়ে থমকে যায়। ভোর থেকে এক ঝুল কাজ হয়ে গেছে। কতদিনের বাদা মাঠ···ঢাকা পড়ে। রাস্তার···বড় পাকা রাস্তার প্রস্তুতি। এই খাতার লেবাররা বললো তাদের কর্তাকে, ও শ্রীকণ্ঠদা একটু দম নিলে হতু নি ?

দফাদার শ্রীকণ্ঠ সায় দেয়, নে, তোরা কাটবি যেটা ভালো বুঝিস কর। মালকোঁচা নয়তো ছোট আণ্ডারপ্যাণ্টের উপর গামছার দড়ি পাকিয়ে সহজ স্বচ্ছন্দ চেহারা। আদুল গায়ে ঘাম, হাওয়ায় আস্তে আস্তে রেখা কাটে।

পাশের মাঠে লাইন ধরে হোগলার দো-চালা। দু-চারখানা কাপড় লুঙি লম্বা দড়িতে হাওয়া খেয়ে শুকোচ্ছে। লেবাররা হোগলা চালার দিকে তাকায়। দেখলো, মিলিটারি কায়দায় বানানো উনুনে ধোঁয়া উড়ছে।

খান কয়েক বিড়ি ধরিয়ে ফুক ফুক করে দম মারে। হাত ফিরি করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, ওই-ওই হয়েছে।

পাশের লেবার অবন্তী বলে, কী ?

সুবল বিড়িটায় একটা মোক্ষম দম মেরে অবন্তীকে দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছাড়ে,—দুলের বাপ্ ভাত চাপাচ্ছে।

—আজ কী হবে রে ? পাশের লেবারটা কৌতূহলী।

অবন্তী বাহাদুরি নেয়, কালকের বড় কুমড়াটার ঘ্যাঁট আর ভাজা মুগের ডাল—

সুবল যোগ দেয়, আলুর থাসা হবে নি ?

দফাদার হাঁক মারে—হেই শালারা কত দম লিবি ? পাশের খাতা যে অনেক আগিয়ে গেলরে।

ঝট পট উঠে পড়ে। কোদালি কোদাল নিয়ে চৌকোয় নামে। মাথালি লেবার হাতে ঝোড়া বাগিয়ে হাঁটে চৌকোর দিকে।

তিনশ লোকের কথাবার্তায় কোদালিদের শ্বাস প্রশ্বাসে নির্জন আবাদী জায়গাটা মানুষের চলাফেরায় গরম হয়ে ওঠে। বড় রাস্তার রেখা ফুটে ওঠে। চাঁই চাঁই মাটির ঢেলায় নতুন কিছু গড়ে ওঠার আভাস সকালের রোদ্দুরে জ্বলতে থাকে।

গলায় জোর চড়িয়ে পরামর্শ দেয় দফাদার শ্রীকণ্ঠ—লে ফের কাজ ধর। বেলা বাড়লে টানতে দেরি হবে।

টেনে টেনে কাপড়টা হাঁটুর উপর রেখেছে দফাদার। বেগুনী রঙের ফতুয়ায় ছখানা ঢাউস পকেট। একখানা পুরোনো ডাইরি নোট বুক বানিয়ে বুক পকেটে রাখতেই বড্ড উঁচু, সঙ্গে মোটা চেহারার পেন। সব মিলিয়ে দেশ গাঁয়ের আর পাঁচ জনের থেকে শ্রীকণ্ঠ বেশ আলাদা মানুষ। দফাদার।

পাশের আর একখাতা লেবারের দফাদারের সঙ্গে শ্রীকণ্ঠ জমির আলে বসে। দু-তিন খানা এরিয়া মার্কিং করে যে যার লেবার দিয়ে মাটি ভরাট করাচ্ছে। বেগুনী রঙের ফতুয়াটা টেনে টুনে শ্রীকণ্ঠ কেল্লাকলোনির ক্ষুদিরাম দাসের একদম কাছাকাছি।

পাশ পকেট থেকে দুখানা বিড়ি বের করে একটা দেয় ক্ষুদিরামকে।

নিজেরটা ঠোঁটে রেখে পেট্রল ম্যাচটায় বুড়ো আঙুলের চাপ দিতেই আগুন।

শ্রীকণ্ঠ হাত আড়াল করে অস্পষ্ট স্বরে বলে, ধরান গো ক্ষুদিরামবাবু বড্ড হাওয়ার জোর—

ক্ষুদিরাম বিড়িটা কানের কাছে ধরে দু-আঙুলে পাকিয়ে মশলা সাইজ করার সময়টুকুও পেল না।

এবার নিজেরটা ধরিয়ে শ্রীকণ্ঠ দম ভোর টান দিতেই কাশি। বেশ তারিয়ে তারিয়ে কাশে। কাশির দমক কাটলে বলে, খবর কিছু পেলে ?

—শুনলুম ব্যানার্জিবাবুর হেড ম্যানেজার আজ একবার ঘুরে যাবে।

—তা ঘুরে যাক। কিন্তু লেবারদের কেরাস তেল পাবো কোথায় ? বাবুরা ব্যবস্থা করবে নি ? পুইস্যা দিলেও দোকানদার কইছ্যে তোমাদের জন্যি কি গরমেণ্ট বাড়তি তেল দিছে ?

ক্ষুদিরাম বলে, ম্যানেজার কনট্রাকটার এলে বলবে। আমিও বলবো গরমেণ্টের কাজ গরমেণ্ট সাপ্লাই দিক—আর এমনি তো নয় ?

আচমকা হই-চই। শব্দটা আছড়ে কানে আসে।

কথা হারিয়ে যায়। দু-জনেই সোজা উঠে দাঁড়ায়। এক সঙ্গে ত্রিশ চল্লিশ জন লেবার শুকনো ঢিল ধারালো কোদাল উঁচিয়ে তাক কষছে। পুরোনো সাপ। ল্যাজটা কাটা যেতেই এত মানুষের ভিড়ে প্রাণপণে পালাতে চায় যন্ত্রণা সইতে। যে দিকে যায় লেবারদের তাড়া খায়। পালাবার পথ পায় না। অনেকদিনের পুরোনো বসবাস ভাঙচুর। পাশে বাবলা গাছটা হাওয়ায় দুলছে। মানুষগুলোর ঘাড়ে একটা দায় চাপে।

চিৎকার করে সবাই—শেষ কর। শালারা শেষ করে দেরে-রে, সবাই উত্তেজনায় টান্ টান্। সতর্ক।

একজন বলে, সাবধান। কাঠি ঘা হলো কিন্তু—।

আর এক জন কপালে দু-হাত চাপড়ে গড় করে—মাগো মা-মনসা দোষ নিও নি মা—ছেলেপুলে নিয়ে ঘর সংসার মা…।

একজন কোমরের গামছা খুলে মুখ মুছতে মুছতে বলে, উঁহু। যা করার করে ফেল। বরং দু-টাকার বাতাসা কিনে বাবলা তলায় ডালা ধরে মাপ চেয়ে নে—!

প্রথমজন বলে, টাকা…! ক্ষুদিবাবু কোথায় ? দেখে যান গো বিদেশ বিভূঁইয়ে আছি দেবতার কোপ সামলাক—।

পশ্চিমের গাঙ থেকে এলোমেলো হাওয়া আবাদী মাঠের মাঝ বরাবর তাল বাগানের পাতা কাঁপিয়ে দেয়। খড় খড় সড় সড় শব্দ। মাথার উপরে সূর্যটা বড় হচ্ছে। তাত ছড়াচ্ছে চারদিকে। লেবারগুলোর গা-বুক ঘামে নেয়ে যাচ্ছে।

খদ্দরের গেরুয়া পাঞ্জাবি গায়ে ক্ষুদিরাম দাস। দু-চোয়াল চাপা কালো মুখ। একটু রোগা রোগা চেহারা। বয়সের তুলনায় দুম করে চুলগুলো পেকে গেছে। হলদিয়া টাউনশিপে মাটি ফেলার দফেদারি করতে গিয়ে অনেক ওষুধ পত্তর খেয়েছিল। তবুও পাকা চুল কালো হয় নি।

রবারের জুতো পায়ে আসতে থুপ থাপ শব্দ। ক্ষুদিরাম তড়পায়—এমন কি যে তোরা কাঁই মাই লাগিয়েছিস ?

চারটে বাচ্চার বাপ্ যদিও তেমন বয়েস নয়। কোমরের গামছা খুলে গা মুখ মুছতে মুছতে বলে, বাবু মা মনসার গায়ে অজান্তি ঘা দিছি গো—। অখন পুজা দিয়ে কসুর চাইবো—

—তা হইছ্যে টা কি ?

—দু-টাকার ফুল বাতাসা চাই গো বাবু—দুধকলা আর কাঁই পাবু ?

—যা কাজ ধর। আমি আনিয়ে দিচ্ছি

মাটির গায়ে কোদাল পড়ে। কোদালের কোপে ধরিত্রীর গায়ে ক্ষত হয়। ক্ষত না করলে প্রকৃতিকে দরকার মতো সাজিয়ে গড়ে তোলা যায়! দরকার মতো সাজানো যায় বলেই পৃথিবী বাসযোগ্য।

কাজ দেখতে দেখতে চোখে পড়লো ক্ষুদিরামের রাস্তার খোঁটা পোঁতা সীমানা বরাবর লাইন ধরে খান পঞ্চাশেক বাবলা গাছ। যাদের জায়গা দখল করে গরমেণ্ট রাস্তা তৈরি করছে, লোকগুলো কেন যে গাছগুলোকে কেটে নিয়ে যায় নি। ব্যাপারটা কি! রাগে, দুঃখে, নাকি তাদের যখন জায়গাটা চলে যাচ্ছে—কী হবে কখানা বাবলা গাছে!

হঠাৎ মনে হল ক্ষুদিরাম দাসের, খান দুয়েক লেবার দিয়ে গাছগুলো কাটালে হয়!

ভাবনাটা একটু নাড়াচাড়া করতে আর একটা পথ খুলে যায় চোখের সামনে, নিজের খাতার লেবারদের জ্বালানি হবে—তেমন হলে ও-খাতার লেবারদের কাছে বেচা যাবে। আঠারো কুড়ি টাকা তো কাঠের মণ। একটু জোরে হাঁক দেয়, ক্ষুদিরাম,—হে-ই তোরা জন দুয়েক আয় তো—

দুজনের বদলে পাঁচজন পড়ি মরি করে ছুটে আসে। হাতে কোদাল কাটারি। চেঁচায় তারা—বাবু কি সাপ ? ছোট না বড়ো—

ক্ষুদিরাম দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে দেখে। কেল্লার জঙ্গল সাফসুফ করে ঘর বাঁধতে গিয়ে দু-দুবার মা বিষহরির হাত থেকে বেঁচে গেছে। টাঙি কোদাল ঝুড়ি ফেলে ছুটে পালিয়ে এসে দম নিয়েছিল কামানতলায়। পুরোনো ভাঙা কামানের গায়ে জায়গাটুকুতে তখন লটবহর সাজানো। তিনটে ঢিলে শুকনো ডালপালা ধরিয়ে রান্না হচ্ছিল। দিনের একবার মাত্র আহার। তখনও বাতাসে সেই কাঁচাখেকো প্রাণীটার ভয়ংকর গজরানি···

মাঝে মাঝে শিস ধ্বনি।

বুড়ো বাপ মাটিতে কপাল ঠুকে বলেছিল, মা বসুমাতা গো একটু রোষ কমাও। তোমাকে বিনি দরকারে ঘা দিতাছি না গো মা। দ্যাশ ভাগ হইল যামু কোন ঠাঁই—একটুক ঠাঁই মাঙি—মা ফুল জল দিয়ে খুব কান্নাকাটি করেছিল কেল্লার ঢিবিতে, কৃপা কর গো মা—বাঁচনে থাকনে আশ্রয় দাও—

তারপর···মায়ের সঙ্গে অন্যমেয়েরা গলা মিলিয়েছিল—বিষহরির গানে। কেল্লার উঁচু অবজারভেট্রি টাওয়ার কেঁপেছিল দেশ ছাড়া কটা মানুষের শেষ আশ্রয়ের কামনায়, আকুল কান্নায়।

গোরা সোলজারদের ভারিবুটের শব্দ বারুদের গন্ধ প্যারেডের লেফট্ রাইট শুনে অভ্যস্ত জীর্ণ প্রাচীর কূপ মাটির তলায় পাকা দেওয়ালের চুন বালি পাথর। শোনে নি এমন আন্তরিক অসহায় আর্তি। গাছপালাগুলো থম মেরে দাঁড়িয়েছিল কটা নতুন মানুষের আকুলতা ঘর বাঁধার আপ্রাণ পরিশ্রমে।

লেবারদের একজন বললো, কয়ে ফেলো গো বাবু।

একজনকে দেখিয়ে বলে ক্ষুদিরাম,—তুই থাক।

বাকি চারজন চলে যায়। আবার কাজ ধরে। মাথার ঝোড়া ভর্তি। চাপ চাপ মাটি।

লেবার ছোকরাটা কাছে আসে। ক্ষুদিরামকে কেমন অচেনা লাগে। তাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাবুর দিকে তাকিয়ে কেমন টান টান অপেক্ষা। দুটো টাকা বের করে ক্ষুদিরাম বলে—যা তো বাস মোড়ে। বাতাসা নিয়ে আয়—

ওদিকে মাটি কেটে কেটে রাস্তার রেখা। জনপথের জন্ম হয়। মানুষগুলোর পরিশ্রমী মুখ। ক্ষুদিরামের মনে হল, সব কিছু জন্ম দিতে গেলে··· বোধহয় এমন ঘাম ঝরে।

ভোর হচ্ছে পৃথিবীতে। গাছগাছালির পাখি পক্ষীরা টের পেয়ে গেছে। চার পাশে অন্ধকার মুছে দিনের গন্ধ।

বিনোদ নিম দাঁতনটা ভেঙে দাঁতে ঘষতে ঘষতে গোটা উঠোনটা পাক

মারে। বিড় বিড় করে নিজের মনে, বন্ড ঠাঁকিয়ে দিলে ছামাদটা। শালা কসাইয়ের বেটা কসাই। চোখের সামনে চৌত্রিশ টাকা কে জি বিকোচ্ছিস— আমার বেলায় পঁচিশও দর ধরলি নি। কটা পাহাড়ি রামছাগল বেঁধে রেখেছিস বলে অতো ভড়ং দেখালি, নাও ফেরত লে যাও তোমার জানোয়ার—।

ঘষতে ঘষতে মুখ ভর্তি থুতু।

একটু এগিয়ে যায়। উঠোনটা বেশ ঝাঁটানো পরিষ্কার। যেখানে সেখানে থুতু ফেলতে বাধে। তাই অস্বস্তি কাটাতে এক কোণে চলে যায়। তেতো থুতু ফেলে গজরায়, আমার জন্ম দেওয়া ছানা যে ফেরত বললেই ফেরত। ঝুমরির মাকে যে গড়ে দু-শো পনের দাম মেটাতে হবে—

যেন রেগে গিয়ে ছামাদকে শোনাচ্ছে সব। সুতরাং নিজের মনে সোজা তাকাতেই অবাক! মাঠ ভেঙে—ছোকরাটা···না···চালবাজটা। ন্যালবেলে পা—প্যান্টুল, কব্জি অব্দি ঝিলিমিলি গেঞ্জি। ওহ্ শালার চাকরি করা দেখালি। তায় যদি জজ ব্যালিস্টার হতিস্। কাছাকাছি এসে বিলিতি পেস্টের খানিকটা টিপে ধরে নুরুল, বিনোদদা—ডেলি তো গেছো ডালে ঘষিস্— নে একটু—

—কি হব এক ছিটেয় ?

—নে না যতটা দরকার। মুখে আরাম পাবি।

ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বিনোদ, এক দল চেনা মুখ। হাতে কোদাল মাথায় খান কয়েক ঝোড়া। মানুষগুলো হেঁটে চলেছে। বিড়ির টানে খুক খুক কাশি। পলু কর্মকারকে ঘিরে নানা প্রশ্ন। পলুর গায়ের কাছে পাঁচ ছজন। ঘন হয়ে কথা বলতে বলতে এগোয়—দেখো পলুবাবু যদি ওরা পুলিস ডাকে ?

—ডাকলেই বা। আমরা তো চুরি ডাকাতি করছি নি ?

বিনোদ এগিয়ে যায়। কাঁচা রাস্তার বাঁকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, ব্যাপার কি হে মদ্দরা ?

পলু ওরফে পালান প্রাইমারি ইস্কুলে অঙ্ক পড়ায়! যখন স্কুল ফাইন্যাল দেয় রটে গিয়েছিল পরশুরামপুর হাই ইস্কুলে, এবচ্ছর, এবচ্ছর কেউ যদি না পায় তো পালান কর্মকার ফার্স্ট ডিভিশন পাবেই।

হেডমাস্টার মশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে শুনেছিল। যখন রেজাল্ট বেরোয় দুঃখ পেয়েছিলেন হেডমাস্টার মশাই। কিন্তু কামার পাড়ায় আলাদা পরিচয়, পালান অঙ্কে পণ্ডিত হয়ে গেছে। লেটার পেয়েছে···কম কথা।

এখন কাপড়ের সঙ্গে কলার দেওয়া ফুলশার্ট জামা পরে। হাতে স্টিলের

বাঁটের ছাতা, অল্প বয়েস হলেও সম্মানে ভারি মুখ। দু-তিনটে গাঁয়ের মানুষের কাছে পালান কর্মকারের আলাদা আবেশ, বাড়তি বিশ্বাস।

—আরে এসো বিনোদবাবু

বিনোদ হাঁপিয়ে জিজ্ঞেস করে,—যাবো কোথায়? খোলসা করে বলো—পলু মাস্টার দু-হাতে স্টিলের বাঁটটাকে মুঠো পাকিয়ে নুরুলকে দেখেও তেমন মূল্য দেয় না, বরং একটু সময় নিয়ে ছাতার ডগাটা মাটিতে ঠোকে, কী যে করা উচিত। অতো বার ফাজিলটা যে হঠাৎ হাজির। তবু বিনোদের দিকে তাকিয়ে ভারি গলায় বলে,—খুব কঠিন কাজে। চলো না আমাদের সঙ্গে—

সঙ্গের লোকজন সায় দেয়, আগো চলো না বিনোদবাবু। দুটো কথা বলবে কইবে—

নুরুল অবাক হয়! ছাগল চালানী বিনোদ—আবার বাবু হয়! আমাকে তাহলে! সাহেবদের সঙ্গে চাকরি করি···

—খুর বাপু। কিছু জানলুম নি শুনলুম নি শুধু বলতে কইতে বললে হয়? কথাটা ঢালতে ঢালতে পিছু হটে বিনোদ কাঞ্জি।

পালান মাস্টার এগিয়ে যায়, কাল রাতে মিটিং করে যা ঠিক করেছে সেটাই বলবো আমরা। দেখো না ঝোড়া কোদাল সঙ্গে—

বিনোদের বউ দরজা গোড়ায় দাঁড়ায়। মাথার ঘোমটা খানিক খসে গেছে। বউটা একবার চেঁচিয়ে বলতে চাইলো, এদিকে শোনো না—। কিন্তু বলতে পারে না। সামনে চেনা অচেনা অতগুলো লোক। বড্ড বেহায়া ভাবে যদি!

—তা কোথায়? মানুষগুলোর জাঁতাকলে পড়ে যায় বিনোদ। ওদের এক আধখানা ছাগল ছানাও তো আছে।

—লক গেট, বললো পালান মাস্টার।

—সামনের লোকগুলো পাঁচ ছজন সমস্বরে জানায়, এদেশে কি কাজের লোক নেই? বিদেশের লোক পয়সা কামিয়ে যাবে—

বিনোদ কাঞ্জি সুরটা ধরে ফেলে। একটু এদিক ওদিক তাকায়। দেখতে পায় বউ দরজা গোড়ায় দাঁড়িয়ে। থাক বউটা অমন দাঁড়িয়ে, এই কাছাকাছি বিশ পঁচিশ মিনিটের রাস্তা লকগেট। কতক্ষণ আর সেখানে লাগবে? এতগুলো লোকের সামনে আবার বউকে বোঝাতে যাওয়া আর এক খোঁটা। লোকে বলবে, শালা বিনোদ ছাগল বেচে বেচে বউটারও ছাগল হয়ে গেছে। সুতরাং কিছু না বলে ঘর দোর পিছনে ফেলে পালান মাস্টারের সঙ্গে হাঁটে। পিছনে পাশে মানুষগুলো।

একটু থমকে ফেরে বিনোদ। নুরুলটা দাঁড়িয়ে!—কিরে যাবি?

খানিক মর্যাদা পেয়ে আবার হালকা হয়ে যায় নুরুল।— যাবো?

চলো—তোমাদের দেশ উদ্ধার দেখে আসি। পলু মাস্টার একবার মাত্র পিছনে তাকিয়েছিল।

রোগা রোগা আল। বাবলা ছায়ায় বাদা মাঠ ভেঙে পায়ে পায়ে এগোয়। হাঁটতে হাঁটতে মনে হল বিনোদের, কোথায় যেন জোর পাচ্ছি। বুকের মধ্যে উত্তেজনার দাপানি। সঙ্গে এতগুলো মানুষ। তারাই আবার আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে।

পালান মাস্টার হাঁটতে হাঁটতে পরামর্শ দেয়—যা বলার আমি বলবো কইবো। তোমরা কান খাড়া শুনবে, বুঝবে। উলটোপালটা বলে সব যেন তালগোল পাকিয়ে দিও নি—

পালান কর্মকার বিনোদ কাঞ্জি সামনে, পিছনে ঝোড়া কোদাল হাতে মানুষগুলো। সকালের হাওয়ায় খাটো বাবলা চারাগুলো কাঁপছে। ওপাশে মাঝ মাঠে খান কয়েক তাল গাছ হাওয়ায় পাতা দুলিয়ে শুকনো ডাগলায় খড় খড় আওয়াজ তুলে জায়গাটা গম্ভীর করে দিলো। ছিট ঘুঘু বিশ্রী ডাকে মাঠ চিরে বেরিয়ে যায় গাঙের দিকে।

ভিনদেশি শতিনেক লোক তখন গোছগাছ করে সাইটে কাজে লাগতে শুরু করেছে। কোদালিরা কোদাল বাগিয়ে মাটিতে এক কোপ বসিয়ে মাটি তুলবে, এমন সময় পালান কর্মকার হাঁক দেয়, জীবনের প্রথম জোরে হাঁক দেয়,—ও ভাইরা তোমাদের দফাদার কনট্রাক্টার বাবুরা কই গো— ?

জিজ্ঞাসাটা যেন কেমন খটকা লাগায় তাদের কানে। কোদাল ফেলে সোজা দাঁড়ায়। এক ঝাঁক সবুজ টিয়া রাঙা ঠোঁটে কাদের ভাঙা ধানের কাঁড়ি থেকে শিস কেটে নিয়ে যাচ্ছে নিজের আস্তানায়।

কোদালি লোকটা দেখলো, জিজ্ঞাসা করছে যে মানুষটা কেমন···ধুতি জামা জুতো পরে! হাতে ছাতা নিয়ে কেমন বাবু বাবু গন্ধ। পিছনে আশি নব্বইজন মানুষ। লেবারদের কাছে বিস্ময়ে আতঙ্ক দানা বাঁধে।

কোদালি বললো, কন্‌টাকটার বাবুকে ইখানে পাওয়া যাবে নি। তিনি তো কলিকাতায়—

—তবে দফাদার ?

—তিনি তো···বোধহয় ওদিকের খাতায় আছে—

পালান মাস্টার এদিক ওদিক তাকায়। পিছনের লোকজন গুঞ্জন তোলে, তাহলে···। তাদের মুখের রঙ পালটে যায়। চোখের তারায় খানিক আশাভঙ্গের ঝিমুনি। পালান মাস্টার একটু জোর দেয়—তোমরা কেউ দফাদারকে ডাকো। বলো, এলাকার লোকজন কথা কইতে এসেছে—কোদালি আর মাথালি লোকজন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে।

হাতের কাজ থমকে যায়। চুপচাপ ভ্যাবলা।

ওপাশে লেবারদের হোগলা ঘরের সামনে কুড়ুল কাঠ চেলাইয়ের শব্দ। কাঁচা বাবলা কাঠ ফেড়ে শুকোতে দেবে। টেনে গেলে জ্বালানী। লেবারদের পাঁচ নম্বর হাঁড়িতে ভাত ফুটবে।

হুটপাট করে শ্রীকণ্ঠ আসে। ঘাস মাড়িয়ে নাড়া থেঁতলে জোরে জোরে পা ফেলে। কাছাকাছি এসে হাঁকায়, আরে তোরা কাজ ফেলে দাঁড়িয়ে আছু যে— ? নে কাজ চালা—দেশের মানুষের সঙ্গে তো কথা কইবো। একবার কেন একশ বার—

পালান কর্মকারের পিছনের একজন যাত্রার গলায়, খবরদার। এক কোদালিও মাটি উঠবে নি—

দফাদার শ্রীকণ্ঠের মাথায় বাজ লাগে। একদম ঝলসে যায় চোখ মুখ। পালান একবার পিছনে তাকিয়ে ইঙ্গিতে থামাতে গিয়েও সামলে নেয়। দেখা যাক না, একটা ফোঁসে কেমন অবস্থাটা দাঁড়ায়। মনে হয় পালানের, দফাদার লোকটা পোড় খাওয়া। ইঞ্জেকসানটা কেমন ধরে। শ্রীকণ্ঠ বুঝতে পারে, সামনের ছাতা হাতে জামা গায়ে মানুষটাই কর্তাব্যক্তি। পিছনে গেঞ্জি গায়ে নাটাগড়ন বিনোদ কাঞ্জি। লোকটাকে দু-চারবার দেখেছে বলে মনে হয়। শ্রীকণ্ঠ এবার ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কোথায় বসতে দিই বলুন তো আপনাদের ! তা এক কাজ করলে হয়, আমাদের হোগলা চালায় চলুন না, বসে কথা হবে—

পালান মাস্টার পিছনে তাকিয়ে সম্মতি চায়। যাত্রা গলায় লোকটা বলে, না। তাহলে এদিকে কাজ চালু হয়ে যাবে যে—

—অ। শ্রীকণ্ঠর গলা গড়িয়ে শব্দটা বেরিয়ে আসে। নিজেকে সামলে নিয়ে শ্রীকণ্ঠ আবার বলে, তাহলে এই আলের উপর বসে ? আচমকা গায়ের জামাটা খুলে পেতে দেয় আলের ঘাস মাটিতে, বসুন—

পালান মাস্টার অবাক ! পিছনের মানুষগুলো দৃশ্যটায় থতমত খায়। আতিশয্যে কেমন দম হারিয়ে ফেলে।

নুরুল বুকে হাত বেঁধে ঠোঁট কামড়ে হাসি বাগে আনে, মহা ঘোড়েল মক্কেল তো··· !

পালান মাস্টার বেশ তরল গলায় বলে, দেখুন ভাই, আমার সঙ্গে এরা কাজ চায়—এদের দেশের রাস্তায় মাটি কাটা—

—বেশ তো ভালো কথা। কনটাকটার কাল বিকালায় আসবে, তেনাকে বলুন—। তার কাজ তার টাকা—, শ্রীকণ্ঠ বলতে বলতে পালান মাস্টারের মুখ চোখ, পিছনে ঝোড়া কোদাল হাতে মানুষগুলোকে নজর করে।

মাটি কেটে বড় বড় চৌকোয় কোদালি লেবাররা কোদাল ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। কথা শুনছে। তাদের বুকের ভিতরে ঢিপ্‌ঢিপ্‌ শব্দ।

—না। কনটাকটার ফনটাকটার দেরি হয়ে যাবে। এখন এতো,

লেবারের সঙ্গে ওদের জুড়ে নিন—, বললো পালান মাস্টার।

—সর্বনাশ! কথাটিকে খুব প্রলম্বিত করে শ্রীকণ্ঠ। কণ্টাক্টরবাবু কাজ বুঝে লেবার দিয়ে গেছে—। আমি বাড়াবার কমাবার কে? আর একটু ঘন হয়ে দাঁড়ায় শ্রীকণ্ঠর গায়ের কাছে,—তাহলে এক কাজ করুন। আপনি যখন কেউ না তখন আপনার হাফ লেবার আর এলাকায় হাফ লেবার মিলে কাজ চালু হোক—

শ্রীকণ্ঠ শুধু কথাটা শুনে যায়। তখনই কিছু বলে না।

মাটি কাটা চৌকায় দাঁড়িয়ে কোদালি ভীমপদ চমকে ওঠে! মুচড়ে যায় ভেতরটা;···হায় ভগবান। এক হপ্তার মজুরিটা পেলে ঘর পাঠাব। পোয়াতি মেয়েটার সাধ খাওয়াব—তার তো সব চটকে গেল!

—কিন্তু, শ্রীকণ্ঠ ধীরে ধীরে বলে,—এই লেবাররা যে অগ্রিম লিছে সে টাকা শোধ উঠবে নি যে—

বিনোদ এগিয়ে আসে। শ্রীকণ্ঠকে বলে, এটা একটা সমস্যা? ধুর বাবু—তুমি কন্দিনের দফাদার?

শ্রীকণ্ঠ এবার চটে যায়। লোকটার কথাবার্তা বড্ড কাঠুরে পাথুরে। তবু শোনে, বলুন না—

—তোমার আদ্ধেক লেবার আমাদের গ্রামবাসী আদ্ধেক লেবার, বেশ তো?

বেশ তো?—হুঁ।

—এবার একদিন করে তোমার আদ্ধেক লেবার আমাদের আদ্ধেক লেবার, পরদিন তোমার বসতি আদ্ধেক লেবার আমাদের বসতি আদ্ধেক লেবার মিলে রোজ কাজ চলুক—

কথার তোড়ে সবাই হাবুডুবু। ক্ষুদিরাম দাস কড়া গলায় বলে, হইবে ক্যামনে?

সবাই ঘাড় ফেরায়। শ্রীকণ্ঠ বুকে জোর পায়।

—তা হলে বিদেশ থেকে আসছে এই লেবারগুলান ওদের যে পুষাবে নি

—না পুষাক। যাত্রাগলার হরিপদ বলে।

—ওদের বাল বাচ্চা নাই— ? ক্ষুদিরাম তড়পে ওঠে।

—আমাদেরগুলো গোরু ছাগলের নাকি গো ক্ষুদিবাবু? জিজ্ঞাসায় বক্রোক্তি।

পালান মাস্টার থামাতে চায়। কেউ থামে না। বিনোদ খেপে যায়—তোমার অতো জ্বালা কেন গো ক্ষুদিরাম? তোমার খাতায় তো যাই নি—

—ও শালা কলোনির বাচ্চা তো—হরিপদর গলায় ভীষণ কটু মুখভঙ্গি। ক্ষুদিরাম চড়া গলায় বলে, খুব সাবধান হরিপদ, গুনোপদর ঝাড়

—তোর দাবড়ানিকে ভয় পায় কোন শালা। দেশ জ্বালিয়ে এদেশের মাটি কামড়াচ্ছিস, কামড়া। কলোনির মেছো—রি-ফু-জি

যাত্রার হরিপদর কথায় একদম নিভে যায় ক্ষুদিরাম। গোটা কলোনির টিকি ধরে নাড়া দিল লোকটা। হরিপদ, গনোপদর বেটা!

পালান মাস্টার দাবড়ি মারে, হরিপদ, থামো দিকি

হরিপদ এগিয়ে আসে—না মাস্টার ভাই। ওর অতো কত্তাগিরি কেন? কলোনির কত্তাগিরি করে বলে আমাদের পাঁচ সাতটা গেরামের উপর কথা ফলাতে আসে কোন সাহসে? একটা বাজে লোক—

ক্ষুদিরাম খেপে যায়,—মুখ সামলে হরিপদ ভাই

—আরে রাখো। তোমার অনেক কম্ম জানা আছে। একাদশী পাড়ুইকে মনে আছে?

—কে, কেডা একাদশী?

—ও শালা! তোমাদের কেল্লার গড় ফিশারি যে লিজ নিয়েছিল গরমেণ্টের কাছ থেকে?

ওসব চিনি না

—আহা ন্যাকা! তাকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দাও নি? সব মাছ লণ্ড-ভণ্ড করে বেচে দাওনি? সে বেচারা তো লিজের টাকা শোধ দিতে জমিজায়গা বেচে আর একটা বাস্তুহারা হল। হয় নে? মানুষের মতো কাজ হয়েছে তোমাদের?

ক্ষুদিরাম আর কথা বলতে পারে না।

পালান মাস্টারের পিছনে লোকজন সবাই এক সঙ্গে বলে ওঠে, হ্যাঁ হ্যাঁ। হাটের ভালোমন্দ লোকজন না থামালে সেদিনই কলোনি ছাড়া করে দিতুম—

ব্যাপারটা বেশ তেতে উঠেছে। শ্রীকণ্ঠের লোকজন হাত গুটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওখাতার লেবাররা তাদের দফাদার ক্ষুদিরামের এমন বে-হাল অবস্থায় বেশ মজা পাচ্ছে।

যাত্রা গলার হরিপদ একটু এগিয়ে এসে রঙঢঙে গলায় বলে, নিজেদের পৈতৃক ভিটে মাটি ক্ষ্যায় দিয়ে এসে এবার পরের রুজিরোজগার মারতে এসেছ বাবু? যাও কলোনিতে ফিরে গিয়ে পুরোনো কামান বন্দুক শান দাও গে—

ক্ষুদিরাম নিথর। বাক্যহারা।

পালান মাস্টারের সঙ্গে মানুষগুলোকে প্রায়ই দেখতে পায় বাস-মোড়ে। হাটবারে। হাসপাতাল বিয়ে মায় কাপড় চোপড় ওষুধ পততর কিনতে কতবার যে আসে কলতার বাজারে। কলোনির গড় ফিশারির পাড়ে দাঁড়িয়ে সব মুখগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়। বুকের মধ্যে আক্রোশ দানা বাঁধে। তবুও কিছু বলে না। বুকের মধ্যে কষ্টটা বরফের চাঁই হয়ে সব যন্ত্রণাকে

অবশ করে দিয়ে একটা অনুতাপের, অভিমানের ধারা বইতে থাকে। সত্যিই তো নিজের দেশ ছেড়ে পরের দেশে ফন্দি ফিকির করে খাবলা মেরে বাঁচতে থাকার চেষ্টা···। এমনটা যে কেন···! জন্মের দোষ···

—শুনুন গো,—পালান মাস্টারের গলাটা আপাত থমকানো পরিবেশকে ঝাঁকুনি দেয়। সকলে কান খাড়া করে তাকায়, ক্ষুদিরামবাবু

—বলেন মাস্টারবাবু

—কাজ এখন স্টপ থাকল। আপনাদের কনট্রাক্টরবাবু এলে আমাদের ডাকবেন—আসব

বিনোদ আর একটু তরল করে দেয়—, তোমার কোনো দায় নেই। গ্রামবাসীর আপত্তি—

মাস্টারের পিছনে লোকজন সবাই বলে ওঠে—, তাই তো আপত্তি না তো কি? এটা ছেলেখেলা?

আকাশে সূর্যের চেহারা বদলায়। বড় চাঙ কয়লা পোড়া আগুন ভাপ রোদ্দুরে। গাছপালার ছায়া সরে সরে দিক পালটাচ্ছে। গা গলায় ঘামের ধারা। ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে পালান মাস্টারের পিছনে লোকগুলো দু-দুটো খাতার লেবারদের দেখে। ভিনদেশি লেবারদের ফিসফাস কথাবার্তায় বারুদের ঝাঁঝ।

বিনোদ বললো, মাস্টার চল। কথা যা হবার তো হল।

পালান কর্মকার ক্ষুদিরাম, শ্রীকণ্ঠকে একবার একটু দেখে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলে, তাই তো এরপর আর কি? যা কিছু কনট্রাকটর সাহেবের সঙ্গে।

জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যায়। সামনে পালান কর্মকার পাশাপাশি বিনোদ কাঞ্জি! হঠাৎ নুরুলের মনে হল, তাই তো চলে যেতে হবে। এতক্ষণ যেন চোখে রঙিন চশমা পরে সব দেখছিল। পালান মাস্টার···সে না হয় মাস্টার লোক। হরিপদ···হরিপদটা···! প্রাইমারি ইস্কুলে বাঁশি ফুঁকোতে শিখে গেছিল! সে এত বলতে পারত···! হঠাৎ মনে হল, যেদিন দেশে ফিরি··· সেদিন সি পি টি-র মাঠে লোকগুলো কারা! আর···কী যেন···হাতড়ায় নুরুল নিজের মধ্যে, সঙ্গী সাথী নিয়ে তড়পালেও তো বেশ কাজ হয়।

বাবলা বন, এবড়ো খেবড়ো আল পথ তাল অর্জুনের ছায়া কাটিয়ে মানুষগুলো হেঁটে ফেরে।

ক্ষুদিরাম দাঁড়িয়ে দেখে। খোঁটা বরাবর নতুন মাটির চাঁই। উঁচু নিচু ঢিল ঢিবি। তেজি রোদ শুষে নিচ্ছে ফেলা মাটির রস। লেবারগুলো কাজ ফেলে এদিক ওদিক বসে আছে। উপুড় করা ঝোড়া কোদালে হা-হা বাতাস কাটে। বুকের ভিতরটা ফাঁকা লাগে। ভেতরটার গোড়া ধরে নাড়া দিয়ে গেল কটা লোক। পাশ গাঁয়ের মানুষ। কারুর বাপ পিতামহের কেনা

জায়গায় তো কলোনি নয়। একদম জল জঙ্গলে সাপ খোপে বাতিল জায়গায় সত্তরটা সংসারের ছায়া ছাউনি ফেলা! তাতেই এত রাগ রোষ। শাসা শাসানি। আর কারুর ডোবা পুকুর তো নয় একেবারে ভগবানের গাঙ। গাঙের মাছ মেরে জাল ভাসিয়ে পেটের ভাত যোগাড়।

—ক্ষুদিরামদা, শ্রীকন্ঠ খুব কাছে দাঁড়িয়ে ডাকে।

ক্ষুদিরাম শুধু পাশে একবার তাকায়।

—ভাবনা চিন্তা করলে, কী করা যায়? এত লোককে বসিয়ে বসিয়ে খোরাক দেওয়া···

ক্ষুদিরাম দাস কোনো উত্তর করে না।

শ্রীকন্ঠ বলে, রাস্তাটা তো সি পি টির মাঠ অব্দি যাবে?

ক্ষুদিরাম ফিরে তাকায়। শ্রীকণ্ঠের কথায় কান দেয়।

—আমি বলছিলুম—অনেকদিনের কাজ তো ওদের সঙ্গে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিলে আর বসিয়ে খেতে দিতে হয় নে—

ক্ষুদিরাম মুখ বাঁকায়, তুমি কে? গরমেণ্টের বাবু?

শ্রীকণ্ঠ দমে যায়।

এবার ক্ষুদিরাম দাস কলোনির ক্ষুদিরাম বনে যায়। শ্রীকণ্ঠকে ধমকে বলে, মিনিস্টার, অফিসার এস. পি-র বোর্ড মিটিংয়ে যা বলবে—তাই-ই হবে। এটা লাটের নোনা বাঁধ বাঁধাই কাজ নয় রে ভাই—

কথাটা সত্যি। শ্রীকণ্ঠ ক্ষুদিরামের পরামর্শে নুয়ে পড়ে। কিছু না বলে একবার তাকায় নিজের ব্যবস্থা করা লেবার শেডটার দিকে। উনুনে পাঁচ নম্বর হাঁড়িটা চাপানো। হাঁড়ি ঘিরে লেবার মানুষগুলো গোল হয়ে বসে। একজন হাঁড়ির ঢাকনা খুলতেই গরম ভাতের ধোঁয়া। ভাতের গন্ধ এখানে। শ্রীকণ্ঠর নাকে।

দু 'একটা 'কাক পাখি ডেকেছে। হরিপদ অনেক কসরতে একতারাটা বাজায়। তেমন লয় জ্ঞান নেই, আঙুল কটা ভালো রপ্ত হয় নি। তবু বাজায়। আগে আড়-বাঁশিতে ফুঁ দিত হরিপদ। যাত্রার সুর পার্টিতে এক বাঁশিওয়ালা ফুঁ দিতে দিতে মুখ থেকে রক্ত চলকে বেহাল। আসর থেকে

ধরাধরি করে মসজিদের খাটিয়ায় সোজা পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে হাসপাতাল। এ গল্পটা কানে আসার পর সকলে পরামর্শ দেয়, ওরে হরিয়া বাঁশি ছাড়। হাসপাতাল যে অনেকদূর—সেই থেকে একতারাই সঙ্গী। ঘরের দাওয়ায় বসে বাপের হাতে পোঁতা নিম গাছটার দিকে চেয়ে চেয়ে তারে আঙুল ঠুকে যায়। একটু একটু করে রাতটা ফিকে হয়ে আসে। দুধ জলের আকাশ। নিজের মতো করে বাজায়। পাশ কামরায় মা ছটফট করে। মনে মনে গজরায়, ঘুমুতে দেয় নে ছেলেটা। কী যে শখ…

গোটা কাঁকাল মেঘ মৌজার মাটির ঢালে কটা সংসার, ঢালের পরে পথ চলাচলের রাস্তা। রাস্তার পাশেও কটা সংসার। সব মিলিয়ে পঁচিশ ঘর। ওরা জেগে ওঠে। কঘর পরেই ঝুমরিদের ঘরবাড়ি। একটু ফরসা হতেই মা ছাগলগুলো উঠোনের খোঁটায় বেঁধে দেয়। বড্ড নাদি। বিদঘুটে গন্ধ সারা রাতের পেচ্ছাপে। জন্তুগুলোকে উঠোনে বের করে দিলে গু-মুত যতটুকু কমানো যায়।

গায়ে গতরে বেড়ে উঠেছে চাঁদ কপালে পাঁঠাটা। কপালে শাদা লোমের চাঁদে হাত বুলোতে বুলোতে মা ভাবে, আর কটা মাস পালতে পারলে এটার দাম শ-তিনেক উঠবে নি? কিন্তু খাবেটা কি? মাঠ ঘাটে ঘাস পাতা কই… বোশেখ জষ্ঠ্যি গেল…এক ফোঁটা জল নেই আকাশে। মানুষের খোরাক হয় কিনা কে-জানে।

খোঁটায় দড়িটা বাঁধতে গিয়ে হাত ফসকে যায়, ছাগলটা আল্গা তিড়িং লাফে নাগালের বাইরে। দড়িসুদ্ধ ছুটে পালায়।

—এই—ই যা-যাহ্—, বলে ভোর বেলাতেই মা চেঁচায়।

ঘুম ভেঙে গেলেও ঝুমরি আড়গোড় দিচ্ছিল বিছানায়। বিরক্ত মুখে বেরিয়ে এসে বলে, কী হল আবার?

—যা মা যা—দড়িসুদ্ধু চাঁদ কপালীটা পালিয়েছে। কার বাগান ভাঙে, কে আবার দড়ি খুলে নেয়—এ সাতসিকে দু-টাকা খরচ—। আঁচলটা গায়ে বুকে জড়িয়ে বাসি গায়ে পা ফেলে। দু-দিকে পলকা ডালপালায় ঘেরা বাগান। বেগুন ঢেঁড়শের গাছ আগলানো। যদি পাঁঠাটা কারুর কষ্টের বাগানে গাছ চিবোয়, বড্ড অন্যায় কাজ হবে। তাই চারদিকে তাকিয়ে নজর করে পথ এগোয়। হঠাৎ কানে আসে টুং টাং বাজনা। ভোরবেলাতে একতারার বাজনায় ঝুমরি থমকে দাঁড়ায়। বুকটা থর থর করে কাঁপে। চারদিক ফাঁকা ফাঁকা, ভেতরটাও। ওপাশে গাঙের পেট থেকে পাইপে ওগরানো মাটির ঢিবি ভোরের পাহাড় হয়ে চুপচাপ। মাটির পাহাড়ে গলা অব্দি গিলে থাকা কখানা নারকেলগাছ। গাছগুলোর লম্বা পাতা এখন আবছা অস্পষ্ট। এগিয়ে যায় ঝুমরি। কোথাও নেই ছাগলটা এত ভোরে

পাঁঠাটার পিছনে ছোটাছুটি পোষায়। হঠাৎ মনে হল দুস্ যদি মানুষ পাঁঠার জন্যে এত ছোটাছুটি করতুম তবু কাজে দিত।

অঘোরের বাড়ি পাশ কাটিয়ে এগোয় ঝুমরি। পিছন ফিরে দেখে পণ্ডিদি কি আছে? বরে নেয় নে, না নিক ধান নিয়ে চাল করে বেহালা কলতায় বেচতে যায়। গায়ে কী চিকন! কপালে টিপ কুঁচিয়ে শাড়ি, একদম আইবুড়ো পণ্ডিদি। হাফশার্ট ফুল প্যান্টুল পরা রোগা রোগা ছেলেটার সঙ্গে সেবার গাঙ পাড়ে গায়ে গা ঘেঁষে কত গল্প।

পণ্ডিদি বলেছিল, ঝুমরি বেহালায় ওর সঙ্গে ভাই পাতিয়েছি রে। যাবি বেড়াতে? কত যত্ন করবে, একটু ফিচকে হাসি হেসে পণ্ডিদি আরও বলেছিল, ওর না পাঁচ ছটা বন্ধু কারখানায় কাজ করে। যাবি বেহালায় একদিন ভাইয়ের মেসে—

—ভাই না ছাই। বরের কাছে খেদানি খেয়ে তোমার খিদে বেড়েছে। খিদে মেটাচ্ছ—ভাই হোক আর যাই হোক—বেটাছেলে তো—?

মট করে শুকনো পালা ভাঙার শব্দ। চমকে ওঠে ঝুমরি। চোখ চালিয়ে দেখে, ছাগলটা সামনের দু-পা মুড়ে বাগানের বেড়ায় মুন্ডু গলিয়ে কাঁচা ঘাস চিবোচ্ছে। পা টিপে টিপে পেছন থেকে খাপটে ধরে পাঁঠাটাকে। টেনে বুকের কাছে সরিয়ে জাপটে ধরে।

ভোরের হাওয়াতেও চোখে মুখে গরম, সিরসিরিয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ। এখন পণ্ডিদিকে ভুলে গিয়ে সঙ্গের রোগা রোগা শার্ট প্যান্টুল পরা ছেলেটা স্পষ্ট ফুটে ওঠে চোখের তারায়।

বুবু-বু-হু করে বিশ্রী ডেকে ওঠে বুকে জাপটে ধরা ছাগল ছানাটা। বিরক্ত হয়ে নামিয়ে দেয়। দাঁড় ধরে বাড়ির দিকে হাঁটে ঝুমরি। একতারাটা জোরে জোরে বাজছে। হরিপদর সামনে নিম গাছটা থম মেরে শুনছে। কোথাও কোনো গোলমাল নেই। শুধু বাজনাটা হাওয়ায় হিমে ভোরের আলোয়।

ঝুমরি একপা দুপা করে এগোয় হরিপদর উঠোনে। মাটির দেওয়ালে হেলান দিয়ে বাজনায় ডুবে আছে হরিপদ। গুনোকাকার ছেলে।—এই হরিদা, খুব হালকা গলায় ডাকে।

খেয়াল নেই হরিপদর। কেমন বিভোর মগ্ন হরিপদ। ঝুমরি একটু সম্ভ্রম জানায় মানুষটাকে। বরং দু-এক পা করে হেঁটে হেঁটে দাওয়ার দিকে এগোয়।

মানুষের পায়ের শব্দ, হাওয়া শাড়ির গন্ধ চুড়ির ঠুন ঠান্। একটা মানুষের পদচারণা টের পায় হরিপদ। বলল,—কে গো? বাজনা থেমে যায়।

—আমি ঝুমরি

—এত সকালে।

—বাজনা শুনতে

—সত্যি···, তারিফে গলে যায় হরিপদ। একতারাটা দাওয়ায় বসিয়ে তর তর করে নেমে আসে উঠোনে।—কোনো দরকারে ডাকতে এসেছিস ?

—না গো এমনি, হাসে ঝুমরি। উসকোনো চুল, বাসি দাগ মুখের ভাঁজে, শাড়িতে বিছানার গন্ধ।

—দাঁড়া। আমিও যাব তোদের ওদিকে, বলে আবার দাওয়ায় উঠে যায়। একতারাটা দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখে কাটা দাঁতনটা নিয়ে বেরিয়ে আসে।

—চল

পাশাপাশি হাঁটে দু-জন। পঁচিশ ঘর সংসার। মানুষজন জেগে উঠেছে।

ঝুমরি বলল, আবার কোথাও যাত্রার বায়না পেলে বুঝি—

—গাঙের ওপারে শিবগঞ্জে একটা কথা হয়েছে মাত্র

—অনেক টাকা দেবে বলো ?

—দুস্। দলের মাস্টার বললো, আগে একতারায় হাত চালু করে এস—।

হাতের দড়ির টানে ছাগলছানা গুড় গুড় করে হাঁটে। তেমন বিরক্ত করছে না। মা দেখতে পেয়ে চেঁচায়—কি রে পেলি ?

—এই তো

—সকাল বেলায় এক বিপদ সামলালি তবু। সারাটা দিন এখন পড়ে—

হাঁটতে হাঁটতে ঝুমরিদের বেড়া ঘেরা উঠোন, উঠোনের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরটা।—আসি গো হরিদা

হরিপদ চট করে কিছু বলে না। বরং ঘরদোর খোঁটায় বাঁধা ছাগলগুলো সব দেখে বলল, তুই বাজনা শিখবি ?

ঝুমরি ফিরে দাঁড়ায়। হরিপদর জিজ্ঞাসাটা একদম বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। ঢেউ তোলে। ডান হাতটা বাড়িয়ে মেলে ধরে বলে, আমার এ আঙুলে হবে ?

চোখের সামনে ফরসা সরু সরু আঙুল, যত্ন করে কাটা নখ। এত কাছে। ঝুমরির আঙুলের ডগায় নখে শস্তা নেল পালিশের দাগ। টকটকে লাল নেল পালিশের রঙে হরিপদর ভেতরটা দাপিয়ে ওঠে। কিছু বলতে না পেরে বোবা।

ঝুমরিও ঠায় দাঁড়িয়ে। পা নড়ে না।

হাতের দড়িতে টান লাগে। ছাগলছানাটা আস্তানায় সঙ্গী পশুদের পেয়ে ছটফট করে ছাড়া পাবার জন্যে। বুব-বু-হু শব্দে বিশ্রী ডাকে। পরিবেশটা টোল খায়।

হরিপদ হাতের দাঁতনটা জোরে চাপদেয়।—আসি বলে তর তর করে এগিয়ে যায় হরিপদ। লুঙি ফেট্টি দিয়ে কোমরে বাঁধা। হাওয়ার মুখোমুখি হাঁটে। প্রথমে জোরে ক্রমশ পায়ের শব্দ মিলিয়ে যায়। বাঁক নিতেই হরিপদ চোখের বাইরে।

সকালের গাঙ। দু-চারখানা বোট পাল খাটিয়ে কলতার দিকে চলেছে। ডিঙিতে মেসিন ফিট করে ভুটভুটি ফেরি দিচ্ছে এপার, লোক নিয়ে ওপারে শিবগঞ্জের ঘাটে। হরিপদর মনে হল, বাঁশির বদলে একতারাটা আগে শেখা থাকলে কাজের হত! এবারের মহড়ায় অগ্রিম মাইনে পেতুম। যাকগ্যে পঞ্চায়েতের হৃদয় মাস্টার কী খবর দেয়! বলেছে ত সাঁকরাইলের জুট মিলে মাস্টারের বন্ধু আছে একটা ব্যবস্থা করে দেবে—কথাগুলো মনে হতেই তাকায় দক্ষিণ দিক বরাবর। এখন ফাঁকা ফাঁকা—বাঁধ বরাবর রাস্তা। দু-একজন লোক গাঙ পাড়ে প্রাতঃকৃত্য সারতে আড়াল খোঁজে।

একটা জাহাজ চলেছে সমুদ্র থেকে কলকাতার দিকে। পিছু নিয়েছে কয়েকখানা শাদা পাখি। জাহাজটার গায়ে লাল কালো রঙের বর্ডার। কালো অব্দি জলে ডুবে, বাকি লাল দিকটায় নোনা ধরা ছোপ। অনেকদিন নোনা জলের সমুদ্দুর বেয়েছে। এবার মাল পত্তর নিয়ে কলকাতায় ভিরোবে। এমন এক জাহাজ কেরোসিন তেল নিয়ে সেবার ফিরেছিল না! তখন গাঙে চড়া। জাহাজটা আন্দাজ করতে পারে নি গাঙটাকে। চড়ায় গিয়ে ধাক্কা মেরে কাহিল। ব্যারেল ব্যারেল তেল, নাকি ট্যাংক ফুটো করে খালাসিরা ফেলে দিয়েছিল জাহাজ হালকা করতে। সেই তেল জলে ভেসে গাঙময় গন্ধ। গাঙ পাড়ের মানুষেরা গামছা ন্যাকড়া ছুবিয়ে ছুবিয়ে নিঙড়ে হাঁড়ি, কলসি, বয়েম ভর্তি করেছিল।

মস্ মস্ করে জুতোর শব্দ। নোনা বাঁধের বুক এখন মসৃণ। খুব সহজে হেঁটে আসছে লোকটা। কাছাকাছি আসতে বুঝে ফেলে বিনোদ কাঞ্জি। তখন একবার বাঁধ বরাবর তাকায়। বরং একটা সাইকেলের ঘণ্টির শব্দ হলে ভালো হত! হৃদয় মাস্টারকে বলা যেত, মাস্টারমশাই জুটমিলের খবর হল? পাশ কাটিয়ে নামতে গিয়ে বিনোদ বলল, হেই হরিপদ—

নিম দাঁতনের থুতুতে মুখ ভর্তি। পুচ করে ফেলে বলল, বলো—

—সে দিন তো খুব ধাতিয়ে এলি কলোনির ক্ষুদিরাম দফাদারকে। তা কাজে যাস নি যে

—ধুর বাবু। ওকি আমার জন্যে? দেশের পাঁচ জনের জন্যে—বিনোদ হাসে—বাপুরে—এতবড় মানষেমি—?

—চললে কোথায়?

—তোদের পাড়ায়। বউদির দেনা দিতে—

বুকটায় চিক্কর মারে। কোনো কথা বলতে পারে না। সত্যিকারের তেমন দরকার থাকলে বিনোদের সঙ্গে ঝুমরিদের বাড়ি যাওয়া যেত……।

—ঘরে যাবি নাকি ? চল—

—না হৃদয় মাস্টার এবার আসবে বলে মনে হয়

—তা আমি চলি। বড্ড কাজ এটা সেরে লরি ধরতে যাব—বলে গড়ানে পা ফেলে বিনোদ। হরিপদ এগিয়ে যায়। কাছাকাছি এগিয়ে এসে বলে, লরি কেন ?

চট করে বলতে যাচ্ছিল, নতুন রাস্তার বালি দুবো তখনই জিভ সামলে কথাটা হড়কাতে দেয় না বিনোদ। বরং কৌতূহল মেটাতে বিনোদ আর একটা খবর দেয়, হ্যাঁরে হরিপদ ; ওদিকে কটা প্যান্টুল পরা বাবু লোক মাপামাপি করতেছে—কেন বল দেখি ?

—কোথায় গো ? কাদের গেরামে—। উৎসাহের উজ্জ্বলতা নেই। দু-চোখে আতঙ্ক জড়িয়ে বিস্ময় ! মাস ছয়েক আগে তো সেটেলমেণ্টের কে জি ও আমিনরা মেপে জুকে আটেস্টেশন করে গেল !

—ওই তো শীতল বেড়ে। জুব্বার মিঞার খামার বাড়ির দিকে খাতা প্যান্সিল নিয়ে লোকজন—

—ওরা আবার কারা। শুনলে কিছু— ?

—না। পড়ি মরি করে আসতেছি। ফেরত পথে সব শুনতে পাব—

বিনোদ ঢিল ঢিবির রাস্তায় খট্ খট্ শব্দে এগোয়। নাটা গড়ন মানুষটা আস্তে আস্তে ডাইনে বাঁক নিয়ে মিলিয়ে যায় ঝোপ ঝাপ দু-এক ঘরের আড়ালে। এখন বড্ড দোটানায় পড়ে হরিপদ।

ফাঁকা বাঁধে দাঁড়িয়ে তাকায় দক্ষিণ দিক বরাবর। শুধু মাঝখানে পায়ের চাপে শাদাটে ধুলোর রাস্তা, দু-পাশে ঘাসের হামাগুড়ি। একটাও সাইকেল চোখে পড়ে না। মোটা মোটা চেহারায় খান পাঁচেক তাল খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে ছায়া ফেলেছে। তারপরই বাঁধটা বাঁক নিয়ে শুধু আবছা রেখা। এক ছুটে শীতল বেড়েয় কাণ্ডকারখানা দেখে এলে কেমন হয়… ! পরক্ষণে মাথার চাঁদিতে কাঁটা ফোটে। যদি হৃদয় মাস্টার সাইকেলে বেরিয়ে যায় ? হয়তো…আজই দরকারি খবরটা দেবে হৃদয় মাস্টার—যা হরিয়া যা তল্পিতল্পা বেঁধে এখুনিই গাঙ পারিয়ে সাঁকরাইল চলে যা। একটু হাঁটলেই নারায়ণজীর জুট মিল। তাপসকে ধরলে সব ঠিক হয়ে যাবে—

পর পর তিন চারখানা স্টিলের ঝক ঝকে বাট বসানো টিফিন কেরিয়ার। পিছনে সিটের আংটায় টাইট। রোদ পড়তেই ঝিলিক মিলিক আলো। হাওয়ায় ঢিলে করে প্যাডেল মেরে এগিয়ে আসে সাইকেলটা। বুকের মধ্যে ঝিক্ মারে হরিপদর। উদ্বিগ্ন অপেক্ষায় ছট ফট করে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

হাতের দাঁতন হাতে আটকে আছে। বেরিয়ে গেলে ফিরতে সেই রাত আটটা। একদঙ্গল ছেলেকে টিউশানি পড়িয়ে তবে বাড়িমুখো হবে হৃদয় মাস্টার।

—হরিপদ খবর রাখিস কিছু?

গতি অনেক কমিয়ে দিয়েছে মাস্টার। সাইকেলটার পাশাপাশি হাঁটে হরিপদ।

—না। খুব সহজে উত্তর দেয় হরিপদ।

—ধ্যাত গবেট। বাক্স পেঁটিলা টেনে নিলেও তোর খেয়াল হবে না।

হরিপদ মচকে যায়। যেন ছেলেবেলায় মাস্টারের হাতে ছড়ি খেল। তবুও পাশাপাশি এগোয়। হৃদয় মাস্টার আরম্ভ করে, কাল তো জরুরি তলব। পঞ্চায়েতের সভাপতি, আমাকে, খোদ দিল্লির সেক্রেটারি স্পেশাল অফিসার এম এল এর মিটিং হল বি ডি ও অফিসে—

—তা সে আর জানব কি করে মাস্টারমশাই?

—যাক গে। শোন গাঙ পারিয়ে আর কাজে যেতে হবে না তোকে। কত কাজ তোর ঘরের ধারে—। করে পারলে হয়—অন্তত পাঁচ ছশ দিশি-বিদেশি কলকারখানা—

ধন্দে পড়ে হরিপদ। চারদিকে তাকায়, শুধু গাঙ ছেলে বেলার গাঙ কটা চেনা গাঁ গ্রাম। ওপাশে উটের মতো পিঠ ঠেলে সি পি টি-র মাঠ। কষ্ট করে দেখলে লক গেটটা। আর ইট সিমেণ্টে চারকোনা বাতিস্তম্ভটা গলা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নদীর দিকে চেয়ে। কাজের মতো কোথাও তেমন কিছু চোখে মালুম হচ্ছে না।

মাস্টার সাইকেলে একটু এগিয়ে গেছে।

খেয়াল হতেই হরিপদ দ্রুত হাঁটে, প্রায় ছুটতে ছুটতে যায়।

হৃদয় মাস্টার বলল, ঠিক আছে, ব্যাপারটা মন্ত্রী এম পি বাণিজ্য দপ্তরের তো—

হরিপদর কানে কথাগুলো বড্ড ভারি, চেনা কিন্তু ধোঁয়া, ধাঁধাটে।
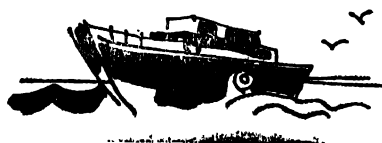
গামবুট পরে ঘাসের উপর বীরদর্পে হেঁটে যায় ম্যানেজারবাবু। পাশের লেবারটাকে বুঝিয়ে বলে, ওই কোণ থেকে এই কোণ আর ওদিকে কি একটা

গাছ যেন ওখান থেকে এই অব্দি ব্লিচিং ছড়িয়ে যাও—লেবার ছোকরাটা পলিথিনের প্রায় চল্লিশ কেজি পাউডারের বস্তাটা টানতে না পেরে হাতে করে কাটিয়ে নিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে এখানে ওখানে।

খাকি রঙের প্যান্টের পকেটে বাঁ-হাতটা গলিয়ে রাজা সাইজ সিগারেটে টান দিতে দিতে ম্যানেজার বলে, এই যে আগে তোমরা চার কোণ কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে ফেল—

আলকাতরা লাগানো শালের ডালি কাটা সরু খুঁটি। বাঁধা হয়ে এসেছে ব্যানার্জি কনট্রাকসানের প্রথম হোগলা চাপানো অফিস ঘর।

যেহেতু জল বৃষ্টির ধারাটা এদিক দিয়ে সহজে নালা পথ পায়, জায়গাটা একটা ছোটখাটো খেলার মাঠের মতো সমতল। এতবড় অবাধ সি পি টি-র মাঠটার এই অংশটুকু ম্যানেজারের পছন্দ। ধু ধু ফাঁকা মাঠটার কাছাকাছি মিশড়া গ্রামটাও। হাঁকডাক দিলে দু-দশ জন বেরিয়ে তো আসবে।

উপর উপর সাজানো খান আণ্টেক ফোল্ডিং চেয়ার। ছোট সাইজের স্টিলের অফিস টেবিল। ভেতর ঘরটায় আস্ত ইঁট বিছিয়ে সোলিং। দড়ির খাটিয়া পেতে বিছানা। ওপাশে স্টোর রুমে কোদাল গাঁইতি বেলচা ঝোড়া।

একটা ফোল্ডিং চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেই পেতে বসে ম্যানেজারবাবু। দু-হাত খাড়া করে আলস্য ভাঙে, কনুইয়ের খিল ছাড়াতে আনন্দ পায়। ফুলে ওঠে শক্ত পেশী। ডান হাতে নিজের বাঁ-হাতেরটায় কিল মারে। মারতে মারতে ভাবে—আজ দু-দিন একেবারে সিস্টেম ব্রেক করল। ছোলা ভেজাবার গ্লাসটা ঠিক গুছিয়ে দিল না বাড়ি থেকে!

দু-চারজন মানুষজন দেখতে আসে হেলাফেলায়। বাবুর সঙ্গে কোনো কথা হয় না তেমন। ম্যানেজারও তেমন বিরক্তি দেখায় না। কথা না হোক তবু তো মানুষের মুখ।

বিনোদ ঢিবি ভেঙে নিচে নামে। ওখান থেকেই বিগলিত কণ্ঠে বলে—সার—ম্যানেজারবাবু তাকায় সম্বোধনের উৎসটায়। সঙ্গে আর একজন।

দু-হাত জোড় করে অবনত ভঙ্গিতে বলে,—এনেছি সার।

এখন বিনোদকে আরও কয়েকজন গ্রাম্য মানুষকে দেখতে পায়। ম্যানেজার ঘাড় ফিরিয়ে বলে, কোনটি?

বিনোদ খুঁজতে গিয়ে দেখে তার সঙ্গী লোকটাকে ঘিরে ধরেছে আরও দু-তিন জন। লোকটাকে তারা ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করে—কিরে···? কেন রে?

রোগা লোকটা তাদের কথার কোনো উত্তর দেয় না। কী বা উত্তর দেবে? বিনোদের বাগানে বেড়া বাঁধে, মাঝে মধ্যে ছাগল খুঁজতে বেরোয়। নাহলে কারুর বাড়ি বিয়ে-থা হলে জল বয়। বিয়ের তত্ত্ব পাঠাতে হলে ডাক

পড়ে—সেখানে খেয়ে মেখে দু-দিন কাটিয়ে দেয়। এমন লোককে অতবড় ম্যানেজারের কী এত দরকার পড়ল? সুতরাং আবার শুধোয় মানুষগুলো—কিরে বাবুর বাড়ি বে-থা নাকি?

বিনোদের রোগা লোকটা উত্তর না দিয়ে বরং ম্যানেজারবাবুকে দেখে। অবাক হয়ে দেখে।

একেবারে হাত ধরে টেনে আনে বিনোদ, হেই ধীরেন তুই একটা ম্যাড়া তো ম্যাড়া—

ফোল্ডিং চেয়ারে ম্যানেজারবাবু তখন অফিস ঘরের অন্য কাজকর্মে নজর দিয়েছে।

বিনোদ সামনে এসে বলে—সার এইটি

কালো রোগা চেহারা। পেটটা ঢুকে আছে পেটের মধ্যে। কারও বাড়ি বিয়ে অন্নপ্রাশন হলে মাথায় তেল পায় মাখতে।

—একে দিয়ে কী করব? ম্যানেজারের মনে ধরে না।

—যা করাবেন সব করবে। গু ফেলাতে বলবেন তাই-ই করবে।

—দূর মশাই আমি চাইছিলাম রান্না করবে আর রাতে আমার কোম্পানির মালপত্র পাহারা দেবে—

—উফ্ এই কাজ? খুব পারবে।

—মনে তো হয় না।

—না সার। রান্নাটা আপনি শিখিয়ে পড়িয়ে দেবেন আর নাইট গার্ড? দিন একটা লাঠি—ওর হাতে—যত বড় দরের ওস্তাদ হোক একবার বলতে হবে ভাই থামো। মহরমে ওকে আদর করে ডেকে নিয়ে যায় মোল্লাপাড়ার মিঞাদাদ সাহেব—লাঠি খেলিয়ে পেট ভরে পিঠে মাংস খাওয়ায়—

ম্যানেজার ফিরিস্তি শোনে আর তাকায় ধীরেনের দিকে। খানিক অবিশ্বাস আর ফাঁদা গল্পের যাদুতে কেমন মজা পায়।

—সার, ও খুব বিশ্বাসী আর কাজ করালে কাজের। কিগো—পেছনের গ্রামবাসীদের সমর্থন পেতে চায়, তোমরা কি বলো?

লোকগুলো যেন তৈরি ছিল।—হ্যাঁ-সার আমরা ওর সব জানি

—ঠিক আছে কাজ দেখি। কলকাতায় কোম্পানিকে জানাই

তিন চারজন গ্রাম্য মানুষ তো অবাক! দেখতে এসেছিল মাঠে কারা ঘর বাঁধছে, দেখে গেল, ধীরে ক্যাবলার চাকরি? এত বড় বাবুদের কাছে এত সহজে চাকরি জোটে!

বিনোদ ম্যানেজারের কাছাকাছি এসে বলে, সার ওর বউ জানতে চাইবে মাইনে কত দিচ্ছেন?

—বউ আছে নাকি! তাহলে নাইটে গার্ড দেবে কি করে?

—ঠিক দেবে সার।

—ওর বউ কোথায় ?

—আমার বাড়িতে বসে আছে—বড্ড রাগী মেয়ে।

ম্যানেজারের কৌতূহল জাগে। এমন গো-বেচারা লোকটার দজ্জাল বউ হয়। জানতে গিয়েও সংবরণ করে নেয়। বিদেশ, ভিন্ন লোকাচার—কোথায় কি বলতে কী উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বিনোদ রোগীর নাড়ি ধরতে পারে। সুতরাং কাছে এসে বলে, সার একদিন হাটে বেচবার জন্যে ওর বউ দশ গণ্ডা সিঙাড়া ভেজে দিয়েছিল। গণ্ডা চারেক বেচারপর হাট গেল গুড়িয়ে। শেষ মেশ বাকি কটা বসে বসে খেয়ে ঘরে ফিরতে হিসেব ভজাতে পারে না। তার পর ঝাঁটার বাড়ি কী মার—কী মার—

—সে কি ভালো লেঠেল—মার খেল ? হাসে ম্যানেজার।

যেন হুমড়ি খেয়ে বলে, একই কথা আমাদের। ধীরের উত্তর কী জানেন সার ? বউ ঠিক করেছে—সত্যি তো পুঁজি ঘেঁটে ফেলেছি। খুব অন্যায় কর্ম করে ফেলেছি—

ম্যানেজার যেন রূপকথার মধ্যে ডুবে আছে।

—আর সেই থেকে আমরা বলি, ওর মত সৎ লোক খুব কম আছে এ-থানায়।

—যাক, খেয়ে মেখে পোশাক পরিচ্ছদ পেয়েও দুশো তো পাবে ? বেশ জোরে বলে ফেলে কথাটা।

সকলে থমকে যায়। দুশো টাকা ! এই ফাঁকা সি পি টি-র মাঠে। বিনোদের কেমন আপসোস হয়। কী দরকার ছিল এমন লোকটার জন্যে উকিল মুহুরি হওয়ার ! কম টাকা !!

ম্যানেজারবাবু ডাকে—এই যে, বিনোদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কি যেন নামটা ?

—আজ্ঞে ধীরেন, বিনোদ জানায়।

—ওহ। ধীরেন টিউবওয়েল কোথায় জানো ?

—এ্যজ্ঞে। নিশ্চয়—ওই মিশড়ার দক্ষিণ গায়কে

ম্যানেজার মাটির হিসেব, ডেলি পেমেণ্ট গজ ফুট মুহূর্তে মস্তিষ্কে নিলেও ধীরেনের কথার ধাপে দম নেয়। একটু সমঝে বাকিটা ধরে নেয়।

—ঠিক আছে, একটা ফাঁকা বালতি আর ঢাকনাওলা পাইপকল লাগানো বালতি নাও ঘর থেকে। নিয়ে এসো—একটুও খাবার জল নেই—

পলিথিন বালতি দুটো নিয়ে হাঁটে ধীরেন। রোগা রোগা ঠ্যাং হাত দুটো। কালো শরীর। সাবান মাখিয়ে সাফ করাতে হবে লোকটাকে। আর ড্রেস ? বিনোদ বললো—সার আসি। দরকার হলেই ধীরেকে দিয়ে খবর দেবেন,

আমি চলে আসবো।

ম্যানেজারের হঠাৎ মনে হল, চেক কাটা লুঙিটাই নয় দিয়ে দিই।

ধীরেনের পিছু নেয় বিনোদ।

হাঁক দেয়, এই ম্যাড়া থাম—

ধীরেন দাঁড়ায়।

—তুই তো না চাইতেই রাজত্ব পেলি। মাসে মাসে পঞ্চাশ দিস আমাকে, বিনোদ জপায়।

—কি করে?

—শালা। তোর মাইনে থেকে

—এ্যাঁ

—না দিলে বউকে লাগাবো তিনশ করে পাস। দিলে বলবো, দেড়শ করে মাইনে।

—তাই তো! ঘাড় ফেরায় বিনোদের দিকে, তিনশ বললে, একশ পাবো কোত্থেকে?

—সে তুই জানিস আর তোর বউ বুঝবে

মহা ফাঁপরে পড়ে ধীরেন। লোকটার কথায় বউ বিশ্বাস যায়। যা রাগী ও আর পিটুনে। ঘরে অশান্তির আভাস!—আচ্ছা · পঞ্চাশ··· ।

মানুষ দুটো হাঁটে। একজন গোমড়া। আর একজন আত্মপক্ষে ওজর খোঁজে, কি হয়েছে! অন্যায় কিসে···! আমি না বললে কইলে একটা পয়সার মুখ দেখতো?

ম্যানেজারবাবু ধীরেনের হাতে বালতি, লাল আর সবুজ বালতি চলে যাওয়া দেখতে দেখতে ঠিক করে, একটা টিউবওয়েল যে এখানে আর্জেন্সী।
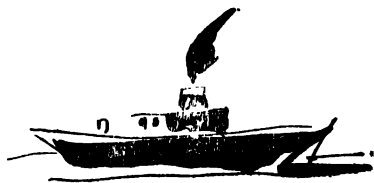
ফরশা গোল গাল মুখে ছোট্ট নাক ছাবির পাথরটা হঠাৎ হঠাৎ চমকে উঠছিল। হলুদ রঙের শাড়ি গায়ে মাংস কামড়িয়ে আছে কালো ব্লাউজ। দলিজের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মাসুদা দেখছে। মায়ের নিষেধ, একদম যাবি নি। যা দেখতে হয় এখন থেকে দেখ।

মাসুদা অসন্তুষ্ট। এমন ব্যাপারটা একদম কাছাকাছি থেকে দেখতে দিচ্ছে

না! ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে ওঠার পরই যেন বড্ড বড় হয়ে গেছে! ইস্কুল ছাড়িয়ে ঘরের কাজে জুড়ে দিয়েছে। পেছনে বড় দিদি সেলিমা বাচ্চাটা কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে। দিন দুয়েক হল শ্বশুর ঘর থেকে বাপের বাড়ি এসেছে। এতদূর থেকে দেখে ঠিক আয়েস হচ্ছে না, তাই নেমে বলে—যাবি মাসু?

দু-পা নেমে এসে থমকে যায়, না। আব্বা তো ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। যদি বকে?

—ধুস। আমি আছি চল না—

মাসুদা ঠোঁট মুচকে বলে, তোর কি? বে-হয়ে গেছে ছেলের মা—সেলিমা ঠাট্টা করে, ভালো তো। মাপের লোকরা গরমেণ্টের চাকরি করে। একটার চোখে ধরে গেলে আজই বে-দিয়ে গোস্ত দই মিষ্টি খেয়ে যাবো—

মোড়া পায়ার টেবিলে ম্যাপ বিছিয়ে রেখে প্যাণ্ট শার্টপরা লম্বা চেহারার সার্ভেয়ার বলল, ও গোবিন্দ ডান দিকে নারকেল গাছটা বাদ দিয়ে চেনটা টানো—

চেন ধরা লোক দু-জন একশ লিঙ্কের চেনটা টেনে নিয়ে যায়। বর্ষায় ধুয়ে ধসে গেছে পাড়ের মাটি।

জুববারের পাশে সলেমান তড়পে ওঠে, কেন বাবু? ও নারকেল গাছ তো আমার পাড়ের সীমানা—আমার গাছ।

—মৌজা ম্যাপে তো তা বলছে না। ওটা অন্য প্লটের,—বললো সার্ভেয়ার বাবু।

জুব্বার ঝাঝরে ওঠে, দূর বাবু। আমরা বুড়ো হয়ে গেলুম, আমার গেরামের কে কোথায় থাকে, কার কোনটা জায়গা আমরা জানি নি? তোমরা ওই কাগজের চোতায় সব জানতি পারবে—?

চুপচাপ দাঁড়িয়ে সব শুনছিল নুরুল। শাদা ফুল প্যাণ্টটার সঙ্গে একসারসাইজ গেঞ্জি। লম্বা কালো চেহারায় পরিষ্কার বিদেশী গেঞ্জি তাকে একটু আলাদা গাম্ভীর্য দিয়েছে। সে যে এখানকার অজ গ্রাম্য মানুষ নয় তার সঙ্গে জার্মান সাহেবদের চাকরি সুত্রে ওঠাবসা—সেটা ঠারে ঠোরে বোঝাতে চায়। সারভেয়ার ভদ্রলোক কাজের ফাঁকে, কথার বাঁকে বাঁকে নুরুলকে দেখে। নুরুল বুকে হাত বেঁধে বলে, এখন স্পট আপনাকে কি বলছে, দেখুন না?

থপাস করে ফেলে দেয় মাথার উপর থেকে কাঠকুটোর বাণ্ডিলটা বুড়ি খালিদা বিবি। দু-হাতে মোটা মোটা রুপোর বালা, খাঁজে খাঁজে কাদামাটির দাগ। গাঙ পাড়ে জলে ভেসে আসা কাঠকুটো কিনারায় ঠেক খেলে কুড়িয়ে নেয়। তারপর ঝোপ ঝাড় থেকে ছেঁটে কেটে যা পারে নিয়ে আসে। একটু

দম নিয়ে সরু গলায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, ও বাপেরা তোরা এত মাপামাখি করতেছিস আনাচ্ কানাচ্—তা আমরা নাতি পুতি নিয়ে থাকব কোথায়—

হাতের চেন থেমে যায়, খোড়া পায়ার টেবিলের বাবু ঘাড় ফেরায়—মা, আপনাদের ব্যবস্থা কি আর হবে না? ব্যবস্থা না করে ওঠায় কে আপনাদের?

তোবড়ানো মুখে টিকোলো নাক, বুড়ি খালিদা বিবির। গলায় বেশ জোর এনে বলে, অত ভালো ভালো কথা শোনাস নি। ওই যে ছি পি টি-র মাঠ দেখতিছিস--ওই কাদা ফেলা মাঠ হওয়ার আগে, ওই মাঠে আমাদের পনেরো বিঘে জমি ছ্যালো·· বছর ফিরলে বিঘে ভুঁই আট দশ মণ ধান, খেয়ে মেখে ফুরোত নি—বেচে বাপের বাড়ি যেতুম! সেও তো তোরা নে-নিলি গাঙের মাটি ফেলাবি বলে। এখন ছেলেপুলে নে পেটের জ্বালায় জ্বালুন গুড়োই—কনটোলে পায়রার খাবার খাই। ছেলেরা আনলে তাদের বেটাপুতের মুখে দেয় কী আর আমাকে দেয় কী···

জুব্বার মিঞা কথার রাস টেনে ধরে, চাচি সে কথা এদের শুনিয়ে কী হবে! ফাঁকা মাঠে চাষ করতিছি···তখন ছেলেমানুষ। প্যাণ্টুল পরা বাবুরা লঞ্চো থেকে নেমে বললো, এ জমি তোমাদের?

আমার পাশে মহম্মদ চাচা ছেল, আমিও ভয়ে থর থর করতিছি, বললুম— হঁ্যা। আমাদের বাপ চাচাদের জমি।

প্যাণ্টুল পরা বাবুরা ম্যাপ খুলে বাবলা বন অব্দি দেখিয়ে বলল, এটা গোটাটা কি সারাগঞ্জ মৌজা— ?

ম্যাপ কাগজ পত্তর দেখে চমকে গেছি! কিসের এত ইনকুমারি রে বাবা! গরমেণ্টের খাজনা টাজনা বসাতে এসেছে নাকি। খাজনা তো বছর ঘুরলে নায়েবকে দিয়ে আসি। আবার বেশি করে চাপাবে নাকি? মহম্মদ চাচা বলে ফেলল,—বাবুগো এটুকু জমিন চটকে মটকে চাষবাস করেও পেটের ভাত হয় নে।

প্যাণ্টুল পরা বাবুদের একজন এদিক ওদিক চেয়ে বলেছিলো, ওই যে বাবলা বন অব্দি মোট কতজন চাষ করে?

আরও দুমড়ে গেছিলুম আমি। মহম্মদ চাচাও কত কি ভাবলো, সকলের যাতে উপকার হয়। যদি খাজনা চাপে তো একটু কম চাপুক। সেই ভেবে বলল, তা বাবু মিশড়া শীতল বেড়ের দেড়শ দুশ ঘরের চাষবাস মালিকানা গোটা বাবলা বাগান অব্দি—

—ওদিকের জমিগুলোর ধান কেমন হয়?

মহম্মদ চাচা বুক বাজিয়ে বলেছিল, এক লপ্তে জমিন। দু-এক মণের বেশি হবেটা কি করে···বাবু···

ব্যাস। টক টক করে লিখে নিয়ে লঞ্চে উঠে পড়েছিল বাবুরা। সেদিন

কাজ সেরে মসজিদের মাঠে সে কি হাসাহাসি। বাবুদের বড্ড ঠকান ঠকিয়ে দিছিস রে মহম্মদ। ফুঁকে ফুঁকে চার পাঁচখানা বিড়ি ছাই করে দিয়েছিল।

হরিপদ এসে সি পি টি-র মাঠটার মহাভারত শুনতে শুনতে অবাক! পিছন ফিরে সি পি টি-র মাঠটাকে দেখল, শুধু শাদা জাহাজ দিশারাটা গাঙ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। লোহার খুঁটিতে তে-কোনা জালতি লাগানো পোর্ট ট্রাস্টের মার্কা।

—জব্বার চাচা…

—কে বাজী?

—অতো মাটি ফেলালে কে?

—সে কিরে? তুই আর দেখবিটা কি করে। তোর বাপ গনোদা দেখেছিল—উহ্ সে কি কাণ্ড। গাঙে চড়া পড়া গেছিল।

জাহাজ থেকে কল চালিয়ে মাটি শুধু গাঙের মাটি পাইপে করে জমিনে ফেলালে। কটা বাবু গট্ গট্ করে এসে বিঘে ভুঁই একশ টাকার নোট ধরিয়ে বলল, এই নাও তোমাদের ক্ষতিপূরণ। দু-আড়াই মণ ধানের দাম এর চেয়েও কম—

পাশের সারভেয়ার চেনম্যান দু-একবার কাজ থামিয়ে গল্পটা শোনে। আস্তে আস্তে কেমন করে একটা আবাদী জায়গা মাঠ হয়ে গেল…সি পি টি-র মাঠ। খালিদা ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে,—যদি তোরা সত্যি কথা কইতিস তবু একটা কাজের কাজ হত রে বাজী—

—কে জানতো বল দিখি। জমিজমা নিয়ে বছর বছর যা ধাসা ধাসি…! সে তো আজ ত্রিশ চল্লিশ বছর আগের কথা…! বড় আপসোস হয় জব্বারের।

হরিপদ গলা বাড়িয়ে যোগ দেয়—চাচা গো এখনও কম যায় কি! মাপামাপি তো হচ্ছেই…তারপর কপালে কি ঘটে…

মোড়া পায়ার টেবিল চেনম্যান সারভেয়ার ঘিরে একটা ভিড় দাঁড়িয়েছে। বাচ্চা কাচ্চা ছেলে ছোকরা মিলিয়ে বৃত্ত। বৃত্তের মধ্যে গুঞ্জন। শুধু বুকে হাত বেঁধে পাক খায় নূরুল। দু-চোখে সব দেখতে বুঝতে চাইছে।

খালিদা বিবি ঝাঁকরে ওঠে,—ও বাপ্ টেবুল বাবু

সারভেয়ার ঘাড় ফিরিয়ে বলে—, বলুন মা

—হ্যাঁ বাপ্ আমাদের বাস উঠিয়ে তোদের ভালো হবে?

—গরমেণ্টের অর্ডার। এটা কি আমাদের ইচ্ছে—

—সে না হয় হল। আর কদিন গেলে বোরষা কাল ধারা ছ্যাবণ থাকবো কোথায় গে…। বুড়ির মুখের খাঁজে খাঁজে অসহায় আতঙ্ক!

সারভেয়ার বলে, যতদূর জানি তোমাদের ঘরবাড়ির বন্দোবস্ত না করে কি ওঠাবে—

একটা ছোকরা কোমরের লুঙির গিঁটটা কষে নিতে নিতে বলল, পুকুর বাগান সব নে নিলে আমরা খাবটা কী ?

সারভেয়ার মানুষগুলোর মুখ দেখে। চোখের তারায় নম্র মিনতি। ভেতরে কেমন কষ্ট লাগে। এর চেয়ে ফাঁকা মাঠ চর চড়া মাপতে যদি পাঠাত বড় সাহেবরা…। তাহলে এত মানুষের আপাত সান্ত্বনার জন্যে খানিক ভেবে খানিক বানিয়ে কিছুই বলতে হত না। ছোকরাটাকে ছোট্ট করে হাতছানি দিয়ে ডাকে, শোনো ভাই— ছোকরাটা ঘাবড়ে যায়। তেমন জোর কথা বলা হল নাকি !

সারভেয়ার বলল, তোমার বয়েস কত ?

আরও ঘাবড়ে যায় ছেলেটা।

—তোমার বয়েস তুমি বলতে পারবে না ? তোমার বয়েসে আমার বয়েস পট্‌পট্‌ বলে দিতে পারতুম—

ছোকরাটা খানিক হালকা বোধ করে। এক পা এগিয়ে বলল,—আঠারো।

—কোন ক্লাসে পড়ছো ?

—ক্লাস এইটে শেষ।

—কেন ?

—নাইন টেন স্যাংশন পেলো নি। ইস্কুলের ক্লাসও উঠে গেল আমাদের পড়াও হয়ে গেল—

—থামো। ভয় পাচ্ছো কেন ? তোমাদেরই তো আগে চাকরি বাকরি হবে

ছেলে ছোকরাদের ভিড়টা নড়ে ওঠে। একজন বলে,—সার আমাদের তো ধরা করার কেউ নেই—

নুরুল খর চোখে সারভেয়ারের প্রতিটি কথার মধ্যে ঢোকে।

—না থাকলেই বা কেউ। এ্যাফেকটেড এলাকার লোক—তোমাদেরই তো ফারসট্‌ প্রেফারেন্স—, কথাগুলো খানিক শোনা, খানিক বোঝা কিন্তু মর্মটা ঠিক খোলসা হল না। তাই বোবা মেরে দাঁড়িয়ে থাকে।

সারভেয়ারবাবু একবার তাকায় ছেলেগুলোর মুখের দিকে, পরে বলল, ঠিক মত সকলে মিলে ধরতে হবে—। তবে ভাই আমি বলেছি এসব যেন একবারও সাহেবদের কানে না ওঠে। আমি তো তাদের কর্মচারী—

কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল সবাই। ভাঙাচোরা ঝড়ঝাপটার মধ্যে খানিক আশার কথা।

নুরুল কথাগুলো শুনতে শুনতে বুকে বাঁধা হাত ফেলে দেয়। বরং ভাবে, ব্যাপারটা তো এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না। খালিদা বিবি সব শুনে আঁচ করে,—হ্যাঁরে ছাবালগুলো, চাকরির পাকা আম তোরা খুব-

চুষবি—কিন্তু ঘর দোর পুকুর ঘাট চলে গেলে চাকরি করে কত ইমারত গড়বি ?

ছেলেগুলো খালিদা বিবির মুখের কথায় চনমনিয়ে ওঠে, তাই তো ?

খালিদা হাঁক দেয়,—হ্যাঁ বাপু, ছি পি টি-র মাঠে তো কত ইঁট বালি এ্যায়ছে—নতুন হোগলার আপিছ ঘর হয়েছে—তবু তোদের কুলোলো নি ? অত বড় মাঠ···এবার তোরা আমাদের ঘর দোর ধরে টান দিচ্ছিস ?

ছোকরা ছেলেগুলো বুড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। জুব্বার মিঞা চারদিক দেখে বলল,—চাচি চুপ মারো— । এ বাবু তো গরমেণ্টের চাকরি করা লোক, শুধু একলাকে বলে কী হবে।

নুরুল বাপ জুব্বারের গায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলে, বলুক না। তা না হলে কথাটা উঠবে কি করে ?

জুব্বার চাকরি করা ছেলেটার মুখের দিকে তাকায়। হঠাৎ মনে হয়, রগচটা ছেলেটা তাহলে ধাতে এসেছে।

টেনে হেঁচড়ে বোঝাটা মাথায় তোলে খালিদা বুড়ি।

রোগা রোগা শরীরে শুকনো ডাল পালায় মস্ত বোঝা। টেবিল বাবুদের ভিড় ছেড়ে এগিয়ে যায় নিজের পথে। বাড়ির দিকে।

খামার উঠোনে খড়গাদির পাশে বাচ্চা কোলে সেলিমা, পাশে মাসুদা। বাচ্চাটার ধাসাধাসিতে সেলিমার বুকের কাপড় কখন খসে গেছে খেয়াল নেই। সেলিমাদের পাশ কাটাতে গিয়ে খালিদা বলল,—আহা ঢং দেখো না। সেলিমা বললো—কি গো বুড়ি ?

—তোর

—কিসের ঢং ? বাপের বাখলে তো দাঁড়িয়ে দেখতেছি

—তাই বলে ছিনামা বাইসকোপের মাগীদের মত ন্যাংটো ম্যাংটো দেঁড়াবি

মাসুদা চঙমঙিয়ে দিদিকে দেখে নিয়ে মুখ টিপে হাসে।

বুড়িকে ধাতায়—, তুমি মেয়েমানুষ না পুরুষ লোক বলো দিখি ?

—কেনরে মাসু ? অমন কথা বলতেছিস ? চার পাঁচটা বেটা বেটি পেটে ধরলুম কি করে ?

—তবে ছেলে কোলে মেয়ের গায়ে অত নজর বোলাচ্ছ ?

—ও ঢেমনি। এই কথা— ? তবে যা তুই আলগা ছালগা দাঁড়া না— মাপামাপির লোকেরা তোকে দেখে ঢলবে খুন

সেলিমা সত্যি ধমকে ওঠে,—বুড়ি কি বলতেছো

খালিদা গড় গড় করে বলে, থাকতো তোর নানি ময়েরজান! ঝেঁটা পেটা করতো ছুঁড়ি—

এবারে হাসে দু-জন। খালিদা বিবি তার নানির বয়েসী। একই দিনে দু-পাড়ায় দু-ঘরের বউ হয়ে শীতল বেড়ে ঢুকেছিল। দু-বাড়ির কত ভাব, কত গল্প। নানিটা নেই! বছর খানেক হল কবরখানায় শুয়ে আছে। নাতনি দুটোর মনটা ভারি হয়ে যায়।

দু জনের চার চোখ চলে যায় তাল বাগান পেরিয়ে চড়া মাটির উঁচু জমিটার দিকে। কবরখানার শিরিস গাছটা পাতা দুলিয়ে নাচছে। জলে ধুয়ে ধুয়ে সাড়ে তিন হাত লম্বা গোর মাটির ঢিবিটা জেগে আছে। মাসুদার মনে হল —পরে কি ওটা কবরখানা হয়ে থাকবে… ! কল কারখানা সব ঘিরে নেবে !

খালিদা বিবি গজ গজ করতে করতে বেড়া ঘেরা সরু পথে হাঁটে। ফকির মিঞার চালার পাশ দিয়ে বোঝা মাথায় বেঁকে যায়। ঢাকা পড়ে হরমুজ মিঞার বাঁশ বাগানের কঞ্চি পাতার আড়ালে।

মাসুদার বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেঁপে যায়। নিজেদের দলিজ উঠোন ঘর দোর খড় গাদা দেখতে দেখতে ভাবলো, —বাবার এসব থাকতে থাকতে দিদিটাকে তবু সংগ্রামপুরে খাঁয়েদের বাড়ি বউ করে দিয়েছে। তাদের পোনা পুকুর টালির কারখানা। নিজ নাঙলে পনের বিঘে জমি চাষ। তিন মাস আগে কেনা বেলাউজ দিদির গায়ে আঁটা আঁটি হয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। গরমেন্টে সব নিয়ে নিলে, আব্বা পারবে অমন ভালো ঘরে বর যোগাড় করতে ?

লুঙির সীমায় পা আটকে আটকে যায়। ঝপট ঝাপট শব্দ। কালো চেহারায় জুব্বার সাহেব সেলিমা মাসুদাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, কিরে তোরা দাঁড়িয়ে ? ঘরে যাবি নি— ?

সেলিমা হাসে। বাচ্চাটাকে আব্বার কোলে নিয়ে বলে, —তোমার নাতি কি ঘরে থাকতে চায়— ?

জুব্বার নাতিকে কোলে নিয়ে মমতায় একটু হাসে। সে হাসি উদগত নয়। শুধু শেকড়ের টান। বরং মাসুদাকে দেখে কেমন মন মরা হয়ে পড়ে। অমন ফর্‌া ছটপটে মেয়েটা চুপ চাপ, পরবাড়ি কুটুম্বের মতো চোখ মুখ।

জুব্বার মাসুদার মন ঘোরাতে একবার বললো, —ওমা আমার চারপেয়ে বাচ্চাগুলোকে জল ভুষি দিছিলিস ?

মাসুদা বাপের কথায় ঘাড় নাড়ায় হ্যাঁ। সে কখন—

সেলিমা বলল—আব্বা

জুব্বার তাকায় মেয়ের দিকে। বিয়ের পর রঙ ফিরেছে। অনেক ভারি মুখ। মুখে সুখের আলো।—কি বলতেছিস ?

—সব নে নেবে…

জুব্বার বলে,—গোটা গেরাম যাবে। আর আমাদের টুকু কি রে…

মাসুদা শুধু বলল,—আ-ব্-বা

জুব্বার দেখল মাসুদার কালো টানা চোখে জল। উপচোয় নি। টলমল করছে।

—আল্লা কপালে কি রেখেছে…ঘরে চল…

বেলা দুটোর ঝলমলে রোদ মসজিদের পাঁচখানা গম্বুজের চুড়োয়। লাইন ধরে সুপুরি গাছ কটার পাতা নেতিয়ে আছে। বুড়ো মৌলবী সিলভারের গাড়ু হাতে ছোট্ট পুকুরের সান বাঁধানো ঘাটে চোখ মুখ হাতের কনুই অব্দি ধুয়ে গোসল করতে করতে তাকালো মসজিদটার দিকে। কেউ নেই। কেউ আসে নি এখনও। কাঁধে ফেলা চেক কাটা হাজি গামছায় মুখ হাত মুছে মসজিদের বারন্দায় দাঁড়ায়। সিমেন্ট চটে গিয়ে ফাট ধরছে। দু-একখানা সোলিং ইট নড় বড়ে। বুড়ো মৌলবী ছোট্ট করে আজান দেয়, আল্লাহ…

বুড়ো জুব্বার গাভীন ছাগলটার গলার এঁকট বেছে বেছে মেরে দিচ্ছিলো। আরামে পাঁঠিটা গলা লম্বা করে দিয়ে চোখ বুজে বুবুবুহু শব্দে গোঙায় জুব্বারের ঘাড়ে মাথা রেখে। আচমকা আজানের ডাকটা কানে যেতে জুব্বার একটু সোজা দাঁড়ায়। তখন ছাগল ছানাগুলো তালগোল পাকিয়ে জুব্বারের পথ আগলায়। গাভীন পাঁঠিটা পায়ের কাছে নেতিয়ে পড়ে।

জুব্বার ভাবলো, দু তিন দিন হল ছি. পি. টি-র মাঠে চরাতে নে-যাওয়া হয় নে! কচি ঘাসের তরে নাল বাইতেছে। পরক্ষণে মনে হয়, তোরা কি আর ঢুকতে পারবি! কোথায় থাকবি বল দেখি…ঘরদোর যে সব যায় যায়…

নামাজ শেষ করে পাশ কুঠরির জানালা ধরে দাঁড়িয়ে থমথমে চার পাশ দেখছে বুড়ো মৌলবী সাহেব। কত কী যে মাথার মধ্যে পাক মারে। মনে হ'ল, আমার এ মসজিদ থাকবে…! মসজিদ চলে গেলে আমার উপায়…!

জানালার ওপার দিয়ে তিন চার জন ছোকরা দৌড়ে যায়। খানিক পরে নিয়ামতের ছোট ছেলে লতিফ জোরে জোরে হেঁটে ওদের পিছু নিয়েছে। মৌলবী হাঁক দেয়, ও লতিফ—লতিফ বাজী। লতিফ এদিক ওদিক চঙ মঙিয়ে ডাকের দিকে তাকায়। জানালার কাছে এসে হাতের লুঙি খুঁটটা ফেলে দিয়ে বিনয়ে বলে, সাহেব কিছু বলতেছেন?

হ্যাঁ বাপ্। অতো ছোটাছুটি কেন?

—রূপো চাচির ওখেনে, বলে হাঁকায়।

—ব্যাপার কি?

—কী মাপ নিয়ে গোলমাল। সারভেয়ার লিখতে চাচ্ছে নি। মৌলবী

আর কিছু জিজ্ঞেস করার না পেয়ে চুপ মেরে যায়। বরং জানালার মরচে পড়া রডটা শক্ত করে ধরে আকাশ দেখে। মসজিদ পুকুরের ওপাড়ে একখানা তাল গাছ চওড়া পাতায় বাতাস খেয়ে খড় খড় সড় সড় শব্দ তোলে। পুকুর জলে সরু ঢেউ চিরে চিরে যায়।

লতিফ এসে দেখলো, রূপো চাচি হাঁউ মাউ করে কত কথা বলছে সার-ভেয়ার বাবুর টেবিলের সামনে।

সারভেয়ার বললো, আমি কি করতে পারি ?

রূপো চাচি চেঁচায়—,যেটা পারো সেটা লিখে দাও। ইটের দেল ঘর, রান্নাশাল ইঁটের গোলঘরটাও পাকা—

—তা আমি পারব না।

—কেন ? আমার কষ্টের ঘরবাড়ি তোমরা সব নে নেবে আর ইটের দেল ঘর বাড়ি ইটের লিখবে নি ? গরমেন্টের কাছে দু-পুইস্যা বেশি খরচ পেলে তোর ছেলে পুলের খোরাকে টান পড়বে বাপু ? সারভেয়ার একটু সুযোগ পায়। কাছে ডাকে রূপো চাচিকে। সামনের দু-চার জন লোক আরও কাছে আসে।—ইরিগেশান্ পোর্টট্রাস্টের রিপোর্ট আছে, নাম লিস্টি আছে—কাদের কাদের ইটের ঘর। তার বাইরে আমি লিখতে পারব না—

রূপো চাচির হাতের বালা ঝিলিক খেলে। দু-চোখ চক চক করে। আন্দাজে অনুমানে বুকের ভিতটা কেঁপে যায়। তবুও শেষ আশা ছাড়েনা। চেঁচায়—তোমার চোখ কি বলে ? এটা মাটির দেল, না পাকা দেল ? মেয়েকে মাগ বলে ঠাওরাবি—চোখ নেই ?

এবার সারভেয়ার সোজা তাকায় সকলের দিকে। লোকজনদের চোখ মুখের অবস্থা সমঝে নিয়ে বলে, —বলুন তো আপনারা সত্যি করে—এই বুড়িমা কেনা ইটে দেওয়াল দিয়েছে, নাকি বাঁধের পিচিং করা ইটে দেওয়াল দিয়েছে ? চলুন ইটের ব্র্যান্ড দেখব—

সকলের চোখ মুখ চুপসে যায়।

লতিফ পিছন থেকে ফুট কাটে—, গরমেন্টের অনেক পয়সা। অমন দু পাঁচ হাজার নষ্ট হয়—সার

সারভেয়ার মুখ তুলে কথাটা কোথা থেকে এল সঠিক ধরতে পারে না। কাজ চালিয়ে যায়। ভিড়ের লোকজনদের বলে, বলুন তো এই বুড়িটার ক'খানা নারকেল গাছ ?

ছককাটা খাতা সামনে। হাতের পেন্সিলটা তখন ঝুলে থাকে। কেউ উত্তর দেয় না।

রূপো চাচি মুষড়োনো গলায় বলে—কি হবে ছাই কটা তাল নারকেল গাছের হিসেব নিয়ে ? ক'পয়সা দিবি ? ঘরটা কাঁচা ধরে তো তোরা

সর্ব্বনাশ করলি—

খবরটা রটে গেল মসজিদতলা অব্দি।

মসজিদের ফাটা বারান্দায় দু-পাক মেরে ঘাড় ফেরাতেই মৌলবীর মাথায় ধাঁ করে লাগে—তাই তো! কলকারখানার জন্যে গোটা গ্রামটা নিয়ে নিলে মসজিদটা তো ভাঙা পড়বে! হয়তো কারখানার ড্রেন হবে কি লেবারদের নোংরা ফেলার জায়গা? সেটা···সেটা···হতে দেওয়া যায়।

একশ বছরের মসজিদ। কত হাজি মৌলবীরা নমাজ পড়েছে মনাজাত করেছে। তাঁদের হাঁটা চলায় বেহেস্তে হয়ে উঠেছে জায়গাটা...না, নিক গরমেন্ট। কিন্তু ভাঙতে পারবে নি।

কাগজ কলম নিয়ে বসতে গেল মৌলবী। আজ···আজই কলকাতার বড় মৌলবীকে চিঠি দিয়ে জানাতে হবে—একটা বিহিত করো।

বড় সাইজের ময়দার গজা, গজার গায়ে এক পরত চিনির রস শুকিয়ে লোভনীয় করে সাজান। রসমুন্ডি আর পাতলা চিড়ে শো-কেসে

—এত চকচকে গজা তোর হাতে পাক ওঠে? কথার আগে সাইকেলের ঝন্ ঝন্ শব্দে মুখ বাড়ায় পরিময়রা। ওপাশে বিড়ি সিগারেট সুঁচ সুতো কম দামী সাবান স্নোর দোকানে রেডিও চলছে ভর দুপুরে।

—ফিরে যেতে পারিস নি বোধহয়?

—ঠিক করি নি এখনও

—কেন

—তোদের মুলোতলা হাটে একটা দোকান ফেঁদে বসব—। কি হবে দু-তিন জেলা ডিঙেয়ে কেষ্টনগরে সাহেবদের খিচুনি খেতে গে?

—পরিময়রা দোকানের দেওয়ালে ইঁট দিয়েছে। খড় বাতিল করে খোলার ছাউনি ছেয়ে দেওয়ালে সবুজ রঙ মিশিয়ে কলি টেনেছে। বেশ ঝকমকে জেল্লা। দেওয়াল কেটে সরু লোহার ব্র্যাকেটে কাঠের ঝুলন্ত টেবিল। পুরোনো চওড়া ঢকপকে বেঞ্চিটা কেটে কুটে সরু ফেন্সী বেঞ্চিতে সানমাইকা সাঁটা।

—তা হোক চাকরির পয়সায় ঘি ভাত—, গরমে গেঞ্জিটা ভুঁড়ি থেকে তুলে

দেয় বুকের দিকে। হঠাৎ ভুঁড়িটা ছোকরা পরিময়রাকে বয়সী করে তুলেছে।

দেওয়ালের গায়ে সাইকেলটা ঠেকায়। ভেতরে বসে নুরুল। শো-কেসের গায়ে এক মুঠো মাছির ভন্‌ভন্‌ শব্দ। একটা নীল মাছি উড়ে এসে রগের টিউমারটায় বসে। মাছিটার পাতলা ডানার হাওয়া চোখে লাগে। অনেকদিনের পুরোনো, অবহেলায় শক্ত ঢিল হয়ে গেছে রগের এটুকু।

—ঘি ভাত হোক আর দুধ ভাত হোক, তোর গোঁসা নেই তো— ?

—কি যে বলিস। যত ঘর তত উঠোন

—বেশ চেকনাই করেছিস দোকানটা

—বাধ্য। কলকাতার বাবুরা এরিয়া মাপামাপি করতেছে—পোষ্কার ঝোষ্কার না হলে টিফিন করতে চায় এখেনে ?

মুদিখানা দোকানটার চালার মধ্যে বড় বেঞ্চ। মানুষ বসে বসে কাঠ একদম ত্যালত্যালে। দুপুরে পেঁছনো খবর কাগজটা ঘিরে কজন স্কুলমাস্টার। খবরগুলোর মধ্যে না সেঁধিয়ে হেড লাইনে গরম হয়ে যায়, শুধু সরকারি কর্মচারীদের ডি. এ. কেন ? মাস্টাররা কি সতীনের ছেলে ? তাদের কথা ক্লিয়ার লেখা নেই কেন— ?

নুরুল পিছনে তাকায়, দেখে প্রাইমারি টিচাররা হাইস্কুলের মাস্টার মশাইকে যেন অভিযোগগুলো শোনাচ্ছে, সাইকেলটা নিয়ে হাটের গণ্ডি পেরোয় নুরুল।

ডান হাতি তার পুরনো হাইস্কুল। টানা লম্বা কখানা পাকা ঘর, তার মধ্যে একখানা রুম নিয়ে দোতলা। আশপাশের ডাব নারকেল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যেত, দু-চারখানা গ্রাম পেরিয়েও শাদা স্কুল বাড়ির ছাদ। সব ঘরগুলোয় পড়া হয় নি। কিন্তু চাকরিটা জুটে গেছিল জার্মান সাহেবদের সোশ্যাল ইকনমিক ডেভলাপমেন্টের গ্রামীণ সংস্থায়। গুঁড়ো দুধ গুলে সকালবেলায় বাচ্চাদের মগে কৌটোয় ঢেলে দেবার কাজটা।

চওড়া মেটে রাস্তা। বর্ষায় জল উপচে খানাখন্দ। এখন শুকিয়ে খট্‌খটে। জীপ গাড়িটা দাঁড়িয়ে। সাইকেলটা টেনে টেনে জীপটার কাছে এসে দাঁড়ায়। চাকা, পলিথিনের হুডে, ভেতরের গদিতে এক প্রস্থ ধুলো। পাদানিতে বাঁ পাটা তুলে, ডান পা মাটিতে রেখে সিগারেট টানছে ছোকরা লোক। ডিসকো বুটের উচু গোড়ালিতে ছোকরাটা আরও লম্বা। তাকে ঘিরে কজন গেঁয়ো মানুষ। নুরুল একটু জোরে চালায় সাইকেলটা। দু-হ্যান্ডেলে প্লাসটিকের রিবন ঝুরি। হাওয়ায় চিকমিকিয়ে ওড়ে ফরফর।

কাছাকাছি এসে আস্তে করে নামল নুরুল। শুনতে পায় প্যান্ট শার্ট পরা ছোকরাটা বললো, ঠিক আছে পরশু দিন আবার আসছি—ঠিক এই সময়ে—। পঞ্চাশ না একশ লেবার থাকবে—বলে যাব।

ধনঞ্জয় তোষামুদে গলায় বলে, সার আমি একশ কেন দু-পাঁচশ যোগাড় করে দিতে পারি—

ভালো ত। আপনাদের দেশেই কাজ—আপনারা টাকাটা ধরে রাখতে পারবেন। আমার কাজটা উঠলে হল—

ধনঞ্জয় বড্ড পোক্ত ছেলে। বাপ পুরঞ্জয় এদিকের নামকরা দলিল লেখক। এমন জল জমি বাস্তু ভিটের লোক নেই যে চেনে না।

কলতার রেজিস্ট্রি অফিসের মাঠে চালা বেঁধে সুটকেসের উপর ম্যাসোনাইট বোর্ড পেতে একটানা লিখে যায়...হ্যাঁ তারপর···! কস্য দলিল কার্য্যাদী অদ্য তাং···নিম্ন তপশিলে ভূমি যাহার উওরাংশে স্বোপার্জিত অর্থে কায়িক শ্রমে টালি ছাউনি যুক্ত ভদ্রাসন যাহার পূর্বে···ইত্যাদি ··!

—তা সার, ডেলিকার মজুরি ডেলি দিবেন? জিজ্ঞেস করে ধনঞ্জয়। নুরুল ধন্দে পড়ে। সরকারি অফিসার, না কনট্রাকটর? সুতরাং শিকারি বিড়ালের মতো গুটি গুটি যায়। এখন বাধা হয়ে দাঁড়ায় দু-চাকার যন্তরটি। তেমন গাছপালা নেই যে সাইকেলটা ঠেকনো পায়।

—ডেইলি মানে? এ্যাডভানস্ নেবেন কিছু—

ধনঞ্জয় পিছিয়ে আসে। পরনে লুঙি বাঁ হাতে এক খুঁট ধরে থাকে চলা ফেরায় পাফেলতে সুবিধে।

নুরুল ছুক ছুক করে। এত টাকা পয়সার ওড়াওড়ি কেন? ছোকরা মানুষটার দরকার কী?

—কিন্তু সার লরি নামবে কেমন করে? রাস্তা তো এইটুকু। তা আবার পঞ্চায়েত ইট পাতে নি।

—তো উসমে কেয়্যা? ইট কাঠ থাকবে? চাকার লিকে পেতে দেবেন।

—কতদূর মাল পড়বে? ধনঞ্জয় জানতে চাইল দু-নম্বর রাস্তার দূরত্বটুক।

—বেশিদূর নয়। আমার এক কিলোমিটার স্যাংশন—ওই যে পুকুর তিনটে নারকেল গাছ—ওই পর্যন্ত।

নুরুল এতক্ষণ ধরে গন্ধটা শুঁকছে। জিনিশটা ধরে ফেলেছে। কিন্তু ধনঞ্জয় যে অনেকটা সুড়ঙ্গে সেঁধিয়ে গেছে! লেবার যোগান দেওয়া থেকে মায় কনট্রাকটর অব্দি ছুঁয়ে ফেলেছে। অথচ ধনঞ্জয়ের গ্রাম মান্দাল ত ফিটার জোনে পড়ছে নি। অন্তত আজ পর্যন্ত। তবে ধনঞ্জয় সানার এতো বাড়াবাড়ি কেন? ঝটিতি নুরুলের মাথায় একটা ছোবলের ঘা—,মিস্টার—সার

ঘাড় ফেরায় লোকটা। কেমন বেমানান সম্বোধন!

—বলুন?

ছোকরা লোকটা দেখতে প্লায় নুরুলের চতুর চোখ দুটো । একটু ঘামে ভেজা মুখ। লম্বা চেহারায় না-শহুরে না-গ্রাম্য ছাপ। হঠাৎ বাঁ রগে ঠেলে ওঠা টিউমারটায় পর্যবেক্ষণ থমকে যায় !

—তা সার আপনার কোম্পানির নাম ?

সবাই যেন গা নাড়া খায় । ঘাড় ফেরায় ধনঞ্জয় । চমকে বলে, নুরুদা তুমি ?

হাসলে নুরুলের অনেকগুলো বড় দাঁত বেরিয়ে পড়ে। টিকোলো নাকে দেখায় ভাল। তবু ধনঞ্জয়ের চোখে কেমন সন্দেহ জাগে ·· !

—তোদের রঙ দেখছিলুম ।

—রঙ কিসের ?

—শীতল বেড়ে কাঁকাল মেঘ বাস্তু-ছাড়া হবে—আর তোরা পিটবি পয়সা ?

চাঁকতে জীপ গাড়িটার গায়ে সাইকেলটা ঠেকিয়ে রেখে নুরুল বলে, স্যার আপনি মাফ করবেন। এটা আমাদের লোক্যাল ম্যাটার। আপনার কিছু অসুবিধে করছি না বা হবে না—

ধনঞ্জয় সেঁতিয়ে যায়। তাই ত ! আমাদের মান্দাল গ্রাম কোনো নোটিশ পায় নি। মাঠঘাট এ্যাকোয়ার হয় নি। কিন্তু এই দু-নম্বর রাস্তাটা ছানার হাট পেরিয়ে ব্রিজ তৈরি করে চলে যাবে সরষে—এক সঙ্গে দুটো তিনটে লরি গায়ে গায়ে পাশ করবে ··কত টাকার কাজ··· ! কত লোকের রোজগার ! শুধু শুধু ছেড়ে দোবো··· ! নাইবা পেলুম নোটিশ ফোটিস ! রোজগারে বাধা কিসের !

জিন্ডাল কোম্পানির সাব-কনট্রাকটর থামিয়ে দেয়—বেশ ত ? আমার ট্রান্সপোর্ট আর আর্থওয়ার্ক দুটোই আছে—

ধনঞ্জয় আর নুরুল একটু চুপ করে থাকে। কথা কটা খুব জানা। তবে ব্যাপারটা যে কী কোথায়—ঠিক ধরতে পারে না।

কনট্রাকটর লোকটা নুরুলকে কাছে ডাকে, এক কাজ করুন না। আপনি মাটি যোগাড় করে দিন—যা লাগবে দোবো—

নুরুল উত্তর দিতে পারে না। দাঁড়িয়ে আছে—এখানে কিন্তু মনটা, মস্তিষ্কটা গোটা এলাকা ঢুঁড়ে ফেলে। নুরুল আপাতত শান্ত··· ! না বরং ব্যস্ত মনে মনে।

কনট্রাকটর ধনঞ্জয়কে ডাকে—তুমি ভাই

তখন মুলোতলা হাইস্কুলের মাধ্যমিক পাশ করা কটা ছোকরা ছেলে উৎসাহে ঘিরে ধরে তাদের নতুন ইংরিজি পড়ানো কলকাতার ছোকরা মাস্টারমশায়ের মতো প্যান্ট-জ্যাকেট পরা কনট্রাকটর ছোকরা মানুষটাকে। বলে—স্যার বলুন

—লোকাল লেবার তোমরা দাও—আর খাতা মেইনটেন করো। তোমাদের রেমুনারেশনও দেবো—মাটি···না, পঞ্চাশজন লেবার পিছু আড়াইশ টাকা—

পাশ করা ছেলেগুলো ত অবাক! ঘরে বসে বসে আড়াইশ টাকা।

নুরুলের কেমন বিস্ময় জম্মায়! কথায় কথায় টাকার খই ফুটছে জায়গাটায়। হঠাৎ যেন শিমুল গাছে তুলো ফেটে হাওয়ায় উড়ছে চিক্‌মিক্‌।

জিন্ডাল কোম্পানির কনট্রাকটর জীপের মধ্যে এ্যাটাচিটা বের করে। স্টিলের লক্‌ টিপতেই ঘটাং শব্দ। পালিশ-করা এ্যাড্‌ড্রেস কার্ড—খান পাঁচেক তুলে নিয়ে নুরুলকে কাছে ডাকে—শুনুন ভাই।

নুরুল কাছে আসে।

কার্ড কটা হাতে দিয়ে কনট্রাকটর বলে, পারলে আপনি লরির ব্যবস্থা করুন। না হলে এই কার্ড দেখিয়ে লরি মালিকের সঙ্গে কথা বলুন—আমি পরশু এরকম সময়ে আসছি—। কতদূর কী করলেন আমাকে রিপোর্ট দেবেন

—স্যার। মাটি?

—আপনারা ইনফরমেশন নিন! একলরি লোড করলে সাড়ে চারশ দিতে রাজি

—মাটির দাম?

—সেটা! আচ্ছা দুশ ফুটে সত্তর টাকা—

হঠাৎ পাশ করা ছেলেগুলো নুরুলের কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়। কোন বিরোধ নেই। অবহেলা ত নয় বরং একটা সংযোগ, সমন্বয়।

জীপ গাড়ীটা স্টার্ট নেয়। ড্রাইভার তোয়ালে দিয়ে সিটটা ঝেড়ে কনট্রাকটরবাবুর মুখের দিকে তাকায়—যার মানে হল, কই আসুন বাবু। হাওড়ায় যেতে গেলে স্ট্র্যান্ড রোডে বিদিকিচ্ছিরি জ্যামে পড়বো যে—

কনট্রাকটর গাড়ীতে উঠতে গিয়ে নুরুলের হাতে এক প্যাকেট সিগারেট গুঁজে দিয়ে বলে, দিন ওদের সকলকে।

সাইকেলটায় তেমন হাওয়া ধরছে না। বড্ড ধীরে ধীরে চালাচ্ছে। বেশ মেজাজ মৌজ। তার জন্মের আশপাশ দেখতে দেখতে কেমন হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

ধরের বাতি বাড়িয়ে দেয় নুরুলের বউ।—এত রাত করলে?

—কাজ ছিল

—কোথায়? হাটে—

—হাটে মাঠে সব জায়গায়।

—কেষ্টনগরে যাবে নে ? চাকরি থাকবে— ?

—সার্টিফিকেট দুবো। মেডিকাল সার্টিফিকেট্

—কতদিন ঠেকাবে ? তারপর ত চাকরি ছাড়িয়ে দেবে নে তোমার সাহেবরা ?

—দেখি না এখেনে কিছু করে টরে চলে যায় কি…

—আববা ধরে করে চাকরিটা ব্যবস্থা করে দিছিল…

—না হয় তোর ভাইকে লাগিয়ে দুবো—

—সংসার চলবে ?

—লেগে গেলে, একটা কিরে ? তিনটে সংসার চালাবো—

হুঁ। একটা গাড়ির তেল যোগাতে হিমসিম—আবার তিনটে সংসার। তিনটে গাড়ি—

বউয়ের কোলের কাছে বাচ্চাটা। পায়ের ছাটায় গায়ের কাপড় হটিয়ে দেয়। একেবারে কচি শিশু। তিন বছরও হয় নি। বাচ্চাটা চোখের সামনে ঘুমিয়ে কাদা। বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মনে হল নুরুলের…যা করতে যাচ্ছি…এদের ভালো হবে ত… !

চারকোণা কাঠের ফ্রেমে কালো টিনের উপর শাদা শাদা অক্ষরে ইংরেজি লেখা

কলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন

মিনিষ্ট্রি অফ্ কমার্স

এজেন্সি—ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলাপমেণ্ট কর্পোরেশন

দুখানা মোটা কাঠের খুঁটিতে টাঙানো হল বোর্ডটা। বাচ্চা ছেলে-মেয়েরা অবাক হয়ে দেখছে জিনিশটা। সি পি টি-র মাঠে গরু ছাগল চরাতে এসে খুব মজা পায়। একদম নতুন ব্যাপার। খবর চলে গেছে মিশড়া সারাগঞ্জ মৌজায়। বোর্ডটা টাঙানোর কাজে লোক দুজন ধমকায়,—এই নয়া পয়সার দল সরে যা না—শাবলের ঠোকরা লাগবে রে—

পাঁচ সাতজন ছেলে ছোকরা ছুটে আসে নতুন বোর্ডটা দেখে ইস্কুলে পড়া ইংরেজিটা বাজিয়ে নিতে। বার বার পড়েও ঠিক আয়েস হচ্ছে না। কোথায়

যেন থট্‌কা লেগে আছে।

নতুন রাস্তাটা স্লুইস গেটের উপর দিয়ে একটু বাঁক মেরে সোজা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সাইন বোর্ডটার গোড়ায়। একসঙ্গে দুখানা হেভি লরি মুখোমুখি পাশ কাটিয়েও অঢেল জায়গা। বড় খোয়ার উপর তিনখানা রোলার। হাতির মতো বিকট চাকা। ঘড় ঘড় শব্দে খোয়া পিষিয়ে বেয়ে আসছে সি পি টি-র মাঠ অব্দি। রাস্তাটার নাম লিঙ্ক রোড। মূল রাস্তা থেকে এটা যেন গাছের একটা শাখা।

বাষট্টি মাইলের মোড়ে শুধু বালি। আরামবাগ ঘাটাল কাউখালি থেকে বোট বোঝাই করে এনে ঢালে মাঝিরা বালির আড়তে। সেখানে একশ কুড়ি টাকা রেটে একশ ফুট বালি। লরি বোঝাই করে নিয়ে এসে বিনোদ মুখ বাড়ায় ড্রাইভারের সিটের পাশে পাল্‌লা খুলে।

এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন বোর্ড ঘিরে ভিড়টা চমকে ওঠে। একদম গায়ের কাছে লরি। হাঁক মারে বিনোদ কাঞ্জি—এই ছেলেরা সরে যা—

বাচ্‌চা কাচ্‌চা মিলিয়ে ছেলে ছোকরারা অবাক। বিনোদ এত চেঁচায় কেন। কপালে বেলা আটটার রোদ। হাওয়ায় অল্প অল্প চুলগুলো ঝড় খেকো।

বিনোদ আবার তড়পায়—এখনও সরলি নি?

ভিড়টা এদিক সেদিক ছড়িয়ে যায়। নতুন রাস্তা অর্থাৎ লিঙ্ক রোডটা যেখানে সি পি টি-র মাঠটাকে কামড়ে আছে প্রথম খেপটা সেখানে ফেলার কথা বলে দিয়েছে ব্যানার্জিবাবু…বাবুর ম্যানেজার। এরপর তো আর এক খেপ রোডের ও মাথায়। কড়া মেজাজের মানুষ। গোটা সি পি টি-র মাঠে প্রথম কনট্রাক্টর ব্যানার্জি কনসট্রাকশন। একটু হেরফের হলে কি রক্ষে আছে!

বিনোদ লরির পাল্‌লা খুলে এক লাফে নিচে নামে। বেঁটেখাটো নাটাগড়ন মানুষটা কাপড় ছেড়ে ঢলঢলে খাকি প্যাণ্টের উপর হাওয়াই শার্ট গলিয়েছে বিনোদ কাঞ্জি। বিনোদ তেমন যেন আর মিশড়ার বিনোদ নেই। সবাইকে বলে—এই সরে যাও। হট্‌ যাও—

লরির মাথা ধরে চারজন খালাসি দাঁড়িয়ে জায়গাটা দেখছে। বিশাল মাঠ…ওপাশে গাঙ ঘেঁষে জাহাজ দিশারা। একটা বড় জাহাজ জল কেটে কেটে কলকাতার দিকে চলেছে।

খালাসিদের একজন বলে, আজ সকাল সকাল জোয়ার—

বিনোদ সব ঠিকঠাক করে হাঁক দেয়—, এই দিকে ঢেলে দে—খালাসিরা হুক তুলে লরির ডালা খুলে দেয়। হুড়মুড়িয়ে বালি পড়ে। কালকেই এদিকটায় পিচ পড়বে। আজ সব বালি আনতে না পারলে ব্যানার্জিবাবু

হয়ত জীবনে আর কোনো সুযোগ দেবে নে। সব বাদসাদ দিয়ে লরি পিছু ও দেড়শ টাকা লাভ। এক খেপে ত ঠেসে ঠেসে তিনশ ফুট বালি আসে। মোকামে দাম একশ ফুট পিছু আশি জোর পঁচাশি।

সাইন বোর্ডটার গায়ের কাছে পরিষ্কার জায়গাটায় উপর উপর ছ-সাত পরত ছই চাপিয়ে ছোট্ট ঘেরা ঘর। ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্যাম্প। টিনের মোড়া চেয়ার দুখানা পাতা। ছোট্ট বোর্ডে লেখা 'প্রটেকটেড'। সেনগুপ্ত সাহেব হাতের কাগজ খাতা চেয়ারে কাঁচের পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে বালির কাছে এসে দাঁড়াল। এক রঙা সুতির লুঙি সকালে ছাঁটা গোঁফ, বুকের রোমে অনেক হাওয়া। হাত নাড়িয়ে বিনোদকে ডাকে।

বিনোদ নতুন প্যান্টটা ঢলমলিয়ে এসে বলল,—বলুন স্যার ?

—আবার লরি ব্যাক করবে ?

—হ্যাঁ সার। চালান নিয়ে এক্ষুনি ফিরবো—

শাদা পাঞ্জাবির সাইড পকেট থেকে দুটো কুড়ি টাকার নোট দিয়ে সেনগুপ্ত বলল—,ভালো চা স্টেশন বাজার থেকে এনে দেবেন ত—

—চা স্যার, বিগলিত হয়ে বিনোদ জিজ্ঞাসা করে।

—চা ছাড়া সময় কাটে কই ?

—ঠিক আছে স্যার এনে দুবো—

লরির উপর তখন অনেক বালি ছড়িয়ে আছে। বিনোদ প্রায় লাফ দিয়ে কাছে যায়। খালাসিদের ধমকায়, এ ভাই একটু ঝাড়ু মারো—পাঁচ বস্তা বালি যে লরির খোলে সেঁধিয়ে আছে—

ছোকরা খালাসিটা বিনোদের ফাঁকা মাথার চাঁদি দেখতে দেখতে বিড় বিড় করে, শালা যেন নিজের বউকে শোওয়ার ঘরে তুলছে। একটু বালি নষ্ট হলে বুকের পাঁজরার হাড় ভেঙে যাচ্ছে, বরং মুখ ফুটে বলে'—ঝাঁটা দেবেন ত ?

কোমরের প্যান্টটা যেহেতু আলগা হয়ে নেমে গেছে, একটু টেনেটুনে সাইজ করে নিয়ে বলে,—ওই দেখ। লরির সব কি আমার জানা ?

—তবে কারুর ঘর থেকে মুড়ো ঝাঁটা এনে দিন

খুব জোরে দাবড়ি দেয়,—ভ্যাট ছোকরা। লরির মাথায় দ্যাখ—

খালাসিটা কোমরের গামছা কষে নিয়ে ঝাঁটা মারে লরির খোলে। বিনোদ কাঞ্জি হঠাৎ নিজেকে ভালোবেসে ফেলে। নিজের উপর বিশ্বাস জন্ম নেয়। একটি ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে তাকে ঘিরে। এটা বোধ হয় ব্যানার্জিবাবুর কৃপায়। তা না-হলে ফ্রি-ট্রেড জোনে কেইবা পাত্তা দিতো।

সেনগুপ্ত কাছে এসে বললে—কই কাঞ্জিবাবু টাকাটা নিন।

—সার আমি ত চা আনবই

—টাকাটা নিন

বিনোদ সেনগুপ্তর দিকে তাকিয়ে খুব দ্রুত ভেবে ফেলে, একটু একটু করে এই জোনের কাজকর্মে ঢুকতেছি। সুতরাং ঘাট পোট একটু তৈরি হোক। কাকে কখন কী যে লেগে যায়। না হয় চল্লিশ টাকার চাটা এনে দুবো। টাকাটা নিয়ে ভবিষ্যত পথে কাঁটা গাছ পোঁতা হবে নে তো!

একটু দেরিই হয়ে যায়।

সেনগুপ্ত ঠাট্টার গলায় বলে, আপনাকে বলে ভুল হল ত!

বিনোদ হামলে পড়ে, সে কি স্যার? বিশ্বাস গেলেন নি?

—তেমন সুযোগ হচ্ছে কই?

—ছিঃ সার। ফিরতি টিপে না আনলে এত বড় ফিটার জোনে ঢুকতে দেবেন না।

কথাটার সত্যতা বোঝাতে পিছন ফিরে তাকায় বিশাল সি পি টি-র মাঠটার দিকে। ওপাশে ধু ধু ঢিপি ঝোপঝাপ। কাছে তিন ঠ্যাঙে লেভেল মেসিনে দু-চোখ ঢুকিয়ে সামনের সরু কাঁচে মাঠ ঘাট দেখছে লেভেল বাবু। মাঝে মাঝে স্ক্রু ঘুরিয়ে যন্তরটাকে উঁচু নিচু করে বাগে আনছে। মাঠটার উচ্চতা হিসেব করছে। লেভেলিং-এর কাজ শুরু হবে। মাটি কেটে কেটে সমান করবে ব্যানার্জি কনসট্রাকশনের ম্যানেজারবাবু। লরি খুঁজছে, খুঁজছে লেবার। খোঁটা গাঁথা হচ্ছে গজ ফুটের মাপজোকে।

বুকের মধ্যে দমকা লাগে বিনোদের, লিঙ্ক রোডের বালি সাপ্লাইয়ের কাজ আর কদিন জোর দু-হপ্তা। সেনগুপ্ত বাবুকে ধরে যদি লেভেলিংয়ে ঢুকে যাওয়া যায়।

পেছনের দৃশ্যাবলী থেকে সামনে তাকাতেই সেনগুপ্ত মিটমিট করে হাসে। বিনোদের মুখে ফ্রি-ট্রেড জোন কেমন অপভ্রংশ হয়ে ফিটার-জোন হয়ে যাচ্ছে।

লরির মাথায় ঝাঁটাটা রেখে খালাসিটা চেঁচিয়ে বলে, বালি সাফ হয়ে গেছে—

সেনগুপ্তর সামনে আর দেরি করে না বিনোদ।—স্যার আর কিছু নেই ত?

মাজন সিগারেট—, বলতে বলতে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে।

রোলার চালিয়ে চালিয়ে এদিকটা একদম প্লেন। শুধু পিচ ঢেলে বালি ছড়াবে। আবার রোলার পিষে দেবে স্টোন চিপসগুলো। যে-দিকটায় তে-মাথানি হয়ে বড় রাস্তাটা মুলাতলার দিকে চলে গেছে, দুটো আধখানা ড্রামের তলায় গনগনে কাঁচা কয়লার আগুন। পিচ ফোটার শব্দ। বাতাসে গন্ধ। আগুনের হলকায় লালচে আভা জায়গাটায়। বাচ্চারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে।

পাশের ড্রাইভারকে বিনোদ বলল,—ভাই আস্তে—। সব আমাদের কুচিরা রাস্তায়।

ড্রাইভার শুধু শুনে হাসে। কিছু বলে না। বরং জিজ্ঞেস করে—আর ক-খেপ্?

উত্তর দিতে গিয়ে কথাটা গড়িয়ে পড়ে……আরে… !

ড্রাইভার ব্রেক মারে। ভেতরটা তেল মবিলের গন্ধে গরম। বিনোদ পাল্লার খোপ থেকে মুখ বাড়িয়ে দেয়। সত্যি ত নাকি…।

গোলাপি রঙের শাড়ি, গায়ে সাদা ব্লাউজ, কোঁকড়ানো চুলে হাওয়ার খেলা। গাছের ছায়ায় মায়াময়ী মুখ। লরির শব্দে দু-চোখ তুলে তাকাতেই বিপন্ন অথচ খানিক চিকমিকে মুখে বিনোদ হাঁকে…, ঝুমরি…ঝুমরি হেসে সায় দেয়। টানা চোখে নেমে আসার অনুরোধ।

ড্রাইভারের দিকে একবার তাকায় বিনোদ,—একটু। এক্ষুনি—

নেমে আসে বিনোদ।

ঝুমরি অবাক চোখে দেখে। বিনোদ কাকা ত! গায়ের জামা ফুলপ্যাণ্টে ঘাবড়ে গিয়ে বলে,—আর গেলে নি যে…

নাটা গড়ন দেহে গোল মাথায় চোট খায়। বুকে দপ্‌দপ্ শব্দ বিনোদের। ঠিক চিনেছে ত…! জামা প্যাণ্ট না পরলেই হতো!

—মা পাঠালে

—বড্ড কাজ যে রে

—ক-দিন রেঁধে রাখবে বলো ত? রোজ ভাবে—আজ এলো বলে। ড্রাইভার স্টার্ট নেওয়ার শব্দ করে। বনেটের জালে যন্ত্রপাতির গজরানি। শাদা ব্লাউজে বশ করা ফরশা যৌবন ঢেকে নেতিয়ে আছে গোলাপী আঁচলটা। সামনের কাঁচটা মোটা পর্দার মতো বেরসিক। ড্রাইভার সোজাসুজি দু-চোখের মণিতে ছুঁতে পারলো না মেয়েটাকে। বাঁ-দিকে রবারের হর্নটা ফুলে ফেঁপে নিটোল। আচমকা হাতটা চলে গিয়ে চটকে আওয়াজ দেয়—পঁক—পঁক—

হরিপদ এক রকম ছুটে ছুটে আসছে এদিকটায়। হৃদয় মাস্টারের পরামর্শ কাজ ত শুরু হয়ে গেছে রে। যা বিনোদের সঙ্গে গিঁট বাঁধ, সুলুক-সন্ধান পাবি। নতুন বোর্ডটার কাছে দাঁড়াতেই ছেলেরা বলল,—অই-অই তো বিনোদের লরি

পোড়া ইটের বড় বড় খোয়া বিছোনো নতুন রাস্তা। রোলার পিষে দিলেও এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো। একবার হোঁচট খেয়েও প্রায় লরিটার কাছাকাছি। লরির হর্নটার পঁক পঁক শব্দে বুকের খাঁচায় হৃৎপিণ্ডের লাফ ঝাঁপ। বোধ হয় ছেড়ে দেবে গাড়িটা।

একটু স্টার্ট নিতেই সরু পাইপে ধোঁয়া। কল কব্জার আওয়াজ।

রোদ চকমকে কপাল, ঢলা প্যান্টশার্টে লোকটা কি! কাছে এসে দাঁড়াতেই কান মাথা জ্বলে যায়।

—ওঠ্ না। সব শুনতে শুনতে যাই

ঝুমরি বলল—কদ্দুর যাবে?

—যদ্দুর হোক না। এক্ষুনি ফিরবো। ঝটপট বালি বোঝাই দেবে

—মা যে খবর পাবে নি! ঝুমরির গলায় কেমন বিপন্নতা।

—ধুর আমি তোকে পেঁীছে দি-আসবো, বলতে বলতে পিঠে হাত দিয়ে ঠেলা দেয়।

পা-দানিতে এক পা রেখে উঠতে গিয়ে শায়া শাড়িতে টান। পায়ের গোছে ফরশা মাংস অল্পস্বল্প কালো রোম, বিনোদের গায়ে সুঁচ ফোটে। ঝুমরি শক্ত করে হাতলটা ধরে একবার পাশে তাকায়।

ঝলকে হরিপদর একতারার তারটা কেটে যায়। বুকের মধ্যে ঝন্ঝন্ শব্দ।

ঝুমরি চেঁচিয়ে বলল,—হরিদা-আ-মাকে বোলো আসতিছি—হরিপদ তখনও দাঁড়িয়ে।

লরিটা হর্ন দিয়ে স্টার্ট নেয়। চোখের সামনে বেরিয়ে বাঁক ঘোরে। পাল্লার জানালা দিয়ে একবার মুখ বাড়ায় বিনোদ।

নতুন ধুলো চাকায় পাক মেরে ঘুলিয়ে ওঠে।

লরিটা স্লুইশ গেট পার হয়ে গড়ান দিয়ে নিচে নামে। খালের পাশে নারকেল গাছে কাঁপ ধরে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত পাকায়, দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। মনে হল, ধ্যাট্। এই উল্লুকটার কাছে কাজের ধান্দা করবো—আমি… !

আর ইচ্ছে হল না বোর্ড টাঙানো সি পি টি-র মাঠে যেতে। এখান থেকেই দেখে, চার পাঁচখানা তিন ঠ্যাঙে লেভেল মেসিন নিয়ে চার পাঁচজন বাবু খাতা লেখালেখি করছে, যন্তরটার মধ্যে চোখ সেঁধিয়ে দিচ্ছে। মাঠটায় হোগলা ছাউনি ক্যাম্পটার মাথায় এক ঝাঁক কাক। মানুষের আনাগোনায় রুটি বিস্কুট এঁটো ভাত খাদ্য খাবারের লোভ।

হরিপদ ভাবলো, নিজে চেষ্টা করলে কেমন হয়! কত মানুষের ত ভাত জোটাবে ওই মাঠটা!
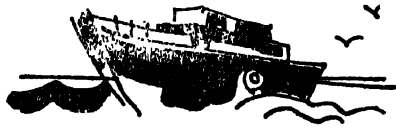
আকাশের দিকে তাকিয়ে, গাছের ছায়া ঠাওরে হরিপদ সাব্যস্ত করেছে বেলা তিনটে পার হয় নি। তবে দুটো বেজে গেছে অনেকক্ষণ! সুতরাং সে গাঙ পাড়ে বট-অশ্বত্থের জোড় চাতালে গিয়ে হাওয়া খায়। বাঁধানো ঘাট ছিল জায়গাটায়। ধাপে ধাপে ভাঙা সিঁড়িটা নেমে গেছে গাঙ অব্দি। মাথা-মোটে ধান চাল ভরা হত বড় বড় বোটে। বাঁধের এপারে ভাঙা ধান কল। বড় মাঠ জুড়ে সিমেন্টের পাড়ন। রোদে বিছিয়ে ধান শুকোতো হলারে ওঠার আগে। বয়লার জ্বলতো গন গন করে। বেগসাহেবের ধান কল। পেটে অ আ র আঁকিড়ি ছিল না একটুও। টাকা...টাকার সাহেব উজির বেগ। দু-আড়াই হাজার মনি বোট একুশটা। গাঙ সমুন্দুর চিরে সেই উড়িষ্যা থেকে ধান আনতো। গাজিপুরের শোভান শেখের সামনে দাঁড়ালে কত গল্প ...সব গল্প বেগসাহেবকে ঘিরে। সেবার চা খেতে খেতে শোভান শেখ বলেছিল...বুঝলি সাতটা বোট নিয়ে সাগর পারিয়ে যখন উড়িষ্যায় গেলুম সে এক কান্ড। হাতে পিতলের পানের ডিবে এই বাঁটোখাটো লোকটা। সঙ্গে ঘড়ি হাতে খাতা বগলে সরা ছাঁটা মাথা। গায়ে ফতুয়া। আমরা ভেবে বসলুম বাবু তাহলে ঘড়ি হাতে জামা গায়ে লোকটা। হা-আল্লা! পানের ডিব্বা হাতে খালি গায়ে ভুঁড়িওলা হাঁটুর উপর কাপড় পরা লোকটা...যাকে কিনা গোরু ছাগল চরানো চাকরবাকর মনে হয়, সে লোকটাই মালিক। বললো কি জানিস—কটা বোট?

আমি বললুম—সাতটা বাবু

পানের ডিবে থেকে একটা গুন্ডি পান চিবিয়ে পিক ফেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে মার্কেন্ডেয় দাশ বলেছিল—টংকা আনিছেন

উজির বেগ গায়ের কাছে। মাথা নাড়িয়ে বললো—হ্যাঁ।

যেখেনে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে শুধু ঘাস থিকথিকে উঠোন বাড়ি। বছরে যাত্রা নাচ দেয় তার উপর মার্কেন্ডেয় দাশ। মার্কেন্ডেয় দাশ বললো—এক হামারের বোট আনিছ নি গো বঙ্গের বাবু

আমি বললুম—তা আপনার ধান কোথায়?

ডান হাতটা মাটিতে ঠেকিয়ে মার্কেণ্ডেয় দাশ বলেছিল—মা ভূমিলক্ষ্মী এই ভূমির মধ্যে।

তারপর...মার্কেণ্ডেয়ের লোক কোদাল কুপিয়ে রাস্তা করে ধানের কাছে নিয়ে গেল। মাটির মধ্যে যেন ডোবা—ধানের ডোবা—সোনার মতো চকচকে ধান! আমি আর বেগসাহেব দেখে অবাক! এমন করে হামারে ধান তোলে বছরের পর বছর! যখন টাকা পয়সা দেওয়া নেওয়া হচ্ছে··· বেগসাহেব বস্তার মুখ খুলে টাকা ঢেলে দিল মার্কেণ্ডেয় দাশের সামনে, মার্কেণ্ডেয় ত পানের ডিবা ফেলে লাফিয়ে উঠলো।—ই দ্যাখ্ বঙ্গের বাবু কত টিয়া আনছে রে··· ।

শোভান শেখ গল্পটা বলতে বলতে শেষ করেছিল···শালা উড়িয়া মার্কেণ্ডেয় ধানের ধনী, টাকার ধনী ত নয়? তাই অতো লাফানি।

এখন সেই ধানগোলার সব ভেঙে চুরে সাফসুফ। খান কয়েক জং ধরা হুক গাঁথা বড় বড় পিলার শুধু দাঁড়িয়ে আছে।

হরিপদর মাঝে মাঝে শুধু মনে হয়,···যদি বছর চল্লিশেক আগে জন্মাতুম···! ঘরে বসে সব হত। হাঁটুর উপর ট্রাউজার গুটিয়ে হাতওয়ালা জামার বোতাম খুলে বুকে হাওয়া লাগাচ্ছিল হরিপদ। একটু তফাতে গাঙ। গাঙের ওপারে আর একটা জেলার গাছপালা। গাঙ ঘেঁষে ইট ভাটা, ভাটার লরি দাঁড়িয়ে। কদিন ধরে যেন লরিটা এইরকম ভাবে, একই জায়গায়।

—এই হরিয়া

চমকে ঘাড় ফেরায় হরিপদ। দেখলো চুনীর মুখ পুড়ে গেছে রোদের তাতে। গলা বুক বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। গায়ে এখনও কটা গন্ধ আর একটু কাছে দাঁড়ায়, গন্ধটা প্রকট হয়।

হরিপদ বললো—কিরে সকালের ব্লাডার খালি করতে পারিস নি?

পুলিস তাড়া করেছে—

—কেন?

গন্ধ যায় নে যে। গাড়িতে লোকজন পাশ থেকে হটিয়ে দেয় নে তোকে? চুনী পোড়ামুখ রাঙা চোখে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, তোরা যখন চিতেয় তুলবি আমাকে, বিনি পয়সায় নেশাটা পাবি—

—ওসব ফালতু কথা রাখ। অগ্রিম এক ব্লাডার মাল সরিয়ে রাখবি। তারপর বাঁশ মেরে তোর খুলি ফাটিয়ে তোর মালিক যতিশ আঁটাকে বলবো—তুমি এবার পাঁচটা বোতল ছাড়ো দিকি—

—পাঁচ বোতল! প্রলম্বিত বিস্ময় চুনীর স্বরে। বরং এক বোতল রক্ত চাস ত দেবে - এক বোতল মাল এমনি দেবে নি

হরিপদ হাঁ-করে কথাটা শোনে। দমকা হাওয়ায় চুনী অনেক জুড়িয়ে যায়।

চুনী বললো—অত কথা রাখ। আমি বরং আর একটা বেলাডার সরিয়ে রেখে যাবো খোন—

গাঙ পাড় ফাটিয়ে দুজন হাসে। হাসিতে দুজন ধুয়ে যায়। মাথা ডিঙিয়ে সূর্য অনেকটা গাঙ ঘেঁষে। পিছন দিকে তাকায়। শুধু বাঁধের পায়ে পায়ে ধুলো মাটির রাস্তাটা এক দম ফাঁকা। এই ঝাঁ ঝাঁ রোদে কাক পাখিও জিরোচ্ছে। তবে হৃদয় কেন আসতে বললো। আজ রবিবার দরখাস্তটা সই করিয়ে আমাকে নে-যাবে বি ডি ও অফিসে। মিটিং আছে—কলকাতা দিল্লির বাবুরা আসবে।

—এই হরিপদ

—উঁ

—কেল্লার কান্ড শুনেছিস ?

—কলোনির কান্ড ? না ত—

—শুধু পুলিস...পুলিস...গড় ফাটকের পোলে

—মাডার ফাডার নাকি ? হরিপদ জিজ্ঞেস করে।

—নারে না। সব শালা ওদের মজাকি

—আসল কথা বল ত, ধমক দেয় হরিপদ।

—কেল্লার কাঁচ ঘেরা উঁচু বাতি...আরে জাহাজ বাতি—সেটার দামি দামি জিনিশপত্তর মেরে দিলে।

– কলোনি পার্টি ?

—ওরা ত বলতেছে কাল নাকি খাকি প্যান্ট-শার্টপরা মেকানিক সঙ্গে পোর্ট টাস্টের বাবু সেজে কারা এসে বললো,—কদিন খারাপ হয়ে আছে জাহাজ সিগন্যাল পাচ্ছে না। রিপেয়ার করতে হবে। তর তর করে লোহার সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দুজন। কলকব্জা খুলে বললো, হেড অফিসে না নিয়ে গেলে সারানো যাবে নি—ব্যস।

—তারপর...

—আজ আবার নাকি আসল লোকরা এসেছে, খোদ পোর্ট টাস্টের লোকজন। তারা এসে অবাক! বাতি কই ? কলোনির ছেলে ছোকরাদের ইনকুমারি করতেছে। ক্ষুদিরাম দাশ খুব তড়পাচ্ছে—কে কারা কখন আসতেছে, আমাদের কাছে কি কোন কাগজপত্তর আছে ? নাকি গরমেণ্টের কাগজ কার্ড দেখবার কথা আমাদের ? শুধু শুধু কলোনির লোকজনকে বিপদে ফেলাচ্ছেন কেন ?

ব্যাপারটা হচ্ছিলো বাতিস্তম্ভের গোড়ায়।

মাটি পাথর দিয়ে চারপাশটা ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে। শুধু ছোট্ট ছোট্ট ধাপ, ধাপের পর দশ মিলিমিটার চেহারায় মোটা রডের গায়ে জুড়ে জুড়ে মই

হয়ে একদম বাতি স্তম্ভের মাথায় উঠে গেছে। সেখান থেকে দিন রাত্রি দপ্ দপ্ করে আলো জ্বলে নেভে। জাহাজ তার দিশারা বোঝে।

—হ্যাঁরে পার্শ্বনাথ মাছওলা নেই ?

—পার্শ্বনাথ কি ওদের কত্তা ? এখন ক্ষুদিরাম ওদের লিডার—

—শালা ওটা রাম ঢ্যামন। তা না হলে আমাদের একাদশীর ডেকে নেওয়া গড় ফিশারি তছনছ হয়। শালা ওটাই ত লক-গেটের রাস্তায় মাটি ফেলানোর দফাদার। দিইছি তার দফা খেয়ে—

—আবার কি শুনি, জানিস ? ওরা গরমেণ্টের কাছে লোনে লঞ্চোপাবে। ইলিশ ধরতে যাবে—

—সে কিরে! গোটা গাঙটা মেরে খাবে..., চোখ মুখ গরম হয়ে যায় আক্রোশে। পরে আপসোস হয় মৈনানের জেলেপাড়ার লোকগুলোর জন্যে। ওরা কেন হাত গুটিয়ে বসে আছে। নৈবেদ্যের সন্দেশটা মেরে খেলো!

—চুনী

—বল

—হাটে যাবি ত ?

—না ত আবার কোন চুলোয় যাবো—

—মৈনেনের জেলেদের বলে যাস ত গরমেণ্টের মেরে খাচ্ছে কলোনিরা। শালা তোরা দেশের ছেলেরা ছাগল ভেড়া হয়ে যাচ্ছিস—যা না প্রধান বি ডি ও-র কাছে। আরও বেশী করে ধরাধরি করুক—

চুনী হাসে। সে হাসিতে রহস্য, অবহেলা।

হরিপদ ঝাঁঝিয়ে ওঠে, মাল খেয়েছিস ? নাকি বাগদীপাড়ায় ফুলির ঢেঁকিপাছার ঝাপটায় মাথার গোলমাল হয়েছে— ?

চুনী আর একটু রসিয়ে হাসে

হরিপদ থ বনে যায় চুনীর অহেতুক এমন কাণ্ড দেখে। এত বড় একটা কঠিন, ঠকানো চালাকি কান্ড ঘটে যাচ্ছে। চুনীটা কেমন লম্পটের মতো হাসছে। রাগ হয় খুব তবু সামলে নিয়ে বলে, ঝেড়ে কাশ বাপু

—আমি অতো বলতে পারবু নি। যতিশ আঁটা মুখ করবে—

—কেন ?

হ্যাঁ। আমি তাদের ম্যাসিন-বোট লঞ্চো করে গাঙে যেতে বলি আর শালারা মাছ মেরে হাজিপুর শিবগঞ্জের আড়তে মাছ বেচে সেখেনে বোতল খেয়ে পয়সা ওড়াক। এদিকে যতিশ আঁটার দোকানে মাছি উড়ুক—

ব্যাপারটা বলে ফেললেও হরিপদর ঠিক সুরটা ধরতে দেরি হয়। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে চুনীর কথাগুলোর বাজনা শোনে। চুনীর মুখটা দেখে, মুখের খাঁজখোঁজগুলো দেখে।

—তোর তাহলে ভয় ?

—নিশ্চয়ই

—কিসের শুনি

—দুটোর। চাকরিটা যাবে আর রাগের মাথায় জুতো কষাবে। বলবে, শালা দেশ উদ্ধারি এবার তোকে কোন শালা উদ্ধার করে দেখি—

হরিপদ অবাক হয়ে চুনীর কথাগুলো শোনে। চুনীর নিজের সম্বন্ধে ব্যাখ্যাটাও খেয়াল করে। হঠাৎ বলে ফেলে,—এই চাকরি করবি ? আমি চাকরি দুবো—

চুনী তিড়িংবিড়িং লাফায়,—ওই সি পি টি-র মাঠে মাটি কাটা ইট বওয়ার কাজ ? ও আমার দ্বারা হবে নি,—হাসি পায় চুনীর। বলতে ইচ্ছে করে, শালার হরিয়া তুমি নিজে করছো ফ্যাঁ ফ্যাঁ। আর পরকে দেবে চাকরি—?

বেশ কাছাকাছি ঘন্টির শব্দ। দু-জনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় পিছনে। হৃদয় মাষ্টারের ধবধবে শাদা পাঞ্জাবি কাচা কাপড় রং করা জুতোয় থামচে ধরে আছে রোদ। সাইকেল চালিয়ে আসতেই যা চুলটুকু তছনছ গাঙের হাওয়ায়।

হৃদয় মাষ্টার বললো,—হরিপদ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রে ?

—তা ঘন্টাখানেক।

—হ্যাঁ দেরি হয়ে গেল। বুঝলি নি ছুটিরবার ত। নানান কাজ। মিটিং না বসে যায়—

হরিপদ আর সে হরিপদ নেই। বরং এক করুণা প্রার্থী কাঁচুমাচু ছোকরা। চুনীর চোখে কেমন অদ্ভুত লাগে।

চুনীর দিকে তাকিয়ে হৃদয় মাস্টারও হেসে ফেলে। —এত বেলায় ?

—মাস্টারমশাই কাজ সেরে ফিরতে হবে ত—?

—হরিপদ—চুনীকে নিয়ে বেশ কাটাচ্ছিলিস তাহলে ?

চুনী আর থাকতে চায় না। পা ঘষে, পরে এক-পা দু-পা করে এগোয়। চেঁচিয়ে বলে, মাস্টারমশাই…ও হরিয়া চললুম রে—

হরিপদ চেঁচায়, জেলে পাড়া হয়ে যাস কিন্তু—

—কিরে দরখাস্ত লিখেছিস ? বললো হৃদয় মাস্টার।

—ও দরখাস্ত আমি পারি সার ? কত মন্ত্রী দিল্লি মিল্লির ব্যাপার। বাংলায় লিখলে কি দাম থাকবে— ?

—তবে চল। বাস মোড়ে কাগজ কিনে ; লিখে দোবো। সইটা করবি খুন—

হ্যাঁরে—

উঁ, বলুন মাস্টারমশাই

—আর কাকেও দেখলি যেতে ?

—কে কে ?

—মুলাতলার প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির দীনেশবাবু, ওই যে রে আমাদের সভাপতি।

—না। চোখে পড়ে নি।

দুজনে চলতে থাকে। মাস্টার সাইকেলে আস্তে আস্তে প্যাডেল করে। হরিপদ জোরে জোরে পায়ে হাঁটে। সূর্যটা আকাশের পশ্চিম কোলে। রোদের তেজ কমে আসছে। মানুষ দুজনের লম্বা ছায়া পূবে মেটে রাস্তার বাঁধে, কখনও ডান দিকের গাছপালার গায়ে।

হরিপদ যন্ত্রটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটে। দু-একবার এগিয়ে যায়। তখন বুকটা ধক্ করে ওঠে। মাস্টারমশাইয়ের পোঁ ছাড়লে ত বিপদ। বড় গোলমেলে ব্যাপার। বি ডি ও মন্ত্রী দিল্লির সাহেবসুবোর কাণ্ড—একটু গড়বড় হয়ে গেলে ত নাগাল পাওয়া কঠিন। বারবার জানতে ইচ্ছে করছিলো …কাজটা কী রকম। চাকরির বৃত্তান্ত না জেনে চাকরির জন্যে হুটোপাটি, পুড়ে হেজে ছুটোছুটি। সাহস হয় না। যদি এক করতে গে আর এক তাল বাঁধে!

মনে জোর এনে শুধোয়,…মাস্টারমশাই

—বল

—অনেক সাত সতেরো জিগাস করবে, না ?

—জিগেস করবে হাতি। গোডাউন মোনার চাকরি।

হরিপদ ঠিক থাকতে পারে না। মুখ চোখে অনেক জিজ্ঞাসা। কাজের ধরনটা পরিষ্কার নয়।

হৃদয় মাস্টার পাশে তাকিয়ে হরিপদর মুখটা দেখে। হরিপদ যেন অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে। এতটুকু খুশির আলো নেই মুখে। মাস্টার একটু দম নিয়ে বলে,—পাঁচ সাতশ বস্তা সিমেণ্ট সবসময় থাকবে। সি পি টি-র মাঠ ত ফাঁকা—রাখবে কোথায় বল দিখি ? তাই বাস মোড়ে পোর্ট ট্রাস্টের এ্যাজেবেস্টার বাড়িটায় গো-ডাউন।

বাকিটা হরিপদ নিজের মনে ভরিয়ে নেয়।…বড় এ্যাজবেস্টার বাড়িটায় লোহার গেট বসবে নিশ্চয়ই। একেবারে ভেতর থেকে মাথা মোটে সিমেণ্টের বস্তা নিয়ে বেরুবে কি করে! খুব বড় মাপের তালা চাবি, গেটের ধারে একটা টুল পাতা থাকবে। হাতের কাছে মোটা লাঠি হয়তো দেওয়ালে বড় ঘড়ি। মানে আমার হাত দিয়েই বস্তা বস্তা সিমেণ্ট যাবে। সি পি টি-র মাঠে বড় বড় ঘর বাড়ি, কারখানার শেড রাস্তা-ঘাট। কত দিশি বিদেশী সাহেব-সুবোরা কার্ড দেখাবে—তবে গো-ডাউনের চাবি খুলবো। গেটের সামনে

লরি টেম্পো দাঁড়িয়ে থাকবে—শেষে বস্তার হিসেব নুনকো...মানে গোটা ফিস্টার জোনের লোকজন চিনে যাবে। রাস্তায় বেরোলে হরিপদ—হরিপদ-বাবু বলবে ত...? একখানা ছোট্ট ঘর দেবে নে, কোয়াটার। পাকা দেওয়াল, মেঝে—ইলেকট্রিক আলো। বুকের মধ্যে ছমছম করে। আচমকা মনে হয়, কুমারির ভালো লাগবে? শরীরের রক্ত যেন হঠাৎ জমা হয়। বুকের ভেতর, খামচে-খামচে ধরে অজস্র নখ। কেমন দম চাপা কণ্ট!

হৃদয় মাস্টার বলে, নেবে ত মাত্র তিনজনকে। আট ঘণ্টা করে ডিউটি। তার মধ্যে একজন শিড্যুল কাস্ট। বাকি থাকে দুটো—

—তাহলে..., হরিপদর গলায় তেমন উদ্যম নেই।

মাস্টার আশ্বাস দেয়, আরে দেখা যাক না। আমি ত নিজে যাচ্ছি—

একই আকাশের ছাউনিতলায় উত্তর-পানে হৃদয় মাস্টার হরিপদ, পুব দক্ষিণের মাঠ বাঁধ উজিয়ে চুনী পেঁছিল মৈনানের হাটে। হাট ত নয়, একদিন হাড়ে মাসে গায়ে গত্যি লেগে বড়সড় হাট হয়ে উঠবে এটা যেন তার রুগ্ন শৈশব। সাড়ে চার হাতি খুঁটিতে পাঁচ সাতটা খড়ের দোচালা ঘর। দু-এক কেজি ডাল মশলা নিয়ে একখানা মুদি দোকান। কালো পিচ মার্কা চটে এক বস্তা নুন বাইরে পড়ে আছে। ফাঁপা বাঁশের হাতলে নোনা খোর। দোকানটা থেকে ট্রানজিস্টারের গান ভেসে আসছে। সেটুকুই চারপাশের খাঁ খাঁ শূন্য-তাকে কষ্টে মুছে দিচ্ছে। পাশের সরু খালটা মূলাতলার আরও ওপাশ থেকে বয়ে এসে মৈনানের রোগা হাটের গা ছুঁয়ে বড় গাঙের গায়ে অনাদরে হামলে পড়ে আছে।

হাটের এমন চেহারা দেখে চুনীর এক চোট হাসি পায়। পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে সেখেদের দলিজ ঘর। খিরিস কাঁঠাল কাঠে তৈরি খানদশেক বেঢপ চেয়ার। বড় বেঞ্চি। সুদে টাকা খাটায়। হাজিপুর টাউনে দুখানা পাকা বাড়ি। একটায় ব্যাংক বসেছে, আর একটায় সোনা রুপো আর সবং-এর বিখ্যাত চালানি মাদুর-দোকান। চুনীর মনে হল, সেখ সাহেব সেদিন খুব তড়পে ছিল মূলাতলার হাটের দোকানিদের,—দেখিস হাট, নতুন হাট বসিয়ে তবে ছাড়বো। মেছোহাটায় বড় সোনা ট্যাংরাগুলো কলাপাতায় বিছিয়ে বাগদীপাড়ার বিধবা সনোকা সবেমাত্র বসেছে। কালো কুচকুচে চেহারা, পটল ফাটা চোখ পাছা ডিঙিয়ে কালো চুল। উবু হয়ে বসে দোকান দিয়েছিল, হাঁটুর চাপে ব্লাউজ উপচিয়ে মেয়েমানুষ। হাটবারে আদায়ের ধান্দায় ঘুরে ঘুরে সেখ এসে দাঁড়িয়েছিল সনোকার সামনে,—কিরে কত করে দিবি?

—বলে দিলুম ত

—সে ত বেলাবেলি। সন্ধে হয়ে গেল তবুও একদাম?

—ভালো জিনিসের ভালো দাম দিবে নি বাবু?

আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সেখসাহেব। সূর্য তখনও ডুব মারে নি। মারলেই আঁধার। কোমরে লুঙির গিঁট। গায়ে টাইট গেঞ্জি। শুধু একটা ছোট্ট ব্যাগে একখানা মোটা খাতা। পেন। শাদা কাগজ এক দিস্তা। দু-নম্বরী একটা বানাতে হবে। এদিক সেদিক ভেবে বললো, দে—সব কটা। তোর দামেই। কত আছে?

—কেজি দেড়েক

দাম দিতে গিয়ে বুক আঁচড়ায়। সনোকার হাঁটুর ভাঁজে টানটান চামড়ায় গলায় দুখানা ভাঁজ গোল হয়ে চকচকে।—এই বড্ড বড় নোট—, খুচরো ত নেই রে—

সনোকা কলাপাতা গুছোতে গুছোতে সেখের চোখে দেখে, গরম দিষ্টি। সোজা দাঁড়ায়। আঁচল খসে এক বুকের জামার রঙ ফ্যাকাশে বেগুনি।—বাবু হবে খুন দাও না।

—নেবার ব্যাগও নেই। চল না দে আসবি

—অন্দুর। ফিরতে ত রাত। একলা মেয়েমানুষ—

—ভয় কিসের! পাঁচটা মদ্দ চাপলেও তুই হাঁপাবি নি—

সনোকা কথার ঢেউ ধরতে পারে। কিন্তু টাকা কটা হলে যে কাজ চুকে যায়। তাই একটু জল চাপা দেয়, ভয় তো একটার। সামনা সামনি অমন তাগদে মদ্দ—

সেখ হাসে। হাসিতে গরম তাপ।

সনোকা দো-টানায় হাবুডুবু। কুমোরদের বউ-মরা অমূল্য যে এক বছরের বাচ্চা কাঁধে নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অভিমানে গজরাবে। সনোকা ফিরলে চিরুনি দিয়ে পাছাবেড় চুলের জট ছাড়িয়ে দেয়। তেল ঘষে ঘষে চকচকে করে অমূল্য হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিনুনী বেঁধে দেয়। টুনটুনি আলোয় ছেলেটাকে একমুঠো মুড়ি ছড়িয়ে দিলে গোটা ঘর বেয়ে খুঁটে খুঁটে খায়।

তখন মাটির উপর পুরু করে চট কাঁথা পাতা বিছানায় পাশাপাশি অমূল্য বলে, সনোকা তুই না থাকলি আমি মরে যেতুম—

—তারপর…

—ছেলেটাও।! তবু তোর বুকে বুক চুষে- মায়ের স্বাদ ভোলে

—তুই?

তখন সনোকা থাকিস নি। অন্য কেউ—

—কে আবার…

দুই দুই চার বাহুর দড়িতে জড়িয়ে মড়িয়ে অমূল্য গোঙায়—জানি নি…

আঁধার করেছে চার পাশটা।

সেখ বললো, চল না—

সনোকা উত্তর দেয় না।

আনকা সনোকার হাতটা ধরে বললো, চল না। এক কেজির দাম ফাউ পাবি—

সনোকা ঝাঁঝিয়ে বলে, মুখ হড়কাচ্ছে হড়কাক। হাত সামলে—সেখ জোরে চাপ দিয়ে আবার টানে।

সনোকা হাঁকিয়ে ওঠে,—মারবো মুয়ে নাথি।

ভিড় জমে গেছিলো। সেখ একেবারে কুঁচকে কুঁকড়ে কেন্নো। সনোকার গলায় তেজ।

ফেরার সময় সেখ বলেছিল, তোদের ভাতে মারবো—

সনোকা বলেছিল—কি রকম?

সেখ বঁড়শি গাঁথা বড় কাতলার মতো জল ঝাপটিয়ে তড়পেছিলো খুব—, আমার দলিজের সামনের খামারেই হাট বসিয়ে তোদের তেল ভাঙবো—।

খিল খিল করে হেসেছিল সনোকা, বুক কোমর দুমড়ে বলেছিল, খুব ভালো হল। যতো তেওয়র বাগদির মেয়েরা যাবে—নিত্যি নতুন মুখ পালটাবে—

সনোকার সেই হাসি খিলখিলিয়ে চুনীর কানে বাজে। চুনীরও হাসি পায়—সত্যি সখের হাট বটে! মাছি ওব্দি ওড়ে নে। একটা কাকও চোখে পড়ে নে।

হাটতলা পেরিয়ে যেতে যেতে খাল-ধার ঘেঁষে ভট ভট শব্দ। বড় ডিঙির এক কোনা, গলুইটা দেখতে পায় চুনী। ডিঙির উপর চৌকো কেবিন ঘর। মাঝে মাঝে পঁচিশ ঘোড়ার মেসিনবোটটা মানে ট্রলারটা বের করে নিয়ে যাচ্ছে ঘনা সামন্ত। পাশে চিঁড়েমুড়ির পোঁটলা নিয়ে বীরেন বাগের পাশ-করা ছেলেটা বসে। কেবিনের মাথায় পাছা ঠেকিয়ে—নীলকান্ত উলটো মুখে বসে বিড়ি খেতে খেতে নিজের ভিটেটা একবার দেখে নিচ্ছে। প্রায় দশ বারোদিনের জন্যে ঘর ছাড়া। একেবারে দেশের গাঙ ঠেঙিয়ে সাগরের মুখে ভাসা।

মাছ ধরে বরফ বাক্সোয় বিছিয়ে রেখে তারপর ফেরা। বারো চোদ্দ দিন বাচ্চাটার, বউটার মুখ দেখতে পাবে না। নীলকান্তর বুকের মধ্যে আঁচড়ে পিছড়ে যায়। কেন ছাই লেখাপড়াটা করতে গেলুম! ওর চেয়ে ভালো করে হাল লাঙ্গল চষা শিখলে মাঠের কাজ হত। মুলাতলার হাই ইস্কুলে দশটা বছর বাপ মা টেনে টেনে পাঠালো। এখন শালা রোজগারের জন্যে গাঙ-ভাসা। সমুন্দুরের নোনাজলে হাবসানি। মাটির উপর এত কাজকর্ম...

কলকাতা মসকাতায় একটা দুশো টাকার চাকরি বাকরিও যদি হত, তবু ঘরদোর দেখা যেত !

ঘনা সামন্ত হাতের লগিটা ঠেলে চেঁচায়—এই চুনীদা যাবি নাকি ?

—কোথায় ?

—আমাদের সঙ্গে গাঙে ?

—ধুস্। আমি কি তোদের কোপাটিভের মেম্বার তাই যে— ?

—না হলেই বা

—হ্যাঁ শালারা তোমরা মাছ মারো, কাকদ্বীপের আড়তে বেচে পয়সা ভাগ করো—আমি চুষে মরি।

—না হয়, এ চালানে চলো। ফিরে এসে বি ডি ও সাহেবকে বলে কয়ে দলের মেম্বার করে নুবো—

—আর ধোঁকা দিস নি ভাই।

—ধোঁকার কি দেখলি ?

—তোদের ত কত রকম প্যাঁচ কায়দা। তোরা আবার লেখাপড়া শেখা বেকার, তোদের সঙ্গে আমার মিলবে— ? বি ডি ও লিবে কেন ?

—আমাদের কোপাটিভে আসবি নাকি বল না ? বি ডি ও ব্যাংক যা করার আমরা করবো—

নীলকান্ত চুনীর দিকে আসতে গিয়ে ছেঁড়াজালে পা আটকায়। ফাঁস ছাড়িয়ে এদিকেই আসে। চুনীকে তাতিয়ে বলে,—এই শালা,

চুনী চুপসে যায়। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

নীলকান্ত দু-হাতের ইংগিতে একটা বলের আকার বুঝিয়ে বলে,—আছে-এ, ঘনা বললো,—থাকে দেনা। ও জিনিস ত বাসি হয় নে। জলে মন মেজাজ খিঁচড়োলে টানবো সকলে—

লগি পুঁতে দাঁড়িয়ে আছে ঘনা সামন্ত। ট্রলারটা আর এগোচ্ছে না। সরু খাল জুড়ে ট্রলার দাঁড়িয়ে—একটু জোরে লাফ দিলে পাড়ে আসা যায়। চুনী বেশি বেয়াদপি না করে বললো—আমি সঙ্গে করে নে ঘুরি— ?

নীলকান্ত রসিয়ে বলে—শালা তুই ত মেয়েছেলের দেড়া। তাদের খালাস করতে দশমাস -তোর ত এবেলা ওবেলা

চুনী একটু হাসে।—মজাকি রাখ ত। পয়সা দে এনে দিচ্ছি—

নীলকান্ত ধমকায়,—এই হারামি, পয়সা দুবু নি, এমনি ?

—না ত কি ? আগে ফ্যালো পরে ধমকাবে—

ঘনা সামন্ত গলা হাঁকায়—গেলে কিন্তু ঝুঁটি ধরে চুবোবো

—হ্যাঁরে শালা, আমি এমনি ছাড়বো ? চুনীর বুকনি শোনে ওরা। সকলে একসঙ্গে হাসে। হাসিতে হালকা হয়।

ঘনা সামন্ত লগি মেরে একটু এগিয়েছে মাত্র, চুনী বললো, অই অই দেখ তোদের লিডার আসতেছে—

সকলে একসঙ্গে ঘাড় ফেরায়, অনন্ত।

যেহেতু অনন্ত বেশ তফাতে, চুনী একটু রসিয়ে বলে, না, তোমার জন্যে অনন্তের বউ আসবে— ?

নীলকান্ত দাবড়ায়,—থাম, আর ফচকেমি করিস নি। বরং বলে, সঙ্গে পোঁটলা বগলদাবায় কে বল দিখি ?

সকলে চোখ চালিয়ে দেখে। চেনা অথচ ঠিক ঠাওর করতে পারে না। বেশ খানিকটা দূরে, দু-জনেই।

চুনী হুটপাট করে বলে, আরে ও ত সুফল।

—সুফল…!

চুনী সুযোগ পায়,—ও ত গলাকাটা সুশীলের রাঁড়ের ছেলে। নীলকান্ত ধাঁতায়, সুফল কেন ? বল সুবল—জানবি নি কিছু শুধু সবটায় ঠোকরানো চাই—

ঘনা লগি গেঁথে ট্রলার থামিয়ে চেঁচায়, অনন্তদা—ধারে ভিড়ি ? লাফ মারো—

অনন্ত মুখটা গোমড়া করে। যতটা সম্ভব নিজেকে বাগিয়ে নেয়, তোরা সব রেডি ?

—তা আর বলতে

—আমার যে বড্ড অসুবিধে রে। তার বদলি সুবলকে তোরা নে-যা

কেউ কোনো সাড়া করে না। সায় দেয় না। কেমন চুপচাপ নির্বাক ছবি।

নীলকান্ত ট্রলারের ধার ঘেঁষে দাঁড়ায়।

অনন্ত গলার স্বর নরম করে বলে,—তোদের বউদির বড় জ্বর।

ডাক্তার বদ্যি করে পরশু তোদের কাকদ্বীপের আড়তে ধরবো—

নীলকান্তর ভেতরে ভেতরে রোষ জন্মায়, সকালে দেখলুম ঘাট থেকে চান করে এলো—এখন জ্বর …! তবু বললো—খুব জ্বর…!

অনন্ত বললো—গা মাথা পুড়ে যাচ্ছে।

নীলকান্ত মুখ পাতলা করেও সামলে নেয়। জানতে ইচ্ছে করে, জ্বর কি কোমর থেকে পায়ের নখ অব্দি—। যত বুজরুকি—

—তাহলে…! ঘনার গলায় হতাশ!

—আমার বদলি সুবলকে নে—

তখন ঘনা একটু চিবিয়ে বলে, ম্যাসিনের তেল কেনা…আড়তের খোরাকি অগ্রিম চাওয়া—

—দুদিনের মধ্যে কাকদ্বীপে তোদের ধরতিছি। আর যদি কপাল খারাপ

হয়…রোগ না কমে –তোরা এ খেপটা চালিয়ে নে। ফিরে খেপে আমি সব করবো—

ছোকরা সুবল এবার বলে,—আমি অনন্তদা… ?

—যা ট্রলারে বোস গে যা—,বলে হন হন করে উলটোমুখে হাঁটে। একবার ঘাড় ফিরিয়ে চেঁচায়,—ডাক্তরের বাড়ি যাচ্ছি। এখনও হাটের ডিসপেনসারিতে ডাক্তার আসে নে—

সুবল লাফ দেবার বাগ খুঁজছে। তখন ঘনা সামন্ত হাঁকরে ওঠে,—এই সুবলা—যা যা। খাল মুখে দাঁড়াবি যা—

সুবল দাঁড়ায় না। হন হন করে হেঁটে যায়। একটু তফাতে যেতেই নীলকান্ত শুরু করে, শালার নতুন বউ যেন কারও হয় নে। চাটগে যা—। পঁচিশ ছাব্বিশ দিন বসতি গেল তবু মজা কমে নে। এ খেপের হিসেব একবার চাইতে আসুক—গ্রুপ লিডারি ফলানো দেখাচ্ছি—। ঘনা—

—বল নীলে,

—দেরি করিস নি!

—কোথায় ঠেকাবো, হাজিপুরে ?

—না, সিধে কাকদ্বীপ।

স্টার্টারে চাপ দেয় ঘনা। সরু নলে নোনাজল ফোটে। ভট্‌ভট্‌ শব্দে চারদিক কেঁপে ওঠে। পাখার ব্লেডে জল চিরে চিরে যায়।

চুনী হাসে।

নীলু ঘনা চেঁচায়, চুনীরে আসি। বেঁচে ফিরলে একসঙ্গে ভাজামাছে তোর জল খাবো—

হ্যাঁরে হ্যাঁ ফিরবি। অনেক পয়সা নিয়ে ফিরবি—দেখিস

নীলু দুহাত জোড় করে গড় জানায়, মা গঙ্গা তাই করে যেন।

ঘর সংসারের খবর নিস ভাই—

চুনীও মা গঙ্গার উদ্দেশে দুহাত জুড়ে গড় জানায়।

খাল-পাড় থেকে সরে ভেতর বাগে হাটের রাস্তা। বাঁশঝাড় খেজুর গাছের ঝোপ কাটিয়ে সোজা রাস্তা। দু-চারখানা খোড়ো খোলার ঘর-সংসার। বড় পুকুরের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একবার তাকালো সামনের দিকে। মুলোতলার হাট দেখতে পায় চুনী। চুনী পথ ভাঙতে ভাঙতে ভাবে, শালার বাষট্টিখানা টলার বেরুলো সেদিন লুরপুরের। কত গাড়ি ঘোড়ার ভিড়। এস ডি ও মুন্ত্রী লাল কাপড়ের মেরাপ। কত লোকজনের কলকলানি। মাইকে লেকচার। মেয়েছেলে বড়সাহেব প্রথম টলার ভাসালো গাঙে। গান বাজনা দিয়ে প্রথম ভাসান। প্যান্টুল-পরা পাশ-করা ছেলে ছোকরারা জেলে মেছো হয়ে গেল বগবগ খুশিতে তাদের টলারে এমন চালাকি কচালি হচ্ছে… ?

…আচ্ছা…পাশ-করা ছেলেরা হলেই হিসেব বোঝে…! আকাশ বোঝে, মাছ চেনে, জল টানে…!

উলটো মুখে যত হাঁটে অনন্ত, ততই যেন গাঙের গন্ধ পায় নাকে। ঝাপটা বাতাসে শহর গঞ্জের ধোঁয়া। কলকাতা আর কতদূর! এক জোয়ারেও লাগে না। ওপারে ত হাওড়া। যত জুট মিল, চও, সার্কেসের তাঁবুর মতো ঢেউ খেলানো টিন…না এ্যাজবেস্টারের চালার রেখা।

প্যাডেলে আলগা চাপ দিয়ে চণ্ডমণ্ড করতে করতে হ্যাণ্ডেল ধরে আসে ছোকরা লোক। কাছে আসতেই পা ফেলে মাটিতে, এই অনন্ত দাঁড়া—

—কেন রে নুরুলে? বলে নুরুলের টিউমারটার দিকে তাকায়। যেন একই রকম আছে মাংসপিণ্ডটা।

—তোদের এখেনে কেউ পুকুর কাটবে?

—হঠাৎ!

—দেখ বিনি পয়সায় কাটিয়ে দুবো। রাস্তা গোড়ায় হলে ভালো হয়—

—তোর লাভ?

—শালা, সবসময় লাভ? লোকসানের খাতায় একটু নাম লেখাই। অনন্ত যেন ঘূর্ণিজলে ট্রলার নিয়ে পড়ে গেছে। মাথা ঠিক কাজ করছে না। চালবাজ নুরুলের এ আর-একটা চাল চাতুরি নাকি!

অনন্তর মুখ চোখে কেমন সংশয়। নুরুল ভাবে, জিণ্ডাল কোম্পানির কাজ তুলতে গেলে ত একা পারবু নি! একলা পারলে কি আর কোম্পানি ছোকরা সাব-কনট্রাকটরকে কাজের ভার দিতো? বড় কনট্রাকটর বুড়োকে দেখলে মনে হয় যেন গঙ্গার চান সেরে জপতপ করে নামলো!

নুরুল সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে কনুইটা রেখে বললো, কে কাটতে চায়, খোঁজ খবর নে। আমার সঙ্গে শীগ্গির দেখা কর—কমিশন পাবি।

—দুস আমার টলারে কাজ করবে কে?

নুরুল দাঁত ছড়ায়। একটু হেসে বলে, কী ছাই কলার পাতে দু-কলম শিখেছিস? তাতেই তোদের সব্বনাশ—। শালা তোরা না এলে মাড়োয়ারি ঢুকে যাবে রে—

—খোলসা করে বল না?

—একি সকালের বাহ্যি? পেট খোলসা করতে হবে?

—তবু কত কমিশন…হ্যাঁরে পেট চলবে?

—কটা পেট তোর? আরও পেট পুষতে পারবি—

একটু ভম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে অনন্ত। নতুন বউ। বউটা বড্ড নেকরা করে। চোখের জল ফেলে, আমি থাকি ভিটে জাগিয়ে তুমি ভাসো জলে…। নয় তোমাদের ম্যাসিন বোটে নে-চলো আমাকে। দুহাতে গলা জড়িয়ে

বলেছিল, আমার দিব্যি...তুমি এ খেপে টলার যাবে নে...

সাইকেলে উঠতে যাচ্ছিলো নুরুল। গায়ে কব্জি অব্দি টাইট গেঞ্জি, পাজামার খয়েরি পটি লম্বা করে মারা। অনন্ত এগিয়ে যায়। দুহাতে সাইকেল আটকায় অনন্ত—খাটলে খুটলে রোজগার পাতি হবে ?

—আলবৎ। একটু মাথার ঘি দরকার। না হলে আমি চাকরি ছাড়ি—

সাইকেলের বেল বাজায় টিং টিং। হ্যাণ্ডেলের ঝালরে হাওয়া কাঁপে। নুরুলের সাইকেলে ছেলেবেলার প্রথম শেখা তিন ভাঁজের শাদা 'দ'।

একটু মিলিয়ে যেতেই বুকটা ভরে যায় অনন্তর। মনে হয়েছিল এক ছুটে বউটার কাছে চলে যায়! কিন্তু ··পুকুর কাটাবে কে ? তার খোঁজ খবর ! সুতরাং কাছের পাড়ার মধ্যে ঢোকে। পথ ঘুরিয়ে নেয় অনন্ত।
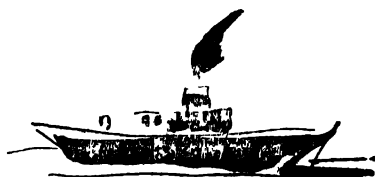
তখনও দিনের শেষ ফেরি লঞ্চটা ছাড়ে নি। বাঁধানো ঘাটের গর্তে নোঙর গাঁথা হয়ে কাছিতে টান। জোয়ারের শুরু, গাঙ পুরছে, লঞ্চটা যৌবনে-পড়া মেয়েছেলের মতো একবার এদিক একবার ওদিক দাপাচ্ছে, নাচছে ঢেউয়ের সুড়সুড়ি খেয়ে।

সেখ লতিফ দু-আঙুলে গোঁফ, পাকা দাড়ি মুচড়ে নিয়ে বিড়িতে বার তিনেক টান মেরে সামনে তাকায়। কতদিনের তাল গাছ, গাছটা ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। ঝড় ঝাপটায় একই রকম। উনপঞ্চাশের বানে লোহাচোড়া সুপুরি-ভাঙা দ্বীপ বান-ভাসি হয়ে কত মরা মানুষ ওই গাছটার গোড়ায় ঠেক খেয়েছিল। বার বার পাড় বাঁধাই, চারদিকে ঝামা ইটের গায়ে সিমেণ্ট মেরে একদম সান। ভরা জোয়ারে ডুবে গেলে পাতলা পলি, ঝামার খাঁজে খাঁজে নোনা শ্যাওলা। দু-ছেলের বাপ ভাইপো মান্নান আর তর সইতে না পেরে বললো,—কই গো চাচা দিবে নি— ? একলা টানবে—

লতিফ সেখ একটুও না রেগে বরং পর পর দু-টান মেরে মৌজ আনতে হাঁপিয়ে ওঠে। বাঁ-হাতে বিড়িটা দিয়ে কানে ডাকটা শুনতে পায়,—কাঁই গো ওপারের বোট কাঁই ?

পান ব্যাপারি পরমেশ পাত্র। সপ্তায় দুবার আট দশ বোঝা পানের চালান নিয়ে ওপারে যায়। পরমেশের ডাকটা লতিফের কানে ঝাঁ-করে সাঁঝের বাদ্যি

তোলে। সারাদিনে কেউ ওপারের প্যাসেঞ্জার নেই। সব নিয়ে নিচ্ছে পাকের লঞ্চটা, শুধু ওটা···? তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর ফেরি লঞ্চ। সব মেরে দিলো, শালা রাক্ষুসি পেটে মেয়ে মন্দ যত ঢুকুক কোনো এজা জ্যা নেই। যখন আমরা শুধু ফেরি দিতুম—পুলুস আসতো—কত লোক? কত মাল নিয়ে যাচ্ছে? উঁহু বেশি প্যাসেঞ্জার—। মাল কমাও। গাঙ ডুবি হলে, তুমি দায়ি হবে মাঝি? ঝড় বৃষ্টির দিনে সে কি বিক্রম পুলুসওয়ালাদের! এখন লঞ্চের বেলায়? কোনো হিসেব পত্তর নেই। যত পারো মানুষ মালপত্তর ঠাসো। এখন পুলুসের চোখে ছানি পড়েছে...

—এ্যাই যে গো বাবু পাত্তরের পো?

লম্বা চওড়া চেহাবা। গা-গতরে ভুঁড়ি চওড়া বুক, কপাল থেকে চুল অনেক হটে গেছে। লম্বা ঝুরো দাড়ি লতিফের। পঁচিশ মণি রোটের গলায় দাঁড়াতে বেশ নড়ে ওঠে। তাল গাছে বাঁধা কাছিটা টের পায় তার পুরোনো মাঝিকে।

পাত্র বললো—ওপারে লে যাবে নাকি চাচা?

—বললেই লে যাই বাপ্। ক-বোঝা?

—খান সাতেক। কত লিবে বলু দেখি?

সেখ লতিফের কালো মুখে একটু আলোর চমকানি। ওপাশে বেলা শেষের রোদ কানেব গোড়া ঘেঁষে গালের টেপোয়। ওলটানো চুলে মিইয়ে আছে উপরের আকাশ। হালের তাড়া বেয়ে বেয়ে শক্ত কবজি, বেঁটে বেঁটে আঙুলে হাতের চেটো বুলোয় বার কয়েক। বলে ফেলে,—বোঝা পিছু তিনটে করে টাকা দিও!

পরমেশ পাত্র খোদ শিরাকোল আমড়ে থেকে মিঠে পাতার পান নিয়ে যাচ্ছে ওপাবে। খরচ পুষোতে বললো,—আরে দুর বাবু। ওটা একটা দাম হল?

—তবে আড়াই করে, ফসকাতে দিতে চায় না লতিফ চাচা।

—না না।

বুক কাঁপে লতিফ সেখের...এই বুঝি পাখি উড়ে যায়। তবুও মুখ চোখ যতদূর সম্ভব সহজ রাখার আপ্রাণ চেণ্টা করে। বেশি হুটপাট করলে যদি ব্যাপারি পাত্র আর এক গাঁট নেমে পড়ে। তাই একটু সমঝে সামঝে বলে, -কিসের না-না পাত্তরের পো? তোমার বাপ একদিনও আমাকে ছাড়া গাঙ পারায় নি—

পরমেশ অত সময় খরচ না করে বললো, চাচা সে আর বলতে। তা বোঝা পিছু গোটাগুটি করে ন্যাও। এই দুটাকায় যদি—

লতিফ সেখ হামলে পড়ে—তা'যাই হোক। মাল কোথায়—? দুজন দাঁড়ির দিকে তাকিয়ে চেঁচায়,—যা তোরে যা। পাত্তরের মাল কটা তুলে

আন। একটু কেরাস তেল আনতে যাবো পুরকোতের দোকান থেকে—

পাত্র তাড়াতাড়ি সামাল দেয়,—আরে থামো না। আবার আসছি—দু একটা কেনাকাটা আছে—

খট্‌কা লাগে লতিফের বুকে। দুচোখ মেলে পরমেশকে দেখে।

এখন আর একটান হলে ভালো হত। পিছনে তাকিয়ে দেখে ভাইপোর হাত ফিরি হয়ে বিড়িটা মাটির হাঁড়ির তিউড়ি ধরাচ্ছিলো ভদু, ভদু শেষটান মেরে পোড়া বিড়িটা জলে ফিকে দিয়েছে। একটু একটু করে সন্ধে নামছে। ঘাট পাড়ের দোকানপাটে আলো। লতিফ সেখ এদিক ওদিক তাকায়। তাল গাছটা বেড় দিয়ে কাছি বাঁধা। জোয়ারের ঠেলায় বোটটা হটে যেতেই কাছিতে টান। ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ। কাছিটা কাঁদছে। ধাঁ করে লঞ্চের সারেঙের কেবিনের ডগায় লাল আলোর হেঁচকা খুঁটিটা জ্বলছে। লঞ্চ থেকে পুজোরির হাত-ঘন্টার মতো এক টানা ঢং ঢং শব্দ। এখুনি লঞ্চ ছাড়বে। চমকে ওঠে লতিফ। ঝপাঝপ বোঝা উঠছে। পানের বোঝা কেবিনের পাশে লঞ্চের ছাতে।

জল কিনারে দাঁড়িয়ে ঘাট-জমার লোকটা চারটে বোঝার টিকিট দিয়ে সাতটার দাম হাতে নেয়।

পরমেশ বললো, আরে দুর ওপারে যে গুনতি করে বোঝা ধরবে। আর তিনটের দিবে তো—

ঘাটে জমার লোকটা দাবড়ি মারে,—যা দিকি বাবু যা। ওপারে দু-চার পয়সা গুঁজে দিবিখুন। যা লঞ্চ ছেড়ে দিচ্ছে—

—ধুস্‌। বড় ফাঁপরে ফেলালে ত!

শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে লঞ্চটা গিয়ার ঘোরায়। জল চলকে ওঠে পাড়ে। অতএব যন্তরটা জল কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে এগিয়ে যায়। ঘাট ফাঁকা। রাত থম মেরে দাঁড়ায়। বুকের সব কিছু পুড়িয়ে লতিফের টাকরা ফুটে বেরোয়, শালার পাততর...

তিউড়ির আগুনে কাঁচা কাঠে ফুটফাট শব্দ। মাঝে মাঝে ধোঁয়ার গুল্ম। বোটের চালা পেরিয়ে বাতাসে চোখ জ্বালা করে। মান্নান এসে বলে—ও চাচা --কেরাস তেল?

লতিফ ঘাড় ফিরিয়ে বলে, একদম চলবে নি।

মান্নান দড়ি গলানো বোতলটা তুলে ধরে দেখায়। ঘাটের ছিটকে আসা আলোয় বোতলটার পেট গলা আন্দাজ করে। একদম ফাঁকা। এক ফোঁটাও নেই। হাত বাড়িয়ে বোতলটা ধরে। কাছি ধরে টান দিতেই বোটটা একদম কিনারা ছুঁয়ে থির। লাফ দিয়ে আধ বুড়ো শরীরটা নেমে আসে।

খালি বোতল হাতে ঢালু বেয়ে উপরে ওঠে লতিফ। ওপাশে ঘাট জমা

আদায়ের লোকজন, ফাটক বন্ধ করে চা খাচ্ছে। থাক ওরা, ওদের খাওয়ার দিন।

ওপরে উঠতেই মানুষজন বাস লরির শব্দ। যেন এতক্ষণ পাতালে ছিল লতিফ। এত কাছে তবু কত অন্যরকম। ধুলো-বালি মাখা শুকনো হাওয়া, গাছ গাছালির পাতায় সির-সিরে শব্দ। ঘর গেরস্থালিতে বিজলী বাতির প্রচুর আলো।

কাছের মুদিখানা দোকান থেকে পঞ্চাশ পয়সার মাত্র দুশো গ্রাম কেরোসিন তেল। বড় বোতল, হেঁটে আসতে আসতে তেল চলকানির শব্দ। বুকটা চমকে ওঠে। বোতলটা দোকানের আলোয় ভালো করে দেখে নেয়, যেটুকু কিনেছি সব ত শিশির গায়ে লেগে গেল। লম্ফো টুনটুনিতে ঢালবো কী…

—আরে সেখসাহেব ?

লতিফ মুখ তোলে। তেমন ঠাওর করতে না পেরে আবার চোখ চালায়। লোকটা হাসে। ভারি গোল মুখে বড় হাসি।

লতিফ সেখ মেলাতে পারছে না। তবু খুব চেনা। পুরোনো লুঙ্গির মতো কোনটা কোন হাটে কেনা, যেমন সন্দ জাগায়।

—ধুস সেখের বেটা।

—ও হয়ছে। তুই বিনোদ ভাই—! তা কোথায় ?

—কোথায় আবার ? তোর খোঁজে—

—মানে ?

—তোর কাছে রাত কাটাবো।

—ঠিক মালুম হচ্ছে নি, থাকবি ত থাক। খোলসা কর দিখি—

লরি বেকল। কাল সকালায় বালি বোঝাই দেবে ওই বাষট্টি মাইলের মোড়ে। যাবে সিদে কলতায়—

দুজনে ফিরতে থাকে বোট ঘাটায়। বকবক করে বিনোদ। বোট ঘাটা বাঁশের চালান ধানের কিস্তি ছাগল খুঁজতে গিয়ে আলাপ। সাতঘাটের জল খেয়ে পাকাপোক্ত। দু-পাঁচ রকম কথা বলতে বলতে জানালো—তোকে না পেলে হোটেলে রাত কাটাতুম।

লতিফ থমকে দাঁড়ায়—ও আবার কিসের কথা ? ফাঁকা বোট গাঙের হাওয়া ভাড়াটাড়াও নেই। দম ভোর ঘুমোও—

রাত বাড়ে। চরাচর অবসাদে জিরোয়। খাওয়া দাওয়ার পর এক বিছানায় বসে গল্প করতে করতে বিনোদ বলে—শুধু টাকা। হাওয়ায় টাকা উড়তেছে ফিটার জোনে—

লতিফ সেখ বুঝেও ঠিক ধরতে পারছে না। হাঁ-করে কথা গেলে।

বিনোদ বলে, শুধু ধরতে পারলে হয়।

লতিফ সেখ চুপচাপ শুনে যায়। তার আবাল্যের গ্রাম তারপর পাশের বাদা মাঠ ফেলে তিনশো একর উঁচু চড়া মাঠ। সেখানে কত সব কলকারখানা—আরও গেরাম নেবে...আরও কত কি যে হবে! এরি মধ্যে টাকা উড়তেছে... !

লতিফের কানের কাছে ফিসফিস করে—কাল সারাদিন পাঁচ খেপ বালি বইতে পারলে পাঁচ ছশ টাকার রোজগার—রাস্তা হচ্ছে পাকা বাউণ্ডারি হচ্ছে।

লতিফের দুচোখ চক চক করে। টাটিয়ে ওঠে বুকের ভেতরটা।

—এই।

—উঁ।

—যাবি? তোর ঘর ত ফিটার জোনের গায়ে। একটু ধান্দায় থাকলে টাকা—।

বেশ উৎসাহ টের পায় বিনোদ। একটু খেদ চড়িয়ে বোঝায় নেহাৎ একটা মৌজা ছাড় দিয়ে আমার ঘর। তোর মতো কাঁকাল মেঘের গায়ে হলে একবার দেখতুম—

বিছানায় আড়গোড় দিয়ে এপাশ ওপাশ করে লতিফ সেখ। মিটমিট করে লালচে আলো ফুটিয়ে একখানা প্লেন আকাশে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। গুম গুম শব্দ। এলোমেলো কাশি। গলা পরিষ্কার হলে লতিফ বলে বিনোদ, বোটটা—

—ভাইপোরা দেখুক না।

কদিন শেষ বিকেলে আকাশ একদম সেজে থাকে। পশ্চিমে টুকরো টুকরো কাজল মাখা মেঘ। দু-একবার গুড় গুড় শব্দে হাঁটা চলা করে। মেঘে মেঘে কথা হয়। তাদের গোমড়া কালো মুখ হঠাৎ ঝকঝকে হয়ে হাসি খুসিতে ভরে যায়। আবার মেঘগুলো খেলার মাঠের নির্মল শিশু হয়ে যায়, যেহেতু জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি।

হরিপদ আজ অনেক সকালে সারাগঞ্জের মুদিখানা দোকানের মালিক শ্রীচন্দনাথ জানার ক্যাশ বাক্সের সামনে দাঁড়ায়। গলায় তুলসীর মালা, হাতে জপের থলি। সবসময় ঝোলায় হাত গলিয়ে কাঠি গোনে... হরে কৃষ্ণ

হরে কৃষ্ণ।

চন্দ্রনাথ জানার খেয়াল হতেই হরিপদর উদ্দেশে বলে,—জয় নিতাই। হরিপদ দেখলো চন্দ্রনাথ মুদি এত সকালেও দু-কানের লতিতে একেবারে কপালের মধ্যিখানে, নাকের খাড়া থেকে সোজা—এলামাটির ফোঁটা তিলক কেটে বসে গেছে দোকানের কাজে। চন্দবাবু তাহলে কত সকালে ওঠে! তার মধ্যে জপ তপ সেরে নিয়েছে! হরিপদর মুখ চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে!

চন্দ্রনাথ মোটাসোটা চেহারায় একটা ফতুয়া পরে ঝোলার কাঠি গুণতে গুণতে বললো—বুঝলে ভাই, হাতে কাজ মুখে হরি হরি। এইভাবে নিত্য তাঁকে স্মরি—

—কলতার মোড়ে বলেছিলেন, একদিন দেখা করো—

চন্দ্রনাথ বললো,—আগে বোসো তারপর কথা।

চন্দ্রনাথ মালা জপতে জপতে দোকানের সব কিছু একবার নিজ চোখে দেখে নিচ্ছে। বাঁ-হাতে মুসুরির ডালের বস্তা, বড় ধামা ভর্তি হলুদ। পাশাপাশি ছোট সাইজের মাটির গামলায় ধনে জিরে গোছগাছ করে দিচ্ছে।

হরিপদ চুপচাপ বসে আছে।

দু-চারজন লোক হন্তদন্ত হয়ে নিউকাট জুতো মোটা সোলের হাওয়াই চটিতে ধুলো খোয়া মাড়িয়ে শব্দ করে চলে যাচ্ছে। কলতার মোড়ে বাস ধরবে। সিদে কলকাতার বেহালা আলিপুর কোর্ট নয়তো হাজিপুর চলেছে কাজে।

হরিপদর ভালো লাগে না, বেরিয়ে আসে দোকানের বাইরে। মনোরম হাওয়া আকাশ ভর্তি ঝলমলে রোদ্দুর।

চন্দ্রনাথ একটু হেসে বলে, হ্যাঁ ভাই হরিপদ, এই একটুখানিক। ছেলেটা এসে দোকানে বসলেই আমরা নামের ঘরে যাবো—

—আচ্ছা, বলে হরিপদ ঘাড় নাড়ায়। দোকানের পিছনে অনেকখানি জায়গা। গাছপালায় ছায়া ছায়া। পিছনে মাটির দেওয়ালে খড় চাপিয়ে ন্যাতা-পোঁচে একেবারে তকতকে ঘর সামনে। দেওয়ালের গায়ে গোবরমাটি দিয়ে বড় করে একখানা রসকলি কাটা। রসকলির ডাইনে বাঁয়ে এলা মাটি দিয়ে ছোট বড় বর্ণে হরে কৃষ্ণ হরে রাম লেখা।

দু-এক পা এদিক ওদিক ঘুরে তাকাতেই হরিপদ দেখতে পেল সেই বিরাট খিরিস গাছটা যেটা সারাগঞ্জ মৌজা চেনার সহজ চিহ্ন। কতকালের আর কত বড় ঝাঁকড়া। আকাশ ছুঁতে আর একটু বাকি বোধহয়। গাছটা যেন গোটা সারাগঞ্জ মৌজার বিশাল ছাতা। ছায়া দিয়ে রেখেছে মৌজার মানুষজনকে।

তখনও এদিকটায় পথ-ঘাট ভালো হয় নি। গাড়ি ঘোড়ার চলও নেই। যা কিছু সব গাঙ পথ। বোট ডিঙির পিঠ ভরসা। দিনমানে লুকিয়ে থাকত ডাকাতগুলো, গাঙ-ডাকাত খিরিসের ডালে। লোকে বলতো ডাকাতে খিরিস। উঁচু মগ ডাল থেকে নজর করতো গাঙের বুক। ধান চাল ভর্তি বোট, মাদুর হাটের কাপড় গামছার গাঁটরি নিয়ে ডিঙি যেতো চুপ চাপ। তবুও রেহাই নেই। একটা দিন শুধু নিরাপদ, ঘোর অমাবস্যায় কার্তিকের কালীপুজোর দিন।

একখানা কালী মূর্তি উঠতো কালী পুজোয়। সেই ডাকাতরা আর নেই। গাছটা আছে।

গাছতলায় বছরে একবার কালীঠাকুর তোলে সারাগঞ্জের লোকেরা। বছর-ভোর তালপাতার ছাউনি চালার তলায় পড়ে থাকে মূর্তিটা। তারপাশে সংসারটায় এখন দিনে রাতে গাঁজা মদের আড্ডা। দাওয়ায় সুচ সুতো লবনচুস শস্তা আলতা সিঁদুর হঠাৎ পাতলা পায়খানার ট্যাবলেট, জিভে ব্যাথার বড়ি মায় বুড়োরা বেলুন চাইলে নিরোধ বের করে দেয় দোকানি।

পিছন থেকে হাঁক আসে,—ও হরি ভাই, হরিপদ—। তাকিয়ে দেখে চন্দ্রনাথ জানা ডাক দিচ্ছে।

হরিপদ আর দাঁড়ায় না। সোজা হাঁটতে থাকে। ডানদিকের ইট ভাটাটা এখন জিরোচ্ছে। দিনকয়েক আগের বৃষ্টিতে ইট ভাটার কাঁচা ইট গলে ধুয়ে কাদা। ভাটার আগুনে পোড়াতে পারে নি শেষ রাউন্ডটা। শুধু ইটের উপর ইট বসিয়ে হোগলা চাপা কুলি রেজা শেড। শেডগুলো ফাঁকা। পোড়া ইটের পাহাড় প্রমাণ গাছি। দোতলা বাড়িটায় রঙের গন্ধ যেন বাতাসে ভেসে আসছে। চেতলার বাবুদের ধানকল এখন মস্ত ইট ভাটার কাঁচা ইট তৈরি শুকোনোর পাড়ন। বাবুদের বেচে দেওয়া দোতালা বাড়িতে এখন বিহারী মালিক দুটো বউ বাচ্চা নিয়ে বড় সংসার। সামনে কাঁচ ঘেরা ছোট্ট টালির ঘরে ইট কেনা-বেচার অফিস। সি. পি. টি-র মাঠে একলা ইট যোগাতে হিমসিম। তবুও খাল গাঙ থেকে মাটি চেটেপুটে নিয়ে ইট পুড়িয়েছে। ফিটার জোনের মওকায় গরমেন্ট বাবুরা সব চুপচাপ। কত মাটি কত ইট—কোনো হিশেব নেই রেন্ট রয়ালটির। ইট পুড়ে লাল, লাল হয়ে যাচ্ছে বিহারী মালিক নিজেও।

কাছাকাছি আসতেই চন্দ্রনাথ বললো, সকালের দিকটা ত—একটু গোছগাছ করতে সময় খেয়ে যায়। এরপর সারাদিন আমি একেবারে ছাড়া গোরু। যতো পারো উদোম খাও।

হরিপদ হাসে। লোকটাকে দেখেছে, শুনেছে কীর্তনের গলাটা ভালো। নাম-গানের ডাকে দু-দশটা গ্রামে যায়। দু-একটা আসরে দেখেছে হরিপদ,

তুলসি মঞ্চ বসিয়ে মালা গলায় চন্দ্রনাথ কীর্তনের পদ বলে যায়। পাশের লোক দোহারকি ধরে, খোল করতালে তখন আর বোঝা যায় না কে কী বলছে। মচ্ছবে খুব নেচে নেচে গায় চন্দ্রনাথ। বেদীর চারকোণে পোঁতা কলাগাছের উপর দিয়ে রঙিন কাগজের ফুল শিকলি ছাপিয়ে দুবাহু তুলে মহাপ্রভুর মুদ্রায় আবেগে গেয়ে যায়—হ-রি-ই-ই-ই বো-ও-ও-ল-, তখন সেই মঞ্চে যেন একটু কেমন দেখায় মানুষটাকে।

হরিপদ বললো,—আমাকে যে দেখা করতে বলেছিলেন ?

—সবই প্রভুর ইচ্ছা। আমি শুনেছি বাঁশীতে তোমার দম আছে! এখন একতারায় তোমার হাত পাকাচ্ছো—তা ভাই এবার আমাদের একটা কাজ করতে হবে—

—বলুন না কী কাজ।

—তোমাকে খোলে বোল তুলতে হবে। দিনকয়েক মন দিয়ে কান দিয়ে শিখলে সব পারবে।

হরিপদ একটু অবাক হয়। ভালো লাগে নিজেকে, নিজের এমন সাক্ষাৎ খ্যাতি আর মর্যাদা প্রাপ্তিতে।

—ভাই চলো আমাদের নাম-ঘরে। যেতে যেতে বলে চন্দ্রনাথ, এই ত বর্ষাবাদল এলো বলে, এখন দু-চার পাক নেচে গেয়ে গলা সেধে হাত পাকিয়ে নিতে হবে। কার্তিক মাস থেকে বায়না শুরু—

হরিপদ বিমোহিত হয়ে চন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, আমার ত মৃদঙ্গে একদম হাতে খড়ি নেই প্রভু।

—না থাক। আমি আছি।

—হ্যাঁ আছেন।

আড়কাঠের বাঁশে ঝোলানো মৃদঙ্গটা পেড়ে নেয় চন্দ্রনাথ। লাল কাপড়ের মোড়ক খুলে দড়িটা কাঁধে গলিয়ে নিয়ে জল চৌকিতে বসানো ভাববিভোর দু-বাহু তুলে নৃত্যরত গৌরাঙ্গের পটের ছবির দিকে তাকিয়ে বলে, মহাপ্রভুর স্মরণ করো।

হরিপদর গা ছমছম করে! ছবিটা কত দেখা, তবুও যেন কেমন বুক কাঁপিয়ে দেয়। যখন জ্যান্ত ছিলো মানুষটা তখন কত লোককে যে কাঁপিয়েছে…

মৃদঙ্গের বাঁ তালায় চাঁটি মেরে ডান তালায় আঙুলের কাজ দেখায় চন্দ্রনাথ। হৃৎপিণ্ডে ঘা লাগে হরিপদর! কানে আসে…ধো…ধো ধো ধো তাতা খে তৈ।

ধো তাতা খেতা ধো তাতা খেতা।

দিব্যা দিদ্যা ঝাঁ…। দু-এক পর্দা বোল তুলে একটু থামে। কানে

সেঁধিয়ে যায় হরিপদর। বিস্ময়ে যত্নে আঙুলের কাজ কর্ম দেখে। হঠাৎ কাছে ডাকে—শোন ভাই—হরিপদ কাছে আসে।

চন্দ্রনাথ দু-এক মিনিট হরিপদর চোখে চোখ রেখে বলে, পারবে না? কী পারবে ত—

হরিপদ হাঁ-করে দেখে।

—মোটেই কঠিন নয়। আবার একটু আশ্বাস দেয় চন্দ্রনাথ।—একটু ভালো করে আয়ত্ত করত ভাই। কলোনির কীর্তন দলের বড্ড গুমোর। ওরা তিনশ টাকার অষ্টমপ্রহর করে আমি দুশ টাকার অষ্টমপ্রহর করব। আমরা দলটা গড়েপিঠে খানদশেক আসরের পর রেট বাড়াবো। এবারে গানে বাঁশি একতারা খোল—জো বুঝে তিনটেই চালাবো। পারবি নি ভাই তুই—?

এতক্ষণ একটা স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলো হরিপদ। হঠাৎ যেন চড়ায় আটকে যায়। সামনে প্রভু চন্দ্রনাথকে দেখে। বাঁয়ায় বড় গোল দাগ ডাঁয়ায় গাবের কালো দাগ। পেট ফোলা পাগড়ি, মাটির জিনিসে অমন লুকোনো বাদ্যি। সব বিস্ময় কাটিয়ে কলোনির উপর আক্রোশটা জেগে ওঠে। বরং চন্দ্রনাথকে একটু কাছের বলেও মনে হয় হরিপদর,—সে আর বলতে। আপনি থাকলে আমি আছি, চন্দ্রনাথ খুশি হয়ে বলে, হ্যাঁ ভাই সন্ধে মুখে আসতে পারবি নি?

—এলে?

—তাহলে শেখানো দেখানো ভালো হয়। আর দলের সকলে আসে। পালা ধরে ধরে পদ গাই—তাল বাজনার মাত্রা বোঝায় সুবিধে হয়—

—তাই।

—ব্যাস। এই না হলে প্রভুর কৃপা, বলে পটের গৌরাঙ্গকে সাষ্টাঙ্গে গড় জানায়। যেন মচ্ছব তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে চন্দ্রনাথ।

উঠে দাঁড়িয়ে চন্দ্রনাথ কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে,—ঘাবড়াস নি ভাই। যেমন রোজগার হবে—তেমন ভাগ পাবি—মধ্যে থেকে প্রভুর সুধানাম গাওয়া। এ পাপ মুখে গাইতে গাইতে যদি ওপারের পথটা খানিক পোষ্কার হয়—

কথাগুলো কিছু মনে ধরে। কিছু আবার গোলমেলে। তবে বুকের মধ্যে আশ্বাসের বাজনা, যেমন রোজগার তেমন ভাগ। কথাটা মন্দ নয়। যাক পরিশ্রমটা বেকার যাবে নে—।

হরিপদ বাইরের দিকে তাকিয়ে পুরো আকাশটাকে দেখতে পায়। বেলা বেড়ে গেছে, এরপর নাওয়া খাওয়া। তার উপর এতখানি পথ পায়ে হেঁটে।

হরিপদর চোখে মুখে উন্মনাভাব, ধরতে পারে চন্দ্রবাবু। চন্দ্রবাবু বললো, আজ পারলে সন্ধেয় এসো—। না হলে কাল থেকে।

ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানায়।

—সকালে না, সন্ধেয় ?

—সন্ধের দিকে ইচ্ছে।

চন্দ্রবাবু কথাটা শুনেই আবেগে বলে ফেলে, জয় নিতাই। সবই নিতাইয়ের কৃপা। তা না হলে অমন দস্যি মাতাল জগাই মাধাই এমন বদলে যায়…!

মাঝ আকাশে সূর্য বেশ জাঁকিয়ে বসলেও মাঝে মাঝে নীলচে ধোঁয়াটে মেঘের আনাগোনা যেন চোর তস্করের ঘোরা ফেরার আতঙ্কে উদ্বিগ্ন ও উত্তেজিত করে তুলেছে সূর্যটাকে। তখন কালো মেঘে পৃথিবী খানিক নিরুত্তাপ আলোহীন হয়ে পড়ে। অনেক পরে পরে দু-একবার মেঘের গুড় গুড় শব্দ।

একটু জোরেই হাঁটে হরিপদ। স্লুইশ গেটের পাকা রাস্তা ধরে। চওড়া রাস্তা, আবাদি মাঠ থেকে অনেক উঁচু, লরি টেম্পো তিন চাকার ভ্যান রিক্সা যাবতীয় গাড়ি চলাচলের সহজ যাতায়াতের রাস্তা একেবারে সি পি টির মাঠে ফ্রি-ট্রেড জোন অব্দি।

হরিপদ ভাবছিলো, একবার ফিটার জোনের কাছ দিয়ে ঘুরে গেলে কেমন হয়! তখন কেল্লার গড়ানো রাস্তা দিয়ে জোরে লরিটা উঠে আসে। বাঁয়ে স্লুইশ গেট দেখভাল করার অফিস ঘর। কংক্রীটের দো-চালা ঘর, বারান্দা, সামনে ঘেরা অনেকখানি জায়গায় ঝাউ ইউক্যালিপটাস্। দু-একখানা ফুলের গাছ। খুঁটির তারে লুঙি গামছা শুকোচ্ছে। কেমন আপসোস হয় হরিপদর, এমন একটা চাকরিবাকরি হলে ভালো হত। সুখে আছে বেশ লোক কটা।

লরিটা বিকট গর্জন করে উঠে আসে ঢালু রাস্তা বেয়ে। হরিপদ পাশে দাঁড়ায়, লরিটা হর্ন দেয়। লরির ডালায় পায়ের ঠেকনো দিয়ে চারজন লেবার, ভ্রূ চোখের পাতায় পোড়া ধুলো ঝুলছে। হরিপদর কানে হর্নের আওয়াজটা যেন একটু বেশি, অবিরাম মনে হল। ফিরে তাকিয়ে মোটেই অবাক হয় নি। বিনোদ মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভারের জানালা থেকে বলল, কিরে এত বেলা ? যাবি নাকি ফিটার-জোনে ? আয় তুলে নিই—

লরি থেমে গেছে।

হরিপদ দেখতে পেল, লরি ভরতি ইট। কোনো উত্তর না দিয়ে বরং জিজ্ঞেস করে—কোন ভাটার ?

—আব্দালপুরের।

—তুমি একলা ?

—ধুস। একলার কারবার? সাত আটজন সাপ্লাই দিচ্ছে—পুজোর আগেই কাজ শেষ করতে হবে—।

হরিপদ বিনোদের সঙ্গে আর কথা বলে না। বরং ভাবে, এই ত কদিন আগে লরি লরি বালি বইল···এখন শুধু ইট আর ইট। বিনোদ যেন দিনে দিনে জাঁদরেল লোক হয়ে যাচ্ছে। রং ফিরেছে মুখের, মাংস জমেছে গালে।

বিনোদ একটু দরদী হয়ে বলে, এই কাছে আয়।

খুব অনিচ্ছাতে বিনোদের জানলার দিকে এল। বিনোদ মুখ বাড়িয়ে বলল,—আমার সঙ্গে লাগবি ? পয়সা আছে—

হরিপদ এক ঝটকায় হাত নাড়িয়ে বলে,—না।

এ্যাকসেলের গোঙানি শব্দ উপচিয়ে বিনোদের কানে ভীষণ জোরে ধাক্কা লাগে, 'না' এই ছোট্ট কথাটা।

বিনোদ চমকে ওঠে। ড্রাইভারকে বলে,—চালাও।

গাছতলায় বসে উবু হয়ে বিড়ি ফুঁকছে লতিফ শেখ। বুক ছাপিয়ে শাদা দাড়ি। চওড়া কাঁধ। হুস করে লরিটা লিঙ্ক রোডে গড়িয়ে যায়। তারপর মুলোতলার দিকে ভ্যান রিক্সা বোঝাই প্যাসেঞ্জার। রবারের হর্ন চটকিয়ে আওয়াজ তোলে পঁক-পঁক—

হরিপদকে দেখে লতিফ শেখ শুধোয়,—হ্যাঁ ভাই কার লরি গেল ? বিনোদ কাঞ্জির— ?

রাগে দাঁত কিড়মিড়িয়ে হরিপদ বলে, বিনোদ কি আমার বাপ খুড়ো ? সব খবর রাখতে হবে ?

শেখ লতিফ বোট ছেড়ে ফিটার-জোনের ধাঁধায় পড়ে কেমন নাজেহাল। কত গাঙ দরিয়া পার করল বোট বেয়ে, গাঙের হাবসানি চোরা ঘূর্ণির ঝুঁটি ধরে বোট বাগে আনল···শালার ফিটার জোনের নাড়ি বুঝতে হিমসিম। হরিপদর কথায় যেন জাল ছেঁড়ে। লতিফ হাঁটু ধরে উঠে দাঁড়ায়।

হরিপদ গায়ের ঝাল ঝাড়ে—শালার ছাগল ব্যাপারি নিয়েছে ঠিকেদারি। যেন সকলকে চাকরবাকর ঠাওরেছে।

তিনশ একর সি পি টির মাঠটাকে জেলখানার মত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা হচ্ছে। কন্ট্রাক্টরি ভাষায় পেরিফেরিয়াল। পশ্চিম উত্তর কোণে তিনখানা বিশাল শাল খুঁটির ত্রিভুজ। মাচায় দাঁড়িয়ে লোকজন সুর করে গান ধরেছে —এদিকে পাম্প করে যাচ্ছে দুজন দুজন চারজন। মাটির তলা থেকে ঘোলা জল, বালি মেশানো জল। লাইন ধরে শিশিতে জলের স্যাম্পল। শেষ ভালো জলটুকুর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা। পরিষ্কার মিঠে জল যাবে কলকাতায় টেস্টিং-এর জন্যে। এ্যাপ্রুভ করলে তবে সেই জল মিশিয়ে পাঁচিলের প্লাসটার

হবে। মুখের কথা হাওয়ায় উড়ে আসে। কানে কানে ঠিক সেঁধিয়ে যায়। একটু অবাক হয়ে তাকায় টিউকল তৈরির কাঠ কাঠামোর দিকে হরিপদ। ব্যানার্জি কনস্ট্রাকশনের ম্যানেজার খোদ মুর্শিদাবাদ থেকে রাজমিস্ত্রি আর লেবার আনিয়েছে। আনিয়েছিল তাড়াহুড়ো কাজ তুলতে গাঙের ওপার থেকে তিনশ লেবার। শীতলবেড়ের লোকেরা হুংকরে গিয়ে বলেছিল,—হ্যাঁ ম্যানাজার বাবু—

ম্যানেজার লুঙি পরে বোতামওলা গেঞ্জি গায়ে, মাথায় স্প্রিংয়ের ছাতা, দ্রু কুঁচকে মেয়ে পুরুষের দলটাকে নজর করে। নজর কাড়ে প্রথম মাথার চুল ওলটানো রগে টিউমারওলা ছেলেটা। ফুলপ্যান্টের উপর ফুল হাতা গেঞ্জি রোদ পড়ে চিকমিক। একদা দু-এক ঘুসিতে পাঁচ সাতজন লোক হটিয়ে দিতে পারত ম্যানেজার। ছোট্ট ছুরিতে হেভি লাশ ফেলত কয়েক মিনিটে— সে হেন ম্যানেজার বয়সের পলিতে থিতু, কাজ-কর্মের নাড়িজ্ঞানে কিছুটা ধাতস্থ। স্প্রিংয়ের ছাতা বন্ধ করল যেহেতু রোদে এত লোক তেতে পুড়ে যাচ্ছে, বলেছিল—কী খবর বাবা তোমাদের ?

—আমাদের ত আপনারা সব নিয়ে নিলেন—

—সে আমি কী করব বলো ত! গরমেণ্ট জানে—

মাথার চুলগুছি উলটে নিয়ে রুমালে একবার ঘাড়গলা মুছে নেয় নুরুল। কবজি থেকে গেঞ্জির হাতা গুটোয় হাতের স্টিল বালা ঠেলে তোলার মত করে —কিন্তু এখেনে যে এত লোক বাউণ্ডারির কাজ করছে সেটা ত আপনি জানেন বাবুসাহেব— ?

ম্যানেজার কোনো উত্তর না দিয়ে কথা বলতে সময় দেয়।

শীতলবেড়ের লোকেরা হেঁকে ওঠে,—আমরা ভিখিরি হচ্ছি আর পয়সা লুঠে নে-যাবে বিদেশের লোকেরা ? আমাদের সকলের কাজ চাই—

ব্যাপারটা গোলমেলে। বেশি কিছু না বলে শুধু পরামর্শ দিয়েছিল ম্যানেজারবাবু—ভালো কথা ত। তোমাদের প্রধান এম এল এ-কে ধরে বলো, তাঁরাই সব করতে পারবে।

সবাই এক গলায় চেঁচিয়ে ছিল—, সেটা ত পরে। আগের কথা ম্যানেজারবাবু—তোমার কাজ বন্ধ কর। তা না হলে তাগাড় বালির কড়া সিমেণ্টের বোস্তা সব গাঙে ভাসিয়ে দুবো—

এরপর চিঠি দিয়েছিল কণ্ট্রাক্টরবাবুকে। তারপর কাজে বাধা এই মুসাবিদায় চিঠির পর চিঠি চলে যায় স্পেশাল অফিসার কলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোনের কাছে, এস ডি ও, পুলিশ সাহেব তারপর এম এল এ, প্রধান, কালেক্টারদের লোকাল কমিটির কাছে।

পরে সাব্যস্ত হয়েছিল ব্যানার্জি কনসট্রাকশন শুধু একশ লোক বাইরে

থেকে এনে নিজের সুবিধে মত কাজে লাগাবে, বাকি দরকারে স্থানীয় লোককে নিতে হবে। হঠাৎ হরিপদর মনে হল, —আচ্ছা…প্রথম যেদিন আমরা নতুন রাস্তায় মাটি ফেলানোর কাজে হামলা করেছিলুম, পালান মাস্টার কত কথা কাটাকাটি করেছিল। কত দরখাস্ত লেখালেখি করেছে…। এদিন পালান মাস্টারকে দরকার হলু নি। নুরুল…নুরুলটাকে কেউ গেরাহ্য না করে শীতলবেড়ের লোকের কী দাপানি! এত বড় কাজটা নিজেরা করে নিতে পারল! আর কি পালান মাস্টারদের মত লোকদের কত্তামি…মুখ বুকের তেমন দরকার নেই…!

নতুন রাস্তাটা খালপাড় ধরে মুলোতলা হাটের দিকে বেঁকে গেছে, সেখান থেকে লিংক রোড সোজা ফ্রি-ট্রেড জোনের মাঠ ছুঁয়েছে। এই তে-মাথানিতে পয়মালের নতুন চা-দোকান। দো-চালা খড়ের ছাউনি। সামনে কাঁচা বাঁশের বাখারিতে পেরেক মেরে ছখানা খোঁটায় বেঞ্চ। ঘরের সিলভারের ভাতের হাঁড়ি মেজে চায়ের জল ফুটছে। দু-একখানা কষপড়া বয়ামে শস্তা নোনতা বিস্কুট ছোলা মটর ভাজা। দু-তিনখানা প্রাইভেট। তিন চারটে জীপ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার লোকজন চা খাচ্ছে। পয়মালের একসঙ্গে অনেকগুলো খদ্দের। তাদের ঘিরে আট দশজন মিষড়ার লোক। হরিপদ কিসের একটা গন্ধ আঁচ করে। আস্তে আস্তে কাছে আসে।

হরিপদ পয়মালের দোকানের সামনে দাঁড়ায়। এদিক সেদিক শোনে। মিষড়ার লোকজন শুধু ড্রাইভারদের কাছাকাছি। তাদের হাসিঠাট্টা মন দিয়ে শুনে উপভোগ করে।

হরিপদ জিজ্ঞেস করে—পয়মাল ব্যাপার কিরে?

চায়ের গেলাস ধুতে ধুতে বলে, —যাও না নেপালপুরের বাবলাঘেরির মাঠে। সে-এক মহাকাণ্ড।

হরিপদ থেমে যায়। একটু চারদিক সমঝে ব্যাপারটা ধরতে চেষ্টা করে, যতটুকু বোঝে বড় বড় অফিসার ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি। পয়মালের দোকানের পাশে লম্বা দো-চালা একখানা খড়ের ঘর। গোবর-ন্যাতা পোঁচ শুখনোর পর চুনটানা হচ্ছে।

হরিপদ আবার শুধোয়, —ওটা কার হল রে পয়মাল? কী দোকান হবে রে?

—জানি নি বাপু। দোকান না পার্টি অফিস, নাকি ইউনিয়ন অফিস কে জানে—

—পার্টি অফিস!

—না তা কি। কত লোক কত কাণ্ড। আলাদা থানা হাসপাতাল বসাতে হয়ে—

হরিপদ কোনো বাধা দেয় না। পয়মালের মুখের কথার জোয়ারটা শুধু দেখে যায়, শুনে যায়। একবার বলে,—হ্যাঁরে তুই ব্যানার্জিবাবুর ইট বওয়ায় লাগিস নি ?

—দেখতেই ত পাচ্ছো—। লাগলে দোকান চালাচ্ছে কে ? ভূত ? বরং ভূত তুমি, পালান মাস্টার বিনোদ-দা, বিনোদ-দার কথা ছেড়ে দাও। এখন সে ভালো দাঁও বুঝেছে—লরি লরি মাল বইতেছে—হরিপদ একটানা কথা শুনে হাঁপিয়ে ওঠে—ঠিক বুঝলুম নি পয়মাল— ?

—বুঝবে আর কি আমার মাথা তোমার মুণ্ডু। যতসব দল পাকিয়ে হামলা করে বিদিশি লেবার তাড়াবে আর মজুরি পেলে শালার দেশের লেবাররা গামছায় বেঁধে চাল ডাল পুঁইখাড়া থরের চিংড়ি কিনে ঘরে ফেরে। শালারা কি এক কাপ চা খায়, না দু-পয়সা ছোলা ভাজা কেনে ?

—একদম কেনে নে ?

—হ্যাঁ শালারা দু-পয়সা শখ করে খরচ করলে যে বউরা উলটে শোবে।

হরিপদ পয়মালের কথায় হাসে। হাসতে হাসতে তে-মাথা পার হয়ে যায়। এদিকটায় শুধু ভ্যান রিক্সা চলে। নতুন লোকজনের ভিড় বাড়ছে। কোট প্যাণ্ট আর চৌকো এ্যাটাচি কোলে প্যাসেঞ্জার। হাইস্কুলের সব ঘর যারা পার হতে পারে নি তারা, যারা ইস্কুল পেরিয়ে কলেজে-মলেজে পড়ার কথা তারাও ব্যাঙ্কের লোনে ভ্যান রিক্সা পেয়ে হরদম প্যাসেঞ্জার বইতেছে। ভ্যানের পেছনে টিনের টিকিট মারা হাইপোথিকেটেড টু···। পঞ্চায়েত পোড়া ইট বিছিয়ে রোলার গড়িয়ে রাস্তাটাকে মেরামত করে দিয়েছে। পিচ পড়ে নি। তবুও খুব সহজে হেঁটে যায় হরিপদ। সোজা একটু জোরে গেলে বাড়ি ফেরা সহজ।

সরু মজা সুঁতি খাল। মাঝে মাঝে খানাখন্দে জমা জল। বাঁশ ঝাড় আশ শ্যাওড়া দু-একখানা বড় অর্জুন গাছের ছায়া। গা-ভরতি ভুমো ভুমো কাঁটার বুটি নিয়ে শিমুল গাছটা হাত পা মেলে দাঁড়িয়ে। ডানদিকের বাবলা বনে প্যাণ্ট শার্ট পরা মানুষের ভিড়। একজন রোগা রোগা ঝকঝকে চেহারার মেয়েছেলে চোখে মোটা কাচের চশমা। হাতে কাগজপত্র ফিতে টপ টপ টেপা কলে যোগ বিয়োগের মেসিনটা নিয়ে দাঁড়িয়ে লোকজন। মুলোতলা মিষড়া পরশুরামপুরের কজন বুড়ো, অনেকগুলো ছেলেছোকরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে

বুড়োরা বলল,—বাবু আপনারা নিচ্ছেন নিন। এবছরটা আমাদের চাষ

করতে দিন। বীজধানগুলো চারা হয়ে গেছে—একটু বর্ষা চাপ হলে রুয়ে দেবো—।

রোগা রোগা ফরসা চশমার মহিলার পাশে টিকোলো নাক লম্বা চেহারায় ওলটানো চুলে এ ডি এম সাহেব বললেন,—না। একদম চাষ করবেন না।

—সে কি বাবু? আমরা খাব কি সব ত নিয়ে নিলেন।

—আপনাদের চেক দিয়ে যাচ্ছি—টাকা তুলে নেবেন।

—না সার। এই চারাগুলো না হলে যে অন্য জমি রুইতে পারবু নি।

—ঠিক আছে, তুলে নিয়ে যান—

বৃদ্ধেরা একটু হকচকিয়ে যায়। নিজেরা নিজেদের দেখে, পরে বলে—আমাদের খোরাকের জায়গাগুলো নিয়ে নিলেন, সম্বচ্ছর খাব কি করে? তবু এ-বছরটা বাঁচি।

—না।

বৃদ্ধেরা বলে—সার ছেলেপুলে নিয়ে আপনারা আছেন, আমাদেরও ছেলেপুলে নিয়ে সংসার। বাঁচার জন্যে একটু দয়া করুন—

এ ডি এম সাহেব মহিলা অফিসারকে দেখিয়ে বলেন,—আমি নিষেধ করলাম। যা কিছু পারমিশান এস ডি ও-র কাছ থেকে নেবেন। তবে আপনাদের এই কথা আমি উপরে জানাব—এই আশ্বাস দিতে পারি।

ছেলেছোকরারা ঘিরে ধরে—স্যার আমাদের বক্তব্য আছে—

এ ডি এম খর তীক্ষ্ম চোখে একবার তাকিয়ে নেয়,—বলুন ভাই—

—স্যার আমাদের জমি জায়গা চলে যাচ্ছে। সাত আট বছর বি এ, বি এস-সি পাশ করে বসে। গরমেণ্টের কাজ হোক কিন্তু আমাদের চাকরি-বাকরি একটা দেবেন না? ফ্রি-ট্রেড জোনে কত লোক কাজ করবে—আমাদের প্রেফারেন্স দিতে হবে—

—ঠিক কথা ত। এফেকটেড এলাকার লোকদের ত পাওয়া উচিত। আমি কথা দিচ্ছি গরমেণ্টকে জানাব—

নেপালপুর মৌজার চল্লিশ চল্লিশ আশি একর দখল সাব্যস্ত হল খোদ ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিসান থেকে। এ ডি এম সাহেব বললেন,—এই স্যানাল গেজেট করে দিও। চল সব—

লুঙি পরে কাচা পাঞ্জাবি গলিয়ে চিরুনি আঁচড়ানো মাথায় জব্বার এসে বলল,—সার একটা আপত্তি আছে।

—বলুন,

—আমাদের মসজিদ গোসল করার আলাদা পুকুর সেগুলো না হলে শীতলবেড়ের লোকজন আসবে নে।

—নিশ্চয়ই। সে ভাবে ত প্ল্যান করা—

—আর সার আমাদের সাহেবখানা ?

এ ডি এম-এর দু ভ্রু-কুঁচকে যায় ! চোখমুখ ছোট হয়ে এতটুকু । জুব্বার বুঝতে পেরে বলে,—সার ওই আমাদের গোরস্থান আর কি—কথাটার মানে বুঝে তবে ঘোর কাটে অফিসারের । তখন বলেন,—সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মাটি পড়ুক—জায়গাটা হাইল্যাণ্ড হয়ে যাক । আপনারা চলে আসুন এখানে ।

সার, আমাদের ক্ষতিপূরণ কবে পাব ?

—আপনারা ছেড়ে চলে আসবেন—হাতে হাতে চেক পেয়ে যাবেন ।

—না সার । গ্রামবাসী বলছে নগদে টাকা—চেক নয় ।

সেটা বলতে পারছি না । পলিসি ম্যাটার ।—আচ্ছা আমি উপরে বলব । আপনারা এম এল এ, প্রধানদের সঙ্গে বসুন না । কমিটি আছে, কমিটির সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ খুব সহজ—

এখানে কোনো বড় গাছপালা নেই । মাথার উপর বিরাট খোলা আকাশ । সূর্যটা তেজে জ্বলছে । রোদ্দুর, জ্যৈষ্ঠের রোদ, ঘাম ঝরছে গা বুকে, চুলের গোড়া বেয়ে কপালে ঝারানি । ফাঁকা মাঠে মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া এখন, এতক্ষণ একবারও দমকা হাওয়া আসে নি । এ ডি এম সাহেব অস্থির হয়ে ওঠেন । মনে হল, এক লপ্তে এত বড় মাঠ, মাঠ ফুঁড়ে যেন এতগুলো মানুষ সামনে হাজির । পাশাপাশি শুয়ে থাকা ধানের জমি, জমিগুলো জ্যান্ত হয়ে যেন তাঁকে ঘিরে ধরেছে । একটু ছায়া হলে ভালো হত । কিন্তু ছায়া কোথায় ! দু-একখানা বাবলা গাছ কাছাকাছি । দাঁড়ালে চলে, বড় অল্প, প্রায় এক মুঠো ছায়া । ছায়ায় দাঁড়ালে জমির বুড়ো বৃদ্ধ মালিকরা আরাম পেয়ে যদি আরও কথা বাড়িয়ে যায় ! তাই চড়া রোদে পুড়তে থাকেন নিজে এ ডি এম, পোড়াতে থাকেন বৃদ্ধদের । হঠাৎ মনে পড়ে, অফিসে এয়ারকুলার, ফ্যান কত কী । যাদের কাজের জন্যে অত ঠাণ্ডা আরামের ব্যবস্থা—তাদের কাছে তাদের সামনে কাজ করতে আসা কম ঝামেলা নয় ত ! বরং শুখনো কাগজে কালো কালিতে লেখা যাবতীয় সমস্যা সমাধান অনেক অনেক সহজ ।

সারভেয়ার পিওন চেন ম্যান এসে হাজির ।

এ ডি এম সাহেব ভরসা পান । রোদের দহন কমে । বুকে বল আসে সাহেবের । জিজ্ঞেস করেন রায়কে,—কি সব হয়ে গেছে ? সারভেয়ার ঘাম মুছতে গিয়ে থমকে যায়,—হ্যাঁ সার । পরচার এরিয়া আর মাঠের ল্যাণ্ড মিলে গেছে—

—মিলে গ্যাছে ত ? ও কে—চল সব । একটু ঘাড় কাত করে এ ডি এম সাহেব সকলকে জানায়,—আমরা আসি । আপনারা বাড়ি যান ।

—স্যার, বসে বৃদ্ধেরা পিছু নেয় সাহেবের। একজন শুধু চুপচাপ ঠায় দাঁড়িয়ে। ভূষণ পণ্ডিত।

সাহেব পিছনে তাকায় না। সিধে সামনের দিকে হাঁটে।

বৃদ্ধেরা জোর পায়ে হাঁটে। তবুও সাহেব মরীচিকার মত সামনে হেঁটে হেঁটে যায়।

ডান বগল থেকে বাঁশের ডাঁটের ছাতাটা বাঁ বগলে নিয়ে ভূষণ পণ্ডিত মেটে রাস্তা থেকে কাদায় নামে। জেলেপাড়ায় মাস মাইনে দু-টাকায় ক্লাস ফোর অব্দি ছেলেমেয়েদের খেজুর পাতার চ্যাটাই পেতে গোল হয়ে বসে পড়ায়।
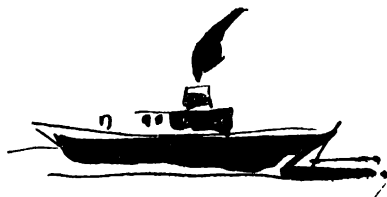
অ আ শেখায়। একে-চন্দ্র দুইয়ে-পক্ষ হাতে ধরে লিখিয়ে মুখস্থ করায়। এমনি করে অক্ষর জ্ঞান দেয়। রাতটা কাটে যতীশ আটাদের বড় সংসারে বাচ্চা কাচ্চাদের নিয়ে হ্যারিকেনের তলায় ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পাঠে নিত্যকার হাজিরে। যতীশ আটার বাপ শ্রীবাস আটা নেপালপুর মৌজায় দশ কাঠার বাবলাবেড় জমিটা দান করেছিল ভূষণ পণ্ডিতকে। পরিবর্তে যদ্দিন বাঁচবে পণ্ডিত, বংশের বাচ্চা কাচ্চাদের অক্ষর চেনাবে। রাতের খোরাকটা আটাদের দশজনের সঙ্গে।

পন্ডিতের কোনো দিকে খেয়াল নেই। হন হন করে এগিয়ে যায়, ঢিলি ঢেলায় দু-একবার হোঁচট খায়। পরোয়া নেই পণ্ডিতের, সোজা মুখ গুঁজে হেঁটে যায়।

হরিপদ একটু তফাতে। খানিকটা গিয়ে ভূষণ পণ্ডিতকে ডাকে,—ও পণ্ডিতমশাই—

পণ্ডিত চমকে তাকায়,—কে রে তুই? আটাদের বংশের কেউ?

হরিপদ উত্তর দেয় না।

পণ্ডিত দানে পাওয়া জমির উপর দাঁড়িয়ে জোরে নিঃশ্বাস ছাড়ে। হরিপদ কাছে আসতেই পণ্ডিত বলল,—তোর কাছে কাগজ কলম আছে?

হরিপদ ভড়কে যায়।—বাব্বা। পণ্ডিত কি এখনেও অ আ শেখাবে নাকি?

—কিরে, উত্তর দে। তোর বাপ কে? বল? কোন আটা? নাকি বিধবা মেয়েটার ছেলে? না নাতি? বল শালা—

—না। কাগজ নেই,—বলল হরিপদ।

—তবে পা-প্যাণ্টুল বুক-পকেটওলা জামা পরেছিস? পোশাকের মূল্য দিতে হয় জানিস,—বলেই নিজে পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ বের করল। হাটে কেনা শস্তা পেনটাও বের করে হরিপদর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল,—নে লেখ···আমি ভূষণচন্দ্র পণ্ডিত অদ্য আকাশের তলায় দাঁড়াইয়া জলন্ত সূর্য সাক্ষী রাখিয়া এই কার্য সুস্থ সবল শরীরে সম্পাদন করিতেছি যে আমার নামীয় জমি উত্তরে শ্রীবাস আটার বড় পুত্র যতীশ আটার এক লপ্তে পাঁচ বিঘের দক্ষিণে দীনু কয়ালের তিন বিঘে পূর্বে প্রিয়নাথ সাঁতরার এক বিঘে—চৌদ্দির মধ্যস্থ মদ নামীয় জমি যাহার দাগ নং ১২৩ খতিয়ান নং ২১৮ মৌজা নেপালপুর···নে তোর নাম বল,—বল? হরিপদ চুপচাপ থাকে। এক বর্ণ না লিখে পণ্ডিতকে দেখে, দেখে অবাক হয়।

পণ্ডিত দাবড়ি মারে—শালা বাপের নাম জানিস নি? আরে বোল ফুটলেই ত প্রথম শিক্ষা—তোমার নাম? বাবার নাম কি? নাম না হলে চিনব কি করে···? বাছবো কি করে? নে-নে তোর নাম বসা ওখেনে—। জানিস ত দানে নিলে দানে ফিরিয়ে দিতে হয়।

হরিপদ জড়বৎ দাঁড়িয়ে একবার একটু মাথা নাড়ায়।

—বুঝলি নিয়েছিলুম তোদের মাটি। তার বদলি চেক ফেক নিয়ে আমার কি হবে বল ত···চেক দিয়ে কি এ মাটি ফেরত পাব···! যে মাটি পাব সে ত অন্যমাটি···, বলতে বলতে ভূষণ পণ্ডিত বোবা!

পণ্ডিতের দু-চোখে জলোচ্ছ্বাস। দানের জমিতে দাঁড়িয়েও যেন অন্য ভূমিতে হাঁটা চলা করছে।

পণ্ডিত হারিয়ে যায় সেই বৈশাখের জলপান বেলায়। বউটা এনেছিল এক গামছা মুড়ি আর এক সিলভার-ঘটি টইটই খাবার জল। নিজেই মধ্য যৌবনে কোদাল চালাচ্ছিল—জমির খানিকটায় বীজতলা ফেলার মত জো করে নিতে। বেলা দশটার কাল, মাঠঘাটে কড়া রোদ, যে যার জমিতে ঘাম দরদরিয়ে কাহিল। চিবোচ্ছিল জলখাবার।

বউটা বলেছিল ভূষণ পণ্ডিতকে,—কোথায় আর ছায়া খুঁজতে গাছতলায় যাবে? আমি আঁচল ধরি, রোদ আটকাই তুমি মুড়ি জল খেয়ে নাও—

দু-ঢোক ঠাণ্ডা জল খেয়ে বুকের তেষ্টা দমায়। কুড়মুড় করে মুড়ি চিবিয়ে ধাতে এসে বলল,—ও সানু তোর আঁচল ছায়ায় যে শীত করে। বউ

সানু কোলের কাছে মাথা টেনে হাত ছেনে ঘাম মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল,—রাতে ভিতে অত গরম হও যে—

সে বয়েসের পণ্ডিত শুধু হেসেছিল।

বউ সানু ঠোঁট টিপে হাসে,—আর হয়ো নি।

—কেন? ঠিকরে ওঠে পণ্ডিত।

—বড় হিংসাকুটে ত তুমি।

—মানে… !

—তোমাকে আর ভালো লাগে নে।

একদম ঝরে যায় পণ্ডিত।

সানু আঁচল ছেড়ে পেটটা দেখায়। তার ফরসা চামড়ায় রোদ সেঁটে থাকে ঘামের আঠায়। নিজেই বলে,—হাত দাও—দেখো না—

পণ্ডিত মুখ ফসকায়,…এসে গেছে…

যুবতী সানু হাসে। মায়ের হাসি। হাসিতে ঝলমল করে গোটা মুখ। চকিতে চারপাশ থেকে রোদ নিভে যায়।

দিশেহারা পণ্ডিত, আজ হাট থেকে জলমুরগি লে-যাবো। খুব ভালো করে রান্না করবি।

—আজ থাক। বরং ওপার থেকে ঘুরে আসি।

—কোন পার?

—বাপের বাড়ি। বাপটার হাঁপানি বেড়েছে খবর পেলুম হাটের গামছা ব্যাপারির মুখে।

পণ্ডিত ছেলেমানুষ হয়ে যায়। তাকায় সানুর মুখের দিকে। সানুর ভেতরটাও কেমন সেঁতিয়ে যায়। বাপটারও কষ্ট! শুধু মনের মধ্যে একটা খবর বুজকুড়ি কাটে, মাকে একবার জানাব নি—

পণ্ডিতের গা ঘেঁষে বসে,—যাই না গো। বিকেলের খেয়ায় যাবো আর ভোরের খেয়ায় ফিরব। দেখো—এসেই ছড়া ঝাট দিচ্ছি উঠোনে—

সেদিন বিকেলে যেন জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়েছে কালো মেঘের দল। গোটা পশ্চিম আকাশটাকে কুপিয়ে মারবে বলে কালো মেঘের গজরানি। শাসাচ্ছে পণ্ডিতের বুকের ভিতর। গাঙ আঁধার করে মেঘ। গাছপালা নাচিয়ে ঢেউয়ের ফণা ছুবলিয়ে মহামত্ত ঝড়। বৃষ্টির ধারায় যেন লক্ষকোটি ছুরি। বিদ্ধ করছে মানুষের যাবতীয় আশ্রয়। সম্বল।

ভূষণ পণ্ডিত ছটপট করছিল ঘরের মধ্যে। বেরিয়ে পড়ে গাঙের দিকে। গাঙপাড়ে দাঁড়িয়ে দেখেছিল—সব আঁধার। ভয়ংকর আঁধার। দেড় দিন পর খবর এল, পর পর তিনখানা খেয়া নৌকো ডুবেছে। দু-দিনের ভোরে

শুধু উঠোন ভরতি ছেঁড়া পাতা। ভাঙা ডালপালা তেঁতুল খিরিসের পাতা থিকথিক করছে দাওয়া উঠোনে। কেউ···ঝাঁট দিতে আসে নি···!

পণ্ডিত অনেকক্ষণ কথা বলছে না দেখে হরিপদ কাগজ কলম হাতে গুঁজে দিয়ে বলল,—চলি গো পণ্ডিতমশাই। বড্ড রোদ—

—রোদ কইরে? ঝড় উঠবে, চোখ নেই রে তোর—

হরিপদ চারদিক, আকাশের পেটে তাকিয়ে দেখে বলে, কই—না ত!

—দুশ্ শালা। শীতল বেড়ে কাঁকাল মেঘ মিংড়ায়রে, বাঁদর—

—ও। এই কথা! তা হোক—তেমনি কত কলকারখানা হবে।

—হলেই বা।

—কত ছেলেছোকরা চাকরি পাবে।

—পাক না।

হরিপদ কাগজকলম রেখে, মাঠ ভেঙে সোজা চলে যায়। আর একটু হাঁটতে পারলে কাঁকালমেঘের মাঠ। তারপর ইট বিছিয়ে মেটে রাস্তা, এখন ভ্যান চলে যায়। পাহাড়ের মত উঁচু মাটির ঢালে ঢালে ঝিঙে পুরুলের লতাপাতায় একদম সবুজ, ঘন সবুজ উপত্যকা। গা বেয়ে তাদের পঁচিশ ঘর সংসার।

ছাতাটা পাশে ফেলে দিয়ে ধুপ করে বসে পণ্ডিত। দশ কাঠার আলঘেরা চৌহদ্দি। মাথার উপর মাঠঘাটের সীমানা নাগালের বাইরে আকাশ। মহাকাশ!

চারপাশে ঝিম ধরেছে।

পাখপাখালিরা মাথার উপর চক্কোর দিয়ে আকাশ এফোঁড় ওফোঁড় করে ফিরে আসছে গাছগাছালির বাসায়, পশ্চিমদিকে নানা রঙের মাখামাখি।

পণ্ডিত আকাশটাকে দেখে। সূর্যটাকে ক্রমশ লাল হতে দেখে। অতবড় সূর্যটা তার সবকিছু গুটিয়ে একটু একটু ছোট হয়ে একদম নিখুঁত গোলাকার। এতক্ষণ ধরে সূর্যাস্ত কোনোদিন দেখে নি পণ্ডিত। দশ কাঠা থেকে এমন দেখা যায়, ভাবতেও পারে নি।

গাছপালা, গাঙপাড় ডিঙিয়ে আকাশে পশ্চিম গায়ে লালচে সোনালি রং ঢেলে দেয় সূর্যটা। খুবই দ্রুত চারদিক ঝাপসা হয়ে আসে, তখন পণ্ডিতের মনে হল···সানুটা···সানুর পেটেরটা যেন গাছপালা এই মাটিটায় কেমনভাবে জড়িয়ে আছে!

সূর্যটা টুপ করে ডুব দিতেই পণ্ডিতের আলঘেরা দশ কাঠাটা···পাশাপাশি জমিগুলো কিছুই নজরে ধরে না। তাঁর মনে হল, সানু নেই,···সানুর পেটেরটা নেই। তারা আর কোথাও নেই··· !
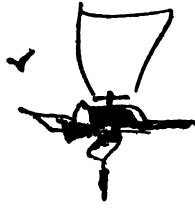
নেপালপুর মৌজায় চল্লিশ চল্লিশ মোট আশি একর জমি অধিগ্রহণের পর বাতাসে কেমন চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ। সকাল হয়, সারাদিন রোদ, নেপালপুরের আশি একর মাঠে ন-শ লোকের একসঙ্গে মাটি কাটার হুম্ হাম্ শব্দ। কাজের ফাঁকে জিরোতে বসে গুণ গুণ কথাবার্তা দিনমানে হাওয়ায় ভর করে থাকে শীতলবেড়ে, কাঁকালমেঘের মাঠঘাটে উঠোন দাওয়ায়।

হরিপদ শেষরাতে উঠে বসে। ঘুমটা একটু ছাড়লে দরজা খুলে বাইরে আসে চোখমুখে জল দিতে। থমকে দাঁড়ায় হরিপদ, উঠোন ভরতি শেষরাত। রাতটা আরও বেশি ঘাপটি মেরে বসে আছে ঝাঁকড়া নিমগাছটার ডালপালায়। ছায়া ঘন মূল কাণ্ড ঘিরে। বাপের হাতে পোঁতা গাছটা! চমকে ওঠে হরিপদ! এত রাত থাকতে মা একলা বসে দাওয়ার পৈঠেয়! তাকিয়ে আছে নিমগাছটার দিকে।

—মা, কেন গো— ?

উত্তর দেয় না মা।

হরিপদ এগিয়ে যায়। আলগা চুলে অল্প হাওয়া,—কিছু হয়েছে? কোনো উত্তর ফোটায় না মা।

আরও কাছে চলে আসে হরিপদ,—মা।

ঘাড় ফেরায় মা। রাত একটু পাতলা হচ্ছে। ফ্যাকাশে ভোর উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে গাছপালার নাগাল খোঁচার বাইরে।

—বল···

—কী হয়েছে··

—কিছু না।

—বসে আছ! ভোর হতে কত দেরি জানো·

—কত আর!

—ধুস্।

মা জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে। তখন আর এক পরত শেষ আঁধার মুছে যায় চারপাশের পৃথিবী থেকে।

একদম কাছে এসে দাঁড়াতেই মা বলল,—তোর বাপকে বড্ড মনে পড়তেছে রে…

আবছা আঁধারে মার শাদা থান কাপড়টা ভীষণ প্রকট। মার বয়সী কত বুড়ি ত এখনও শাঁখা-সিঁদুর পরে দিব্যি সংসার করছে। তাদের পুরুষ মানুষ কোমর নুয়ে নয়ত লাঠি ঠুকে ঠুকে বেতো শরীরে হালুকচালুক ঘুরে বেড়ায়। নির্জন চারপাশ, ছাঁচতলা থেকে বিশাল আকাশ…আলো খুইয়ে দু-চারখানা তারা বিষণ্ন, ক্লান্ত।

কি বা করার আছে হরিপদর! মা মার মত থাকুক। হরিপদ একঘটি জল চোখে মুখে চাপড়ে ঢক্ ঢক্ করে একটু খেল। দড়িতে ঝোলানো গামছায় মুখ মুছে ঘরে ঢুকবে এমন সময় মা ডাকল,—শোন।

দম বাড়ানো বাতির আলোয় দেওয়ালের হুকে মুদঙ্গটা ঝুলছে। ডাইনে কালো গাবের গোলাকার (তালায়) অংশটা চকচক করছে। ডান হাতের আঙুলকটা নিশপিশিয়ে চুলকোয়।

হরিপদ কাছে আসে।

গায়ের কাছে পেয়ে মা বলল,—এই আমি মরলে আমার নামে একটা বেরষো গড়ে দিবি? বেরষো রে বুষো—

—হ্যাঁ হ্যাঁ। নীলকান্তর মায়ের নামে চৌমাথায় গাড়া আছে। এক কাঠে জপের মালা হাতে বুড়ি তার মাথায় ষাঁড়, ষাঁড়ের উপর চৌ-চাকলা রথ—

—অত কি আর করাতে পারবি?

হরিপদ দু-চোখে মাকে ভালো করে দেখে। মাঝে মাঝে একলা ঠায় দাঁড়িয়ে মা, নিম গাছটাকে নিরীক্ষণ করে কী যে পায়! নারকেল পাতার ডগলা ছাড়িয়ে কাঠি বের করে নিমগাছটার ছায়ায় কাঠি কাটতে কাটতে মা একদিন বলেছিল, হরি তুই তখন পেটে, গাছটাও খুব ছোট। জিলিবি জিলিবি করেছিলুম ক'দিন। তা আনবি বাবু দু-চারখানা আন, তা না তোর বাপ একেবারে একসের এনে হাজির। শীতের সময়, রোদে বসে মুড়ি দিয়ে খেয়েছিলুম তোর বাপে মিলে—সেদিন আর রান্না চাপাই নি।

রাত পোহানোর অপেক্ষায় অস্থির দুষ্টু কাকটা একবার ডেকে ওঠে কা-কা-কা। সঙ্গে সঙ্গে গাছ-গাছালির ডালপালায় ঘুমিয়ে থাকা পাখিরা কিচিরমিচির ডাক ছেড়ে গুলতানি পাকায়। পাখিরা টের পায় ভোর ফুটছে।

দাওয়ার পৈঠে থেকে মা হেঁটে উঠোন পেরোয়। পঁচিশ ঘর মানুষের একটাই সদর রাস্তা। দু-পাশে গাছপালা, বাঁশ কঞ্চি রাং চিত্রের ঝোপ দিয়ে ঘেরাঘেরি বেড়া। তাই কোথাও ঝাপসা আঁধার। কোথাও বা ফ্যাকাশে ভোর। মা একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হরিপদ, একটু

খাটো গলায় বলে, দীনু কামারকে নিমগাছটা দে-দিবি। ও যেমন করে দেয় দেবে—

—থামো ত,—বেশ জোরে দাবড়ি মারে। সকালের নির্জনতায় আরও বেশি আওয়াজটা কানে লাগে।

মা উঠোন থেকে শুখনো হাসি হাসে,—আরে কার কখন কি হয়···

মা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় গাঙমুখো। মাটির পাহাড়ের ঢালে এই ক-ঘর সংসার। হাওয়া বাতাস সবই আছে। শুধু চোখের সামনে দেওয়ালের মত উঁচু মাটির স্তূপটা। মনে হয় জোরে শ্বাস নিতে গেলে মুক্ত বাতাসটুকু কম। তাই ক-পা হেঁটে গেলে শুধু গাঙ। উদাস হাওয়া। বড় সড় আকাশ। মনের ভার হালকা হয়ে যায় আস্তে আস্তে।

হরিপদ দেওয়ালের হুক থেকে খোলটা নামায়। ঝেড়ে মুছে নেয়। ডান হাতে গাবের তলায় আঙুল বুলোয়। দা-দা-দা-দা-দা-রে-রে তাখ্—তা বোল ফোটাতে চায়। ফোটে না। কানে ধরে না আওয়াজটা। খোলের পিঠে হাঁটু ঠেকিয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। চুপচাপ। হাতটা ঠিক কাজ করছে না। মেজাজ আসছে না।

হরিপদ আর একবার চেষ্টা করলো বোল ফোটাতে—শুধু কখানা খাপ-ছাড়া লয় হীন আওয়াজ। কোনো প্রাণ নেই। তান নেই।

হরিপদ মুষড়ে যায়। গত রাতের থেকে আজ যেন একটু আলাদা। এক-ঠে বসে থাকলেও মনটা কেমন আনচান করে। ছাব্বিশ সাতাশে এসেও কেন যে মনে পড়ে সেই ছেলেবেলা গরমকালে বইপত্তর বগলে তালপাতার আসন বয়ে নিয়ে ধীরেন মাস্টারের খোড়ো চালায় মর্নিং ইস্কুল। বাপটা কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত—অল্পক্ষণের টিফিনে পট করে খেয়ে ফেলার পরামর্শ দিয়ে বলত—যা খেয়ে নিয়ে খেলা কর গে যা।

মুড়ি আর পাটালি খেতে খেতে ঘণ্টা পড়ে যেত টিফিন শেষের। রাগ হত ক্লাস ফোরের মনিটার রতিকান্তর উপর। আর একটু পরে দিতে পারত না, ঘণ্টাটা···। হঠাৎ, রতিকান্তর গোটা অবয়ব, সেই কপালে ডাং কড়ের ছাটায় ফুটো হয়ে রক্ত ঝরছিল গলগল করে। একটানা লেখাপড়া করে গ্রামের ইস্কুলের দশ কেলাস পাশ করে কলেজে পড়তে গেল রতিকান্ত। কী করে যে খিদিরপুরে কাস্টমে কাজ যোগাড় করে নিলে। এখন বছর ঘুরলেই দশ কাঠা জমি কিনে তবে ফের কাজে যায়। আর আমি। বাপটা বেঁচে থাকলে একবার কসরৎ করে দেখতুম।

হরিপদর খেয়াল নেই, কখন রাত কেটে একখানা টাটকা সকাল পৃথিবীর মাটিতে। বরং এমন থমথমে চারপাশকে অবশ করে দিয়ে সেই শৈশবের স্মৃতিতে আকণ্ঠ ডুবে যায় হরিপদ।···কদিন ঝমঝম্ বৃষ্টি···রাতে ফাঁকা নির্জন চরাচরে বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ। চাল ভর্তি জাহাজটা চড়ায় আটকে

যায়। তলা ফুটো হয়ে ডুবতে থাকে···কেউ নেই গাঙটায়। অতবড় জাহাজটা আস্তে আস্তে ডুবে গেছিল। দূরে শুধু মিটমিট বয়ার আলো।

পরদিন ঝিমঝিনি বৃষ্টি। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া। গাঙের ঘোলা জলে ঢেউ। ওপারে শিবগঞ্জ গাদিয়াড়া বাগনান মেঘে গাঙে একাকার। বৃষ্টির ছাটে পাথর কুচির ধার। চার পাঁচটা গ্রাম ঝেঁটিয়ে চলে এসেছিল গাঙ পাড়ে। গাঙের ঢেউয়ে চাল···পাড়ের কাদায় চটকে ফুলে শাদা শাদা। মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়োর মচ্ছব লেগেছিল গাঙ পাড়ে। কাদা ছেনে ছেনে চাল ধুয়ে কোঁচড় ভরতি করে জমা করছিল যে যার মত। গামছায় বাঁধা চালের ভারে ঠায় দাঁড়িয়ে হরিপদ। ভিজে হাওয়ায় সর্বাঙ্গে কাঁপ ধরে গেছিল। একটা বস্তা টালুপটুলুপ ভাসছিল কাছ বরাবর। বাপটা দেখতে পেয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল গাঙে···মাথা ডুবিয়ে সাঁতরাচ্ছিল তখনও। হৈচৈ করে লাফ দিয়েছিল অনেকে সেই ঢেউ ঘুলুনি জলে। হাঁইফাঁই করছিল লোকগুলো।

হরিপদ বুক ঢিপ্ ঢিপ্ আতঙ্কে তাকায় বাপটার দিকে। দু-পাঁচ মিনিট দশ-বিশ মিনিট ঢেউ কেটে ভেসে যায়। সকলে ফিরে আসে। হরিপদ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। জলো হাওয়ায় দাঁতে দাঁত ঠুকে যায়। বাপটা কোথায়। চালের বোস্তা···

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল হরিপদ। ভিজে সপ্‌সপে ইজের পরে খালি গায়ে।

হরিপদকে ঘিরে মানুষগুলোর ভিড়। হরিপদ জল উপচোনো চোখে বলেছিল···আমার বাপ্···

অন্যরা নিজেদের কোঁচড়ের কাদা মাখা চাল হরিপদর কোঁচড়ে মুঠো মুঠো ঢেলে দিয়ে বলেছিল—যা—যা না—ঘরে যা—সেই কাতর পরামর্শ হঠাৎ এখন চমকে দেয় হরিপদকে। গোটা বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। দু-চোখ ছাপিয়ে জল আসে। এখন—এতদিন পরেও—।

দু-হাতে খোলটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয় সামনে। একটা শব্দ কাটে। যে শব্দ খোলের বোলে নেই।

খোলটোল ফেলে রেখে উঠে পড়ে হরিপদ।

লুঙির উপর হাফ শার্টটা দু-পায়ে হাওয়াই চটি গলায়। সকালের দাওয়া উঠোনে ফট্ ফট্ শব্দ ওঠে। গাঙ পাড়ের দিকে যাবে। একটু ভালো হাওয়ার দরকার। নিম গাছটার তলা দিয়ে যেতেই ভাবল, একটা দাঁতন ভেঙে নিলে হয়। সরু ডগ ডালটা ধরে মটাস করে ভাঙে। মটাস করে ওঠে বুকের মধ্যে। গাছটা ত বাবার হাতের—!

দাঁতন ভাঙতে মন চায় নি। জুতোর ফট্‌ফট্ শব্দ করে নিজের মত

হাঁটে। অনেকটা এগিয়ে যায়। সামনে মাটির পাহাড়। উ'চু ঢিবিটা গাঙ আড়াল করে দৈত্যের মত বসে আছে। ঢাল্ বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে ছোট্ট চারা খেজুর গাছের ডগ ভেঙে দাঁতন করে হরিপদ। একটু চিবোতেই সারা রাতের হিম ভেজা কাঁচা সবুজ গন্ধটা নাকে লাগে। গাঙের ফুরফুরে হাওয়ায় বুকের দমচাপা গুমোটটা আস্তে আস্তে জুড়োয়।

গাঙের জলে রোদ খেলছে তিরতিরিয়ে। দু-একখানা পাখি খানিক গিয়ে ফিরে আসে। মাছের লোভে বকগুলো জলকিনারে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তাদের পালকে রোদ পড়ে আরও ধবধবে শাদা। লম্বা ঠোঁটে রোদ হড়কে সোনার বর্ণ।

মায়ের আঁচল ভরতি কলমি শাক। জল টপছিল আঁচল চু'ইয়ে চু'ইয়ে। বলল—ঘরে চল।

—যাইয়ে।

—খাবি নি?

—যোগাড় কর না।

মা চলে যায়। অনেকটা গিয়ে আবার ফিরে আসে। কাছাকাছি এসে ডাক দেয়—শোন বাপ্।

হরিপদ দাঁতন থামিয়ে কাছে দাঁড়ায়। গাঙের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিশা দেয়,—ওই ত তার চড়া। এখেনে এই বাঁধের ধারে পুঁতে দিস বেরষোটা—

—যাও দেখি, বলে খুব জোরে দাবড়ি দিতে গিয়েও পারে না হরিপদ। মার মুখে অনেক খাঁজ ভাঁজ, কপালে দু-খানা বলি রেখা, চোখ দুটো অনেক কথা বলতে চায়। হরিপদ কিছু বলে না। বলে না মাও। চলে যায়। ফিরে যায়। মাটির ঢিবি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে শাদা থান কাপড়টা—আঁচলে টপছে এক ফোঁটা জল।

গুনগুন আওয়াজটা কানে আসতে না আসতেই, একসঙ্গে অনেক মানুষের কথাবার্তার ঢেউ। হরিপদ বুঝতে পারে নেপালপুরের চল্লিশ চল্লিশ আশি একর মাঠে মাটি কাটা লোকজনের গলা। কাঁকাল মেঘ টপকিয়ে এই গাঙ পাড়েও আসছে। ন-শ লোক—কদিন বা লাগবে মাটি কেটে জায়গাটা উ'চু করতে। জায়গাটার নাম হয়ে যাচ্ছে হাইল্যাণ্ড। মানুষ যাবে বাস করতে, উ'চু জায়গাটায়। হাইল্যাণ্ডে।

কমলালেবুর রং ছড়িয়ে আকাশে রোদ্দুর। হঠাৎ গুড় গুড় শব্দে কান ভারি করে দেয়। হরিপদ গাঙ বাদ দিয়ে আকাশ দেখে। ইতঃস্তত নানা ধরনের মেঘ, মাঝে দু-একখানা ধ্যাবড়া কালো মেঘের হাঁটাহাঁটি।

হরিপদ দাঁড়িয়ে থাকে। চারদিকে কেমন টলমলে পরিবেশ। বুকের ভেতরে অস্বস্তি। দু-চোখে জ্বালা জ্বালা। তবুও তাকায় গাঙ বাঁধের পায়ে

পায়ে রাস্তার দিকটায়। এই রকম সময় ত মাস্টারমশাই আসে সাইকেল নিয়ে। দেখা পেলে একবার খবরটা জিজ্ঞেস করা যেত,—গোডাউন গার্ডের চাকরি কদ্দুর! নানান কথা কানে আসে। কতদূর সত্যি মিথ্যে কে জানে—!

হুস্ করে মাটির পাহাড়ের পাশ দিয়ে একপাল ছাগল উঠে এল। তারা হরষে বুব্-বু-হু করে ডাকে। জায়গাটা তাদের করে নেয়। কোনো পরোয়া নেই। বাঁধ ডিঙিয়ে তিড়িংবিড়িং লাফ দিয়ে ঢালু বেয়ে আবার নীচে নামে। সামনে বাঁধের গা-ধরে গাঙের অঢেল চড়া, ঘাস পাতা ঝোপ ঝাড়। দলছুট ছাগলটাকে দলে জুতে দিয়ে, একদম পিছনে পিছনে এসে ঢালু বেয়ে ফুঁড়ে ওঠে ঝুমরি। ফরসা শরীরে সরু লাল পাড়ে বাটা হলুদ জমিনের শাড়ি পরে আছে। সকালের রোদে ঝলমল করছে ঝুমরি।

হরিপদ তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখে।

ঝুমরি ছাগলের পালটা গাঙ চড়ায় চালিয়ে দিয়ে সামনে দাঁড়ায়,—হরিদা কাল ত মাটিকাটা লোক ছুটোছুটি করতেছিল—কেন বল দিখি—? হরিপদর একটুও বলতে ভাল লাগে না, মজুরি নিয়ে গোলমাল। মাটি কাটতে কাটতে মাটি ফেলার জায়গা দূরে দূরে সরে যাচ্ছে। সাতশ ফুট লম্বা তিনশ ফুট চওড়া আর একটা সাতশ ফুট কিন্তু চওড়ায় দেড়শ ফুট পুকুর। আশি একর জায়গা পুরতে পুকুর দুটো পনের ফুট গভীর করেও মাটি কুলোচ্ছে নে। অতএব আরও নামো—নীচে নামো—ডিপ করো। মাটি চাই মাটি—। লেবাররা হেড লোডে বইছে ঘামে ভিজে—মুখে রক্ত ওঠার দাখিল। সুতরাং মাটিকাটার মজুরি বাড়াও—। রেট বাড়াও—।

হরিপদ তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ঝুমরি কাছে আসে—, হরিদা কিছু শোন নি বোধ হয়?

হরিপদ আর একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়।

তখন আকাশে মেঘে মেঘে ধাক্কা। দু-চারখানা গুড় গুড় গর্জন। আওয়াজটা থিতোলে হরিপদ গজরায় মনে মনে,—শুনবো নি কেন? লিঙ্ক রোডের দু-পাশে ঘর দুটো ত এখন যত লেবার মজুরদের বাপ ঠাকুর্দা। তাদের নাম গোত্রের লিস্টি সেখেনে। পয়মালের চা দোকানের গায়ে একটা বড় করে সাইন বোর্ড ঝুলিয়েছে।

> "কলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন
> কনট্রাকটারস লেবার ইউনিয়ন
> ওয়াই এন টি ইউ সি"

আর এপাশেরটা দুটো কাঁচা বাঁশের খুঁটিতে ঝুলিয়েছে বড় করে লেখা বোর্ড

"কলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন
কনট্রাকটরস্ লেবার ইউনিয়ন
এইচ আই টি ইউ"

তা এখন গার্জেনে গার্জেনে ঝগড়া। হুংকরে যাচ্ছে এরা কোদাল বাগিয়ে ওদের দিকে। কনট্রাকটার বাবুমশাই কাঁচ ঘেরা গাড়িতে বসে কৌটোর গুঁড়ো দুধ কাঁধে ঝোলানো গরম জলে চামচে দিয়ে ঘেঁটে ঘেঁটে চুমুক দিচ্ছে সুড়ুৎ সুড়ুৎ আরামে। গাঁ-গেঁরামের জলে আন্ত্রিক রোগ।

ঝুমরি হরিপদর হাতটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল,—হরিদা একদম সাড়া নেই—গুমসে আছো—

হাওয়ায় উড়ছে ঝুমরির মাথা ভর্তি চুলের দু-এক গুছি। ফরসা মুখে সকালের রোদ। মাঝে মাঝে দ্রুত নিঃশ্বাসের ঘনতাপ।

হরিপদর বুকের মধ্যে পলি চাপা একটা অবহেলা, খুব আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিতেই চুড়ির ঠুন্ ঠান্। পাশ কাটিয়ে পা ফেলে হরিপদ।

ঝুমরি ধাঁধায় পড়ে। আকাশ পাতাল ভাবে। ক্ষণিকে স্নায়ু শিরা ঝাঁকিয়ে ওঠে। তখনই খপ্ করে হরিপদর হাতটা ধরে ঝুমরি, একজন গোটা মেয়ে মানুষের শক্তিতে,—বিশ্বাস যাও হরিদা। সেদিন বিনোদের লরিতে খদ্দের চিনতে গেছিলুম—খদ্দের—মাংস দোকানি—। হরিপদ কিছু বলে নি। আকাশে থমথমে মেঘগুলো গুমগুম শব্দে বুক কাঁপিয়ে বেজে উঠল।

দু-পাল্লার বড় সাইজের লোহার গেট। গেটের গায়ে লোহার কাজে সুঁচলো বল্লমের ফলা। রেড অক্সাইড লাগিয়ে বাসি রক্তের রঙ। ঠিক তলা ছুঁয়ে লিঙ্ক রোডটা মিশে আছে পয়মালের চা-দোকান পাশে রেখে মুলাতলার রাস্তায়।

অজয় মুহুরি থমকে দাঁড়ায়। এত বড় গেট কি কোথাও তেমন দেখেছে! ডান হাতে মোটা জিন কাপড়ের ব্যাগটা আরও নিথর।

পেছনের নালু কাপড়ের খুঁটে পনেরটা টাকা বেঁধে ফের নাই কাপড়ে গুঁজতে গুঁজতে বলে; মুহুরিদা থামলে যে?

—দেখ না, কদিনের মধ্যে ছাগল চরানি মাঠটায় পাঁচিল ঘিরে গেট বসল—। আর ঢুকতে পারব ?

—এখনও দারোয়ান দাঁড়াতে অনেক দেরি—ওপাশে সব ফাঁকা। সরে দাঁড়ায় মুহুরি অময় নালু আরও সাত আটজন লোক। লুঙির উপর ধোয়া জামা নয়ত শতভাঁজ পা-জামার উপর ছেলেদের পরা হাওয়াই শার্ট। হাতের কালো রোম রোদে ধুলোয় কটা রঙ। গাল ভর্তি কাঁচা পাকা দাড়ির চোঁচ।

লরিটায় ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ। পেছনের খোলা ডালা ছাপিয়ে বিশ তিরিশ ফুট লম্বা লম্বা ট্রড্‌ রড লিংক রোডের পিচ খোয়ায় ঘষটে ঘষটে আসছে। দু-একবার রডের গোছায় আগুনের ফুলকি। সেই আদ্দিকালের জঙ্গুলে পাথুরে আতাস ফ্রি-ট্রেড জোনের নতুন রাস্তায়।

লরির মাথায় ছেলেছোকরাদের হৈহল্লা। পাশে খালি গায়ে লোহার মত কালো কালো লেবার। বসে বিড়ি ফুকছে নির্বিকার।

অময় বলল, নালু দেখ রে।

—কি গো মুহুরিদা ?

—দেখলি নি রডের লরির মাথায় নাচানাচি।

—হুঁ।

—কোর্ট থেকে ফিরে দেখি কাল পয়মালের দোকানের সামনে ঠুসোঠুসি। ওয়াই এন টি সি-র রামকান্ত খুব লম্বা চওড়া বুকনি দিচ্ছে আমাদের লিস্টি করা সব লোক রড আনলোডিং করবে। হিটুর ভূপালদা বলল, কেন আমাদের লিস্টির লোকরা কি মেয়েমানুষ ? ওরাও বইবে।

নালু কাছ ঘেঁসে অময় মুহুরির। গোবিন্দ হাঁ করে গেলে অময়ের বাক্য। গোবিন্দ আর থাকতে না পেরে বলল, লরির উপুর ত সব দলের লোক গো অময়দা—

—তাই ত হবে।

—কী রকম ? জিজ্ঞেস করে গোবিন্দ।

—থাকবি তোরা হাটের তাস পাশার আড্ডায়। জানবিটা কি বউয়ের মুখে ?

গোবিন্দর মুখ ভোঁতা।

অময় দেখল গোবিন্দর মনটা ভারি হয়ে গেছে। এখনও মাথা পিছু দশ টাকা করে নেওয়া হয় নি। কোর্ট কাচারির কাজ কামাই দিয়ে এদের নিয়ে যাচ্ছি ডানহারবারে কার্ড করাতে। দরকার কি বেশি বকাঝকা করে— ? গোবিন্দকে কাছে টেনে বলল, তোরা শুনিস নি ? দু-ইউনেনে ঠিক হল লরিতে যা রড আসবে দু-দলের সমান সমান লোক মাল নাবাবে। মজুরি

যা হবে—দু ভাগ। তারপর যার দলে যে-কজন মাথা পিছু ভাগজোক করে নেবে—

বাঁ-হাতি ইটের দেওয়ালে টালি চালা ইউনিয়ন অফিস। মাটি পিটিয়ে বারান্দা। বাঁশ ডগালিতে লাল শালু পত্ পত্ উড়ছে। ভূপাল মণ্ডলকে ঘিরে পনের ষোল জন ছোকরা। চকচকে প্যাণ্ট রঙচঙে জামা, উঁচু সোলের জুতো। বিশ পয়সার দরখাস্তে বাপের নাম-ঠিকানা লিখে সই করে দিচ্ছে। দেড় টাকার রসিদ নিয়ে ভূপাল মণ্ডলের দলের খাতায় নাম ঢোকাচ্ছে। দরকার হলেই চিঠি দিয়ে ডাক করাবে—কাজে এস।

হঠাৎ বলল অময়, নালু দেখত কোথাকার ছোকরা সব? আমাদের আশপাশের?

—ধুস্? ছাঁট কাট যা—কোলকাতার না হয়ে যায়—?

গোবিন্দ যেন হুমড়ি খায়; শালার বেটারা আগে আগে নাম লিখিয়ে রাখতেছে আর আমরা ঘরের ধারে তবুও—

এবার আর সামলাতে না পেরে অময় তড়পায়, যা না হাটে গড়াগড়ি দে। কতদিন ধরে বললুম টাকা জোগাড় কর রেশান কার্ড নিয়ে চল ডানহারবারে এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড করিয়ে দিই—কার্ড না হলে ইউনিনে নাম নেয়?

এবার আরও চার পাঁচ জন সায় দেয়, ঠিক ত। সেজন্যিই ত যাচ্ছি।

—যাচ্ছি, তা চল। রেশান কার্ড নিইছিস সকলে?

—হুঁ।

—তোদের পুরোনো প্রাইমারি সার্টিফেট।

—ওটাও লাগবে? নালু জিজ্ঞেস করে।

—থাকলে ভাল। একটু থেমে পেছনে ফেরে, সকলেই সঙ্গেই আসছে। কাজের কথাটা বলতে গিয়ে চশমা-পরা ভূপাল মণ্ডলকে চোখে পড়ে। যদি আবার কথায় কথায় ফাঁদটা ধরে ফেলে। সুতরাং তাড়াতাড়ি এরিয়াটা উজিয়ে গেলেই মঙ্গল।

তে-মাথানি মোড়। পয়মালের চা দোকানে খদ্দেরের ভিড়। যেহেতু পাশেই রামকান্তর ইউনিয়ন অফিস। সাইন বোর্ডটার অক্ষরগুলোর প্রথম অংশ হলুদ মাঝের অংশ শাদা নীচের অংশ সবুজ। ছিটে বেড়ার দেওয়ালে কালো রঙে গান্ধীজী নেতাজীর ছবি আঁকা। খেজুর পাতার চ্যাটাই বিছিয়ে চারজন তাস পিটোচ্ছে লিঙ্ক রোডের এক ধারে। চালাটার ভিতরে কাগজ কলমের কাজ কথাবার্তার গুঞ্জন।

অময় মুলাতলার রাস্তায় দাঁড়ায়।

নালু গোবিন্দরা পিছনে, ঠিক গায়ের কাছে দাঁড়িয়ে বলে, হ্যাঁ অময়দা?

—কি রে—

—হাঁটবে, না···ভ্যান রিক্সায় ?

—তোরা যা বলবি, তখনই চোখে পড়ে লম্বা লম্বা সাদা দাড়ির ভার নিয়ে বসে আছে গা গতরে ভারি দশাসই লতিফ শেখ। পুরনো গাছটার ছায়ায়।

লতিফ চেঁচায়—ও মুহুরি কোটে যাচ্ছো— ?

অময় কোনো উত্তর দেয় না।

লতিফ তবুও চেঁচায়,—হাজিপুরের দোকান পাটে ভাইপোটাকে দেখতে পাও বল ত—তোর চাচা-দু-পাঁচ টাকা চেয়েছে। চা বিড়ির খরচা—

অময় মুহুরি মুখ খোলে—তা শেখের পো বোট বাওয়া ফেলে এখেনে বসে বসে কী বোঝা বাঁধতেছো—

শেখ লতিফ তার বাঁ-হাতের চওড়া চেটো দিয়ে ডান হাতের সব আঙুল মুঠোর মধ্যে বাগিয়ে রাখে। ভেতরে ভেতরে রেগে যায়। রাগটা যে কার উপর শালার অময় মুহুরি না বিনোদ কাঞ্জি, ঠিক করতে পারে না। ভ্যান রিক্সার হর্ন শুনে চমকে ওঠে! কান খাড়া করে ভ্যানটার হদিশ খোঁজে। সুইশ ডিঙিয়ে ভ্যানটা এদিকেই আসছে। দিশি মেয়েমানুষ বাচ্চাকাচ্চা পোটলাপুটলি নিয়ে কোনো বুড়ো ধাড়া বা ছোকরা মাস্টাররা নয়। একেবারে কোট প্যাণ্টুল পালিশ জুতো কোলের উপর চটকদার চৌকো এ্যাটাচি বাক্স।

ভ্যানটা লিঙ্ক রোডের জোড়েন মাথায় দাঁড়াতেই হুমড়ি খেয়ে ছুটে যায় লতিফ শেখ। কাছে গিয়ে বলে, বাবু আপনারা কোথায় যাবেন ?

তিনজন নেমেই রুমালে প্যাণ্ট ঝাড়ে। কোনো কথা বলে না।

—বলুন না, যা দরকার সব করে দিচ্ছি—আমি আমরা লোকাল লোক।

প্যাসেঞ্জার তিনজন সিগারেট ধরায়। একজন একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলে, ধরুন।

লতিফ শেখ খুসিতে ডগমগ। দিনের প্রথম সওদা। রাস্তাঘাট তৈরি করে পাঁচিল প্রাকার দেওয়া এই সওদাগরি এলাকায়।

একজন বলল,—আমরা এমনি দেখতে এসেছি।

—খুব ভাল। চলুন ঘুরিয়ে দেখাই—কী করবেন আপনারা, দোকানপাতি, হোটেল ?

লোক তিনজন পা থামায় খানিক। তিনজনে আবার হাঁটে।

লতিফ শেখ দাড়ি মুচরে নিয়ে সিগারেটে ভরদম টান দেয়।

হুঁকো কলকেয় জোয়ার ভাটা উজিয়েছে কত শীতের রাতে, কত রোদে বাতাসে···তারপর ত বিড়ি···সিগারেটটা পালে পার্বণে। বেশ সুখ পাচ্ছিল টান দিতে প্রায় বিঘৎ প্রমাণ সিগরেট। একটু কেশে নিয়ে বলে, বাবু এ মাঠ

ঘাট এখন পাঁচ সাতটা গেরাম সব আমার নখদর্পনে। আত্মীয়-কুটুম্বে ভরা —সিনিমা হল, কেজি ইস্কুল, একটু গলা নামিয়ে চুপি চুপি বলে, বিলিতি মদের দোকান ভিতরে আরও শোওয়া বসার ঘর—যা করবেন আমি জায়গা দেখে দিতে পারি।

এতক্ষণ যে মানুষটা একটাও কথা বলে নি লতিফকে কাছে ডেকে বলল, তাতে তোমার লাভ ?

—এ্যাঁ! লাভ···লাভ আর কি ? বিদিশি মানুষ আপনারা এদেশে একটা জিনিশ গড়বেন। আর দু-দণ্ড এলে ত বলবেন এসো লতিফ শেখ—চা খাও।

লোকটা বলল, চলো চলো। একটা দোকানে আমরা সকলে চা খাব—

লোকটার রোগা রোগা চেহারা দু-চোয়াল বসা চোখের তলায় কালে ভূষোর মত ছোপ। লতিফের মনে হল, এত দামি ঝকঝকে কোট প্যাণ্টুল তবুও যেন লোকটাকে মানাচ্ছে নে।

তিন চাকার ভ্যান রিক্সায় উঠবার আগে অময় মুহুরি বলল, এই তোরা এবার ফেলত দশটা করে টাকা। বাসভাড়া তারপর কার্ড করাতে অফিস বাবুদের খরচা—

নাই কাপড়ের খুঁট খোলে নালু।

গোবিন্দ পকেটে হাত দিতে গিয়ে দেখে ভ্যানটার রিং চকমক করছে। ভ্যানওলা ছোকরা স্বপন খুব যত্ন করে রোজ মোছে তাহলে! শালার ছেলেটা পাশটাশ যা করার করেছে তবুও ব্যাংকের কাছে একটা কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। আর আমরা মাঠ কুপিয়ে গরুর ল্যাজ মুড়ে মুড়ে আঙুলে ঘা করে ফেললুম!

অময় দাবড়ায়, কিরে গোবিন্দ তোরটা বাচ্‌চা পাড়বে, না ডিম পাড়বে ?

—দিচ্ছি ত।

স্বপন ছেলেটার ভ্যান চলেছে বাঁই বাঁই। হাওয়া কাটছে। কতকালের চেনা জায়গা পায়ে হেঁটে কলতার হাট থেকে ঘরে গিয়ে জল খেয়েছে। আজ বাস ধরতে শুধু শুধু ভ্যানকে পয়সা ? বাঁ দিকে তাকাতেই ফিটার জোনের পাঁচিলের কাজ চোখে পড়ে। এখনও কত মাঠ ঘিরতে বাকি। আর একটু যেতেই সুইলিশ গেট। গেটের অফিস ঘর। লম্বা ডাঁটায় সূর্যমুখি ফুল। গোবিন্দ, গোটা ভ্যানটা ঝাঁকুনি খায়। অময় বলে, ভাই ভ্যান একটু জোরে। বাসটা ধরবো বড্ড কাজ। গোবিন্দ উশপাশ করে।—হ্যাঁ মহুরিদা ?

—বল না।

—আজই কাড পাবো ?

—হুঁ

—তাহলে সন্ধেবেলায় নাম লিস্ট করাবো এসে ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

গোবিন্দর মুখে আর কথা নেই। বরং তার মাথার মধ্যে, তার বুকের মধ্যে পাক মারে একটা জিজ্ঞাসা…হ্যাঁ মুহুরিদা—কোন ইউনানে নাম লেখালে কাজ কম্ম ঠিক ঠিক পাবো—ঠিক ঠিক ভাল হবে—।

এক টানা বৃষ্টি। প্রতিদিনই বেলা যত সন্ধে মুখো হয়, ঝিমকিনি বৃষ্টিতে কাদা জলে হড়কা পথঘাট বেয়ে আঁধার যেন হুমড়ি খেয়ে পৃথিবী ঘিরে ধরেছে। দেখতে দেখতে চৈত্র বৈশাখের কাঠফাটা রোদে ঝলসানো আঁচড়ানো গাছপালা মাঠঘাট ভিজে ভিজে, একেবারে তাপ জ্বালা হীন।

আজ নিয়ে পাঁচ দিন। প্রতিদিন শেষরাতে ঘুম পাতলা হয়ে গেলে উঠে পড়েছে হরিপদ। মৃদঙ্গটা পেড়েছে দেওয়ালের হুক থেকে। দু-একবার আঙুলের টোকায় বোল তোলার চেষ্টা করেছে—দা-দা-দা-দা-দা-ধে-রে-তাক-তা কানে লাগে নি, ঘরের বাতাসে জমে ওঠে নি। বরং জানলা দিয়ে সাঁ সাঁ হাওয়ার শব্দ। গাছের পাতায় বৃষ্টির টুপ টাপ্ বাজনা। চার পাশের জোলো স্যাঁতানো আলস্য ঘিরে ধরে। সামনে দম কমানো হ্যারিকেনটার তেজও একটু একটু কমে যায়। একবার দম বাড়ায়, খানিক পরে পলতে পুড়ে আংরা দেখা যায়। পরিপদ হ্যারিকেনটা নাড়ায়, তেলের ছলাক ছলাক শব্দ ওঠে না। ঠকাস করে হ্যারিকেনটা মাটিতে বসিয়ে মন খারাপ করে এক-ঠে চুপচাপ। কদিনের ক্রমাগত বর্ষায় দোকান পাটে কেরোসিন ত ঢু ঢু। কাপড়টাকে লুঙির মত করে নিয়ে দু-হাঁটুর ওপার থেকে বাঁ-হাত বেড় দিয়ে ডান হাতের কব্জি খাপটে ধরে চুপচাপ বসে থাকে হরিপদ। কিছুই করার নেই। হ্যারিকেনটা একটু চড় চড় শব্দ করে। তেলহীন পলতে পুড়তে পুড়তে লাল হয়ে যায়। হঠাৎ মনে পড়ে হরিপদর, মৈনানের জেলেপাড়ায় নাকি ইলিশ মাছের তেলে প্রদীপ জ্বালত গেরস্থরা। তখন গাঙ ভর্তি ইলিশ, টাকায় আট গণ্ডা। বয়েম ভর্তি করে ইলিশের তেল রাখত জমিয়ে। এখন গাঙে মাছ নেই, তায় আবার ইলিশ !—তার আবার তেল !

বৃষ্টির ফোটায় অসংখ্য সূঁচ। মাঠ ঘাট বাস্তুভিঠের গায়ে ক্ষত। গাছপালা ক্রমাগত ধাক্কায় একদম কমজোরি। খড় টালির চাল ছাউনি জীর্ণ—। নদীর অবস্থা টালমাটাল। ফুঁসছে গাঙের জল। এক সঙ্গে খেপে উঠেছে আকাশ।

পাঁচ ব্যাটারির টর্চ লাইট টিপে টিপে আলো ফেলে প্রাণতোষ নাইটগার্ড। ব্যানার্জী কনসট্রাকশনের কাঁটাতার ঘেরা এরিয়ার মধ্যে লোহালক্কড়। কোদাল গাঁইতি। মাটি বইবার দু-চাকা ট্রলি। জলে কাদায় প্যাঁচানো সরু জিনিশটার গায়ে টর্চের আলো পড়তেই চমকে ওঠে প্রাণতোষ! গোটা এলাকায় লাইট গার্ড। মাথার ছাতা দমকা হাওয়ায় ফর্দাফাঁই। ঝাঁটাকাটির মত শিক সুতুলি।—ও বাবা গো—, বলে চিৎকার। কপাল বেয়ে নাকের ডগায় জলের বিন্দু।

হোগলার পুরু ছাউনি। ভিতরে ম্যানেজার। দড়ির খাটিয়ায় উশপাশ করে। গঙ্গার কনডিশানটা কেমন, জানতে ইচ্ছা করে।

টর্চের আলো সোজা ফেলে প্রাণতোষ দাঁড়িয়ে থর থর কাঁপে। হাতের কাছে অনেক কাঠকুটো নিতেও যেন অবকাশ নেই। যদি এতটুকু অবসরে, জিনিশটা ভয়ংকর হয়ে ওঠে!

আকাশ আঁচড়ে বিদ্যুৎ বেয়ে যায়। আলোর ঝলসানি। ফুটোফাটা দিয়ে ম্যানেজারের ঘরেও এক ঝলক আলো। ক্ষণ মুহূর্তে ব্রহ্মাণ্ড ফাটিয়ে বজ্রাঘাত।

ম্যানেজার চমকে উঠে চেঁচায়,—প্রাণতোষ।

আলোর বন্যায় তীক্ষ্ম ধার। চোখ সয় নি, তবে প্রাণতোষ বুঝল, ওটা লোহার রড্।

অবিরাম ব্যয়িত হওয়ারও একটা ক্লান্তি আছে। ভোরের দিকে বৃষ্টির ফোঁটার তোড় একটু কমেছে। কিন্তু বাতাসে প্রহার আছে। ধু ধু ফাঁকা গাঙ কাঁপিয়ে উদোম হাওয়া কাঁকাল মেঘের মেটে পাহাড়ে প্রথম ধাক্কা খেয়ে জখম। তারপর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গাছপালায় ঘা খায়। হাওয়ায় উন্মত্ততা কমে। যাতায়াত পথের ফাঁকে দমে যায় তার চলাফেরা। স্বস্তি ফেলে পাখিরা। ডানা ঝাপটানোর সাধ হয়।

হঠাৎ দরজার পাল্লা হাট হয়ে খুলে যায়।

এক ঝলক জলো ঠাণ্ডা হাওয়া গোঁতা মারে। হ্যারিকেনটা নিভে গিয়ে থমকানো ভোর।

হরিপদ কেঁপে উঠে চমকে তাকায়? দরজা জুড়ে মেয়েটা দাঁড়ায়। কপালে জলের ছিটে। কাপড়টা জলের ছাটে আধ ভেজা। বিরাট মান পাতা থেকে জল টপছে অবিরাম। পাতাটা দাওয়ার প্রান্তে ছাঁচতলায়।

—হরিদা···

—কিরে ? এত ভিজে গেলি—

—ও কিছু না—

—দুস্। ছাতা আনলে পারতিস।

—পাতাটা ছাতার চেয়েও বড়সড়।

—ফিরবি কি করে···

—বাববা। আসতে না আসতে তাড়াবে।

হরিপদ এক ছলাৎ হাসে।

হরিপদকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে নিজেই বলে ফেলে—যাবে ?

—কোথায়··· !

—হাজিপুরে। মাংস দোকানির—

—সে ত অনেক লোক আছে—, ঝুমরি ছুটে গিয়ে হরিপদর মুখে হাত চাপা দেয়। ঘন গলায় বলে,—এসেছি তোমার কাছে।

হাত আলগা করে।

—এলি না হয়। করবটা কি ? হরিপদ বলে।

ঝুমরি ভিজে পায়ে ভিজে কাপড়চোপড়ে গুটিসুটি বসে, পরে বলে, বড্ড অসুবিধে। মা পাঠালে—একটা জন্তু না বেচলে ঘরে সব বাড়ন্ত।

একটু থামে ঝুমরি।

বাইরে বৃষ্টি। হাওয়ায় পাক মারছে জ্যৈষ্ঠের পৃথিবী। ডালপালা নুয়ে দুলে ঝাপটাচ্ছে হাওয়ার পাঁজরে। ঘা খেয়ে রেগে মেতে ওঠে দমকা হাওয়া। পাগলা হাওয়া।

—কখুন ?

ঝুমরি খুসিতে হাসে।—বেলা বাড়ুক। আকাশ ধরলে।

ঝুমরি আরও ছেলেমানুষ হয়ে যায়। খুব কাছে আসে। হরিপদর বাসি চুল মাথায়, বিছানার একটা ছেঁড়া সুতো কি ভাবে যেন লেগে আছে। হঠাৎ হরিপদকে বয়সী মানুষের বিভ্রম জাগায়। সেটা দেখতে দেখতে ঝুমরি বলল, আমি তোমাকে ডেকে নে যাবো—

হরিপদর বুকের ভেতরে ডুবো চরে ভারি ধাক্কা। হরিপদ ঝুমরিকে দেখে, তার প্রতিদিনের দেখা মেয়েটাকে।

মাঝে মাঝে হাওয়ার চমকানি, বৃষ্টির শব্দ। সামনে চন্দ্রনাথের দেওয়া মৃদঙ্গটা পড়ে আছে। গায়ে চামড়ার ছট্ বাঁধা এপার ওপার করে। পাশে একদম পাশে ঝুমরি। ঝুমরির কালো চুল ফরসা মুখ চোখ। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। ফাঁকা ঘর। দেওয়াল ঘেরায় লোকচক্ষুর আটক। হরিপদর বুকের

মধ্যে মুচড়ে যায় দু-একবার। ঝুমরি তার দু-চোখে হরিপদর উসুম বাসনা দৃষ্টিতে কাতরতা টের পায়। পুড়তে থাকে ঝুমরিও।

অহেতুক হাসে হরিপদ—, ঝুমরিও হাসে। হাসিতে অবশ সায়।

—ও ঝুমরো তোর মা এ্যায়চে? ও ঘর থেকে মা ডাকে।

সুতো কেটে যায়। তাড়াতাড়ি উত্তর ছোঁড়ে—না গো মাসি।

হরিপদর গোটাগায়ে ভাটার টান। রাগ হয় ও-ঘরটার উপর।

—তোর মাকে একটু ছাগল দুধ দিতে বলিস ত।

—কি করবে মাসি?

—জামপাতায় ওষুধ করবো। পেটটায় বড্ড কামড়ানি—

ঝুমরি চেঁচায়,—শুধু ওষুধ করবে কেন? একটু দই বসিয়ে খাবেখোন—

—দূর পাগলি। এই ঠাণ্ডাবেলায় দই খেয়ে শেলেষ্যা ধরাই—

ঝুমরি এপারে হাসে। হরিপদ ঝুমরিকে দেখে।

কথা ফুরোয় ওঘর— এ ঘর।

আবার জলো হাওয়ার দাপানি।

ঝুমরি উঠে বলল, —হরিদা আসি—

হরিপদ খপ্ করে ঝুমরির হাতটা ধরে। ঝুমরি দাঁড়িয়ে পড়ে। বড় বড় চোখে হরিপদর দিকে নির্বাক প্রশ্রয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। দু-নাকে পুরুষের গন্ধ।

হরিপদর একদম ইচ্ছে করে না ঝুমরির হাতটা ছেড়ে দিতে। বরং বলতে ইচ্ছে হয়, তোর সঙ্গে বেচতে যাবো—আর কাক্কেও নাইবা ধরলি টরলি—
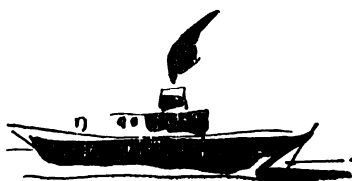
বকবক করতে করতে পথ ভাঙছিল বিনোদ।

হঠাৎ বে-পোট জায়গায় পা পড়তে হোঁচট খায়। আর একটু হলে উলটে গেছিল আর কি! নগেন ধরে ফেলে বলে, অত তাড়াহুড়ি করতেছো— কেন?

—ধুস বাবু। আজ বেলা চারটের মধ্যে একশখানা বাঁশ সাপ্লাই দিতে হবে—

—হবে। তাই বলে জীবনটা খাবি নাকি—

বিনোদের রাগ হয়। চড়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে, শালা তুই যেমন খেরেস্টান শালি কাঙালি, ভিখিরি বুঝিবটা কি। হঠাৎ আপশোস জাগে, উফ্। শালা আমার ঝাড়ের পঁচিশটা বাঁশের দাম আজও দিলি নি, ক্ষিতি বাড়ুজ্যেরটাও মেরে দিলি—তা দে। এখন আর নাইবা ঘাঁটালুম তোকে। বড্ড দায় মাথায়। সাতশ বাঁশ— যোগান দিতে হবে—রেট দিয়েছে পিস পিছু পঁচিশ টাকা।

কাপড়চোপড়ে হাওয়া আটকায়। গাঙের ফাঁকা হাওয়া। জ্যৈষ্ঠের শেষ মুড়োর বেলা আটটার রোদ। অল্প হাঁটলে ঘেমে যায়। হাওয়ায় গা জুড়োতে পিছিয়ে পড়ে নগেন বর ইচ্ছে করে।

বিরক্ত হয়ে বিনোদ একবার পিছন ফিরে তাকায়।

নগেন মুখ হড়কায়, আকাশ কিন্তু ভাল বিনোদ ভাই। কদিন ধরে যা জল কাদা হল, মনে লেগেছিল আর মাস খানেকের মধ্যে ধরবে নি—

বিনোদ ভেতরে ভেতরে রেগে যায়। সব শালা বে-ফসকা খেজুরে কথা। নেহাৎ চাপান দেওয়ার চেষ্টা। ফট্ করে কিছু বলতেও পারে না। আরও দু-দশ পা হাঁটে। গাঙের নৌকো এপার ওপার যাচ্ছে। হাওয়ায় পালের পেট ফুলে ডাবরা। বিনোদ ভাবল, এক্ষুনি অন্তত বিশ-চল্লিশখানা সাইজের বাঁশ ফিটার জোনে না ফেলতে পারলে যে কনটাকটারের কাছে মান থাকে নি। কী করা যায়…ভাবতে ভাবতে কাঁকালমেঘের পাহাড় পাশ কাটায়। উঁচু মাটির ঢিপি, ঢিপি ঘিরে এক ঝাঁক পাখি কিচির মিচির চেঁচাচ্ছে। গলাঅব্দি মাটি খাপটানো নারকেল গাছ তিনটে হাওয়ায় পাতা নাড়ছে সড় সড়।

বাঁধের দাবনা থেকে রাস্তাটা যেন ঢালু হয়ে নেমে গেছে। বিনোদ একবার থমকে দাঁড়ায়। পিছনে তাকিয়ে তারপর হন হন করে নেমে যায়। দূর থেকে খাকি প্যান্ট শার্টটা আরও ছোট দেখায়।

নগেন বর হাঁক মারে—ও বিনোদ ভাই যাবার কথা ত ফিটার জোনে। ওদিকে পাক মারতেছিস যে।

—যে যমরায় যাই। আয় না সঙ্গে—

নগেন সঙ্গে সঙ্গে নামে। নিজের ছায়াটাও লম্বা হয়ে বিনোদকে ধরতে পারে না। মাটির পাহাড়ে ঢাল কেটে কেটে রাস্তা। অভিকর্ষের টানে তর তর করে নেমে যায় নাটা দেহটা। মাথায় অল্পস্বল্প চুল। রোদ চিকমিকি মুন্ডুটা হেলেদুলে নামে। ফিটার জোনের বালি বাঁশ যাকে আর চকচকে টসটসে করে তুলেছে।

মেটে পাহাড়ের ঢালে পঁচিশ ঘর সংসারের কঘর পার হয়ে যায়। একদম খেয়াল নেই। খেয়াল নেই ঝুমরিদের ঘরটাও আর কখানা ডিঙোলে… !

গোল হয়ে ঝাঁকড়া নিম গাছটা উঠোন জুড়ে দাঁড়িয়ে। পুরু কাণ্ডটার গা-থেকে নিকোনো তকতকে উঠোন। নিম গাছটা দেখেই চিনতে পারে বিনোদ। কোনো সংশয় দ্বিধা না করে, সোজা ঢুকে পড়ে উঠোনে। হাঁক দেয়,—হরিপদ আছিস রে ?

কোনো উত্তর আসে না।

পাশ কামরা থেকে হাতের চাঁটিতে মৃদঙ্গ আওয়াজ তোলে ঝাঁ গুড় গুড় ঝা ঘেনা-ঝা··· গুড় গুড় ঝাঁ ঘেনা ঝা—। গোটা উঠোন নিমগাছ গাছটার শাখাপ্রশাখা টালি ছাউনি ঘরটা ঝা শব্দে দুলকি খায়। হাতের খোলটা যেন শ্রীখোল হয়ে যায়।

বিনোদ আর একবার হাঁক দেয়, হরিপদ-ও-ও।

ও ঘর থেকে বিধবা মা বেরিয়ে এসে বলে,—কে রে বাপ্।

চেনা মুখ অথচ কষ্ট হয় বুঝতে, স্মৃতিতে অনেক পলি পড়ে গেছে। মা তাই বলে,—ওরে দেখ না রে কে এসেছে—

হরিপদ খোল ফেলে বেরিয়ে আসে দোরগোড়ায়। একদম অবাক। বিস্ময়ে পরে সংশয়ে চাপা রোষ ফুটে ওঠে বুকের নিচে। হৃৎপিণ্ডে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়।—ব্যাপার কী ?

—বড্ড দরকার।

—ও সব কলোনি ফলোনির গোলমালে নেই আমি।

বিনোদ-হাসে। বেঁটেখাটো শরীরে গোলগাল ফোলা মুখে দারুণ নির্মল সে হাসি। হরিপদর আক্রোশ ধুয়ে যায়। বিনোদের গোল গোল চোখ, এখন কোনো চাতুরি নেই।

—কাছে আয় না।

শাদা কাপড়টা লুঙি করে পরা, গায়ে বগলকাটা গেঞ্জি। লম্বা চেহারায় একটা বিভোর মগ্নতা দু-চোখের পাতায়। পায়ে পায়ে কাছে আসে। নিম গাছের হাওয়া লাগে হরিপদর চোখে মুখে। বিনোদের পিছনে লোকটাকে দেখে একটু অবাক হয়! এইটুকু সময়ে যত চেনামুখ আছে একসঙ্গে হাজির করে নিজের মনে। কারুর সঙ্গে মেলাতে পারে না।

সুতরাং আর দেরি না করে বলল,—বলো এবারে—

—অনেক কাজের কথা, বলে বেশ কাছে টানে বিনোদ।

হরিপদ সোজা দাঁড়িয়ে। মাথার উপর সকালের আকাশ। পাশে বাপের হাতে পোঁতা নিম গাছটা ফুরফুরে হাওয়ায় পাতা নাড়ছে ঝির ঝির। এদিক ওদিক তাকিয়ে বিনোদ বলে,—একটু খাটতে পারবি ?

—কেন পারবুনি ?

—লাভ আছে। একেবারে নগদানগদি।

—যেমন ?

—দু-একটা গেরাম ঘুরে যোগাড় করতে হবে।

—জিনিশটা কী বলো ?

—শ খানেক, নিদেনপক্ষে ও বেলার মধ্যে খান চল্লিশেক বাঁশ। তোর সঙ্গে বাঁশ পিছু বাইশ টাকা রফা হল, ঝাড় থেকে বারো চোদ্দয় দর করতে পারলে এক একটায় ছ-আটটাকার দান মারতে পারবি—

কথাটা নেহাৎ মন্দ না। একেবারে দুম করে ছ-আটশ টাকার রোজগারের অন্ধিসন্ধি। একটু ভাবতে হয়, ভাবতে থাকে হরিপদ। চট করে উত্তর না দিয়ে হাতের চেটো আঙুলের ডগায় গাবের কালো কষ লেগে আছে কিনা পরখ করে। হঠাৎ পিছন ফিরে মার উদ্দেশে চেঁচায়,—খেজুর চ্যাটাইটা কোথায় গো মা— ?

—কেন ?

—পেতে বসবো। কথা আছে—

বিনোদ চলকে ওঠে,—আরে না না। এক্ষুনি আর এক জায়গায় বেরাতে হবে।

—তা। ও বেলা— কাল সকালা হলে হবে নি ?

—সব্বনাশ। মুর্শিদাবাদের রাজমিস্ত্রি এসেছে—একেবারে সাতাশজন এক সঙ্গে গাঁথনি ধরেছে—বাঁশের ভারা না-হলে সকালে তারা বাউণ্ডারির উঁচু গাঁথনি ধরতে পারবে নি—

—বড্ড তাড়াহুড়ো—। একটা দিন যদি হাতে থাকতো—

বিনোদের বুকের ভিতরে খুশি ঘাই মারে। হরিপদর মুখে বিপন্ন প্রলোভনের সব চিহ্ন ফুটে উঠেছে। আচমকা বলে ফেলে, একটা দিন কেন ? দুটো দিন নে না। শুধু ও বেলা খান দশেক বাঁশ ফিটার জোনে ফেলাতে পারবি ? তাতেই হবে। কনটাকটার চোখে দেখুক মাল পড়তে আরম্ভ করেছে।

হরিপদ ব্যবসার ফাঁকটা ধরে ফেলে। আর একটুও দেরি না করে আশ্বাস দেয়,—তাহলে ত কোনো কথা নেই।

—ব্যস। তাই কর—

পকেটে টাকার বাণ্ডিলের গায়ে হাত বুলিয়ে বিনোদ সবে আন্দাজ করেছে, পাশের নগেন গলা শুকিয়ে কেশে ফেলে। একটা দীর্ঘ কাশি। বিনোদ মনে মনে গজরায়,—শালা সেবারে যদি আমার ঝাড়ের পঁচিশটা বাঁশ না মেরে দিতিস, তাহলে আজ এত হন্যে হয়ে ঘুরতে হত। এই তালটা ঠেকাতুম ঘরে বসে বসে—। পাঁচশ টাকার বাণ্ডিলটা বের করে হরিপদর সামনে। একেবারে চকচকে নোট। নিম গাছ চিরে এক ফালি রোদ বল্লম

হয়ে গাঁথে নোটগুলোর গায়ে। রোশনাই তুলেছে কাগজের নোটগুলো। কত সহজে ছাগল ব্যাপারি বিনোদ বান্ডিল বান্ডিল নোট বের করে ফেলছে। ফিটার জোনের হাওয়ায় কেমন নতুন টাকার নেশা ধরা গন্ধ। জায়গাটা যেন একটু একটু করে পালটে যাচ্ছে।

—নে। একেবারে পিন আঁটা পাঁচ টাকার একশ খানা। আরে গুনে দেখবি— ? দেখ—বড্ড কাজ আছে রে এখনও।

হরিপদ কী বলবে, ভাবতে পারছে না।

ও পাশ থেকে মা বলল, গুনে নে বাপ্। পয়সা নিবি গুনে পথ চলবি জেনে—

হরিপদ দাবড়ি দেয়—থামো ত। যা বুঝোনি বকর বকর করো নি —।

হরিপদ পালটে যায়। মুহূর্তে। ফ্রি ট্রেড জোন আর কত দূর!

ছুটলে একদমে পৌঁছানো যায়। ছেলেবেলায় হাডুডু খেলায় ডাক দিয়ে কেউ দমে হারাতে পারে নি হরিপদকে।

সব সেরে সুরে ঘর থেকে বোরোতেই মাথার উপর সূর্য দাঁড়িয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হল হরিপদর, আকাশে একটুও নীল নেই। সব মুছে মাছে সূর্যটা পুড়িয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ক দিন আগের বৃষ্টির ধারা শুধু নাল্লা পুকুর মাঝ মাঠে জমে চক চক করছে তেজি রোদে।

চল্লিশ চল্লিশ আশি একর। নেপালপুরের মাঠটা এখন উঁচু মাটির বড় মাঠ। রোদে পুড়ে বালি অংশ মাটি একেবারে শাদা। গোটা আকাশ যেন নেমে এসেছে। ব্যতিক্রম শুধু পনের একর আয়তন নিয়ে খনন করা পুকুরটা। পুকুর খুঁড়েই মাটিতে—এত বড় ভরাট মাঠ। সরকারি নথিপত্রে পরিচয় শুধু "হাইল্যান্ড।" কেউ আর বলে না দাস সামন্ত হালদারদের বাদা। হাইল্যান্ডের বিশাল উদরে মালিকি আল বাঁধ সব হজম হয়ে একাকার। বর্ষার জল নিকাশি সরু খালটার বাঁকে পোঁতা বট অশ্বত্থের বিয়ে দেওয়া গাছ দুটো জড়াজড়ি করে খানিক ছায়া দিচ্ছে।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে হরিপদ হাইল্যান্ডের উপর নজর গড়িয়ে দেয়। কাছেই মিথড়া গ্রামটা গাছপালা নিয়ে মানুষগুলোকে আগলাচ্ছে। একটু অবাক হয়, ফিটার জোনের এত কাছে গ্রামটা—ওটা বাদ পড়ে শীতলবেড়ে আগেই ঘা খেল! একেবারে গাঙ পাড়ের শীতলবেড়ে। গাঙপাড়ে বাস ভাবনা বারোমাস— কোথায় গাঙ চিবিয়ে খাবে— তার বদলে ফিটার জোন খেতে এল।

মাথার উপর দিয়ে তিনখানা বক উড়ে গেল। হাইল্যান্ড সাঁতরে ওপারে মিথড়ার বাবলা গাছটায় এক ঝলক জিরিয়ে নেয়। পেটে কাঁচা মাছ

গিজগিজোচ্ছে, তাই হাঁপিয়ে কাহিল। আর দেরি না করে হরিপদ সোজা পথ ধরে। বাঁশ বাগান দরকার। দরকার দশখানা বাঁশ।

হরিপদ মুখ গুঁজে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে হাত রেখে হাঁটতে শুরু করে। ব্যাগে ন্যাকড়া জড়ানো একখানা কাটারি। ঠিক যে কোথায় গেলে প্রথম ধাক্কায় বাজি মাত করতে পারবে। হাঁটে, এদিক ওদিক চায়। টিউকলটা দেখে একেবারে থ। কেউ তো নেই কাছে পিঠে—পরশুরামপুর কতদূরে—দূরে তাদের কাঁকাল মেঘ—মুলোতলা এখনও বিশ মিনিট পায়ে হাঁটা পথ। কার দরকারেই বা কলটা লাগবে! ঠিকেদারের চালচালা খোড়ো ছাউনিটা পড়ে আছে। এক সঙ্গে নশ লেবারের হাজার মজুরি খাতা-পত্তরে হিশেব নিকেশ সামলাতে বড় চালা। সেটার খড় উড়ছে হাওয়ায়। কদিনের জল ঝড়ে হেলে গেছে খোঁটা খুঁটি। যাক— কিন্তু টিউকলটা যদি আমাদের কাঁকাল মেঘ সোজা ঘেঁষে হত তবু পঁচিশ ঘর জল খেয়ে বাঁচত—। কত ধরাধরি এম এল এ, বি ডি ও-কে—একটা কল হোক আমাদের গেরামে। উত্তর—টাকা নেই। স্যাংশন নেই। এখন টাকা কোত্থেকে আসে? স্যাংশন—আকাশ থেকে—

তে-মাথানি মেটে রাস্তা পার হচ্ছিল লতিফ শেখ। মাথায় ওলটানো ঝাঁকড়া চুল। চওড়া কাঁধ বড় ভুঁড়ি। উরু থাই ইয়া মোটা—পায়ের পাতা মাপে জুতো জোড়া দশটা দোকান ঘুরলেও মেলে না। চেককাটা লুঙি পরে শাদা বড় ঝুলের পাঞ্জাবিতে পানের রসের লাল ছিট ছিটে দাগ। দু-কষে পানের পিকে ঘা। এখন ঘুর ঘুর করছে ফ্রি ট্রেড জোনে রোজগারের ধান্দায়। ফিচ্ করে এক ঝলক পিক ফেলে জোরে হাঁক দেয়,—ও হরিয়া কোথায় যাবি বাপ্?

ছিলা কেটে যায়। কোনো উত্তর না করে লোকটাকে দেখে বলে, লতিফ চাচা—

—যাবিটা কোথ্‌কে?

—তোমাদের ওদিকে।

—কেন বল দিখি?

বড্ড জ্বালা ত লোকগুলোর এমন আলাপসালাপের ঢঙে। তবে কি বিনোদের কাছে কিছু শুনে ফেলেছে। হতেই পারে। তখন হরিপদ একটু হেসে দেয়,—শেখ চাচা তোমাদের ওদিকে বাঁশ ঝাড় আছে?

—গাঁ গেরামে বাঁশ ঝাড় থাকবে নি? কী হবে তাতে—

—বড্ড দরকার।

—নতুন ঘর বাঁধবি?

—না।

—শীতলবেড়ের লোকেরা হাইল্যাণ্ডে এলে বেচবি? তাদের ত দরকার—

কথাটা ধাঁ করে ব্রহ্মতালু ধাক্কা দেয়। তাই ত এটাও কম কথা না। বাঁশ বেচার একটা সুলুক সন্ধান পাওরা গেল। পরে বলল, এক্ষুনি চাই যে।

—চল্ না কত নিবি। আজ কি বার বলত?

—শুক্কুরবার।

—যা সোজা পেনো ঘোষালের দোরে চলে যা। হাটে গে তামাক দোকানির পাশ দিয়ে রাস্তা ধরবি, পেনোদের ঘর পাবি—

—তুমি যাবে নি?

—আমি? আর গে কী করবো—মৈনানে যাই চান খাওয়া হয় নে। বেলা কত বল দিখি?

দু-জনে উপরে আকাশ দেখে। সূর্যটা মাথা ডিঙিয়ে অনেকটা পশ্চিমে জেঁকে বসেছে। গোলাকার বস্তুটির রঙ তেজ মালুম করে সাব্যস্ত করে—বেলা প্রায় একটা।

হরিপদ বলল, কখন যাবে আর কখন খাবে চাচা?

বড় পুকুরের পাড় দিয়ে সদর রাস্তা। তারপর ঝেঁটানো উঠোন পোট।

উঠোনে এক দলা থুতু ফেলে গোড়ালি থেঁতিয়ে মুছে হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে গজরায়—শালার বাঁদর বাচ্চাগুলো। বলে গেলুম আজ থেকে মটকা খুলে চাল সাইজ কর খোলাগুলো চাপিয়ে দে—তা না শালারা ফিটার জোনে ইট বইতে গেছিস—

পাঁচখানা গ্রামে যজমানি করা ব্রাহ্মণ। পুজোয় পাওয়া লাল পেড়ে শাড়ি পরে বউটা দাঁড়িয়ে দাওয়ায়। ফরসা মুখে বয়সের জং। মুখ ঝামটা দেয়—তা অমন আফসোস করলে তারা এখন আসবে?

পেনো ঘোষালের মুখে এক কলসি তাড়ি গেলার গ্যাঁজলা। তার মাথা ডিঙিয়ে এক হাত উঁচু গেঁটে বাঁশের লাঠিটা তেল বুলিয়ে চকচকে। রোগা

চেহারায় দু-কানের পাশে বড় চুলের পাকানো দু-খানা করে জটা। কামানো মুখ—গোটা নাপতে পাড়া তার যজমান।

বউটা আবার বলল, না হয় সন্ধেবেলায় তার ঘরে গে খবর দেবে—অঁাতকে ওঠে পেনো ঘোষাল।—আমি যাবো তার ঘর বয়ে। শালারা জন্তু—জন্তুর মত থাকবে। চিরকাল পায়ের তলায় ছিলিস, পায়ের ম্যাড়ানি চাটিস—তেমন চাটবি, বলে শুকনো থুতুতে গোড়ালি ঘষে। ঘষে আক্রোশ মেটায়।

হরিপদ থমকে দঁাড়ায় পুকুর পাড়ে।

বউটা দেখতে পেয়ে মাথার কাপড় সামলায়।—দেখো দিকি কে একজন এসেতেছে।

অচেনা মুখ, একটু পরিষ্কার পরিষ্কার পা-জামা হাওয়াই শার্ট গায়ে।

আঁচড়ানো চুলে বিদেশী মানুষ। পেনো ঘোষাল মাথা ছাড়িয়ে যাওয়া লাঠিটা সোজা করে নিয়ে বলল, কে বাবা তুমি ওখেনে?

—আজ্ঞে আমি পানু ঘোষালমশায়ের সঙ্গে দেখা করব।

বাজখাঁই গলায় চেঁচায়—সোজা চলে এস।

হরিপদর পা সরে না।

—বলছি চলে এস। কোনো ভয় নেই। স্বয়ং যমও আসতে সাহস পাবে নে।

হরিপদ খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসে।

দরজা গোড়ায় লম্বা চেহারার ফরসা ফরসা মেয়েটা দাড়িয়ে। কোঁকড়ানো চুলের রাশি। ওপাশে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আর একটু কম বয়েসী মেয়েটা দাঁড়িয়ে কবজির চুড়ি ঘোরাচ্ছে অহেতুক। দু-জনেই লাল পেড়ে শাড়ি পরে। কপাল ফাঁকা। উঠোনের তারে কাচা মশারি শুকোচ্ছে। পুজোয় পাওয়া গামছা জুড়ে জুড়ে সেলাই করা মশারি।

সব দেখতে দেখতে কেমন গা শির শির মন্ত্রদহনের ভয় জাগে। তবুও এগিয়ে এসে লাঠি হাতে জটাধারি রোগা রোগা মানুষটির পায়ে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করে হরিপদ।

—কী খবর বলত বাপ্?

—আজ্ঞে আপনার ঝাড়ে বাঁশ কিনতে এসেছি।

—ও। একটা চ্যাটাই দে ত রে পুষ্প।

দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা গায়ের কাপড় টেনেটুনে পাছার কাপড় আরও ঢাকে, দুটো চ্যাটাই হাতে উঠোনে নামে। টালির ঘরটার ওপাশে লম্বা লম্বা তাল গাছ মাথা ঝাঁকড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের কানাচ দিয়ে বাঁশ ঝাড়ের ডগালি কঞ্চি হাওয়ায় দোল খায়।

—তা কখানা দরকার

—এখুনি দশখানা

—দশখানা কেন পঞ্চাশখানা দিতে পারি। কত করে দেবে বলো দিখি—?

—সেটা আপনি বলুন ঠাকুরমশায়। আপনার জিনিশ

—বড্ড বে-কায়দায় ফেললে ত। যাক তোমার নিজের জন্যে, না অন্য কাজে?

—নিজের জন্যে ত বটে, তবে

—তবেটা কি, বল দেখি বাবা?

হরিপদর কোথায়, যেন বাধে। গলার একটু জড়িয়ে যায়। একেবারে চালু বাঁশ ব্যাপারি হয়ে উঠতে পারে না। তাই একটু থিতিয়ে বলল, এখন অবশ্যি অন্য কাজে—

—তাই বল বাবা। নিজের বাগান বেড়াবেড়ি দিতে দেশের লোকের কাছে দশ বারোয় বেচি। তা অন্য কাজটা কি শুনি?

হরিপদ চুপ মেরে যায়। সাইড ব্যাগের হাতায় হাত ঘষতে ঘষতে ভাবে, বলাটা কি ঠিক হবে, ফিটার জোনে চালান দুবো। মানুষটা ত খেপে আছে ফিটার জোনের উপর। তাই দু-দিক সামলে বলে ফেলে, একজন কিনতে দিয়েছে। তার মাঝখানে আমার দু-চার পয়সা লাভ আর কি ঠাকুরমশায়।

পেনো ঘোষাল চট করে বলে,—বাঁশ দেখলে খুব মনে ধরবে। বাঁশ পিছু ষোল টাকা দাম রইল—যেটা পছন্দ হয় কেটে নাও।

—ষোল টাকা···, কেমন প্রলম্বিত সে স্বর হরিপদর গলায়। তখনই হিশেব করে ষোলো চারে কুড়ি···আর দুই বাইশ। বিনোদের কাছে মাত্র ছ-টাকা লাভ রইল। দুম করে পেনো ঘোষালের পায়ে হাত দিয়ে বলল, ঠাকুরমশায়, আমি একটুও গোপন করি নি। আপনি ওটা চোদ্দয় নামুন। নতুন কাজ ধরেছি—একটু লাভ না থাকলে, পুঁজি গড়ি কিসে?

পেনো ঘোষাল ভেতরে ভেতরে খুশি হয়। যজমান নয়, যজমানের ছেলেপুলেও নয়, একেবারে অচেনা অজানা ছেলেছোকরা ঠাকুরমশাই ঠাকুর·

মশাই করে পায়ে হাত দিচ্ছে, অনুনয় জানাচ্ছে—একটু ভাল লেগে যায় ছেলেটার এমন সমর্পণে।

পেনো ঘোষাল অবাক করে দিয়ে বলল, চলো, ঝাড়ে যাই।

আর একবার পা ছুঁয়ে গড় জানায় হরিপদ।

ওদিকে রান্নাশালে বউটা ঝাল ঝাড়ে—ওখেনে গাছ হয়ে থাকলে ভাতের ফ্যান গালা হবে রে পুষ্প?

পুষ্প ঝাঁকুনি খায়। দোরগোড়া থেকে সরে যায়, রান্না ঘরে দাঁড়ায়। মা গজরাতে থাকে— তোর বাপটা তাড়ি গাঁজা খেয়ে মাথার সব খুইয়েছে। অত দরকার যখন লোকটার ষোলোয় থাকলে কি বিকোত নি? পুষ্প কিছু না বলে ছেলেটাকে আর একবার দেখে। এতদিন বুড়ো ধাড়া গামছা সাজগোজে ছেলেছোকরাকে ত বাঁশ কিনতে দেখা যায় নি।

বাঁশ বাগানে যাওয়ার উদ্যোগ করেই আবার থমকে দাঁড়ায় পেনো ঘোষাল। মাথা ছাড়িয়ে এক হাত লম্বা লাঠিটার তেল চকচকে গায়ে রোদ চমকাচ্ছে। হঠাৎ লাঠিটা ঠুকে সব থামিয়ে বলল, এই বাপ্ একটু জল বাতাসা খাবি?

কোনো সম্মতির অপেক্ষা না করে জোরে হাঁক দেয়—ও পুষি, এক গেলাস জল আর এক মুঠো বাতাসা দে যা ত মা—। পরে নিজের মনেই সাজিয়ে নেয় ঘোষাল, বাগানের গুমুত ঘাঁটা লোকজনকে দেওয়া থোওয়া করতে বড্ড ঝামেলা।

হরিপদ হাঁ-করে ঘোষাল ঠাকুরমশাইকে দেখে।

—আরে বাবা বামনে বাড়ি সওদা করতে এসেছিস একটা জল খা—।

সারাদিন আদাড়েবাদাড়ে ঘোর, যায় আসে নে—

পুষ্প জলের গেলাস আর এক মুঠো বাতাসা, খই থালায় নিয়ে এসে দাঁড়ায়। খইয়ের গায়ে বাসি শুকনো ফুল।

হরিপদ সংকোচে বলে, না না। শুধু জলটুকু হলেই চলবে

—ধুর বাবু খা দিখি নি

পুষ্পের দিকে তাকাতেও এক রাশ লজ্জা।

একটা বাতাসা চিবিয়ে ঢক্‌ঢক্ করে এক গেলাস জল শেষ করে দেয়। আর একটি বাতাসা কিংবা খইয়ের প্রতি আকর্ষণ দেখায় না। পুষ্পও অবাক হয়ে ছোকরাটাকে দেখে। কত লোক ত বাতাসা চিবোনোর লোভে জল খেতে বাবার সঙ্গে গল্প করতে আসে…আর…এ লোকটা সব ফিরিয়ে দিচ্ছে।

—আর নেবে কি ? বলল পেনো ঘোষাল।

—না।

—চল তবে

শুকনো পাতায় ছেয়ে আছে সাত কাঠা বাগানটা। মোটা লম্বা লম্বা বাঁশ। রঙ ধরেছে পাঁচ সনি ছ সনি বাঁশের গোড়াছে গাঁটে গাঁটে। সড়সড়িয়ে ইঁদুর পোকামাকড় পালায়। দু-চারখানা পাখি পক্ষী উড়ে গিয়ে অন্যত্র বসে বিরক্তি জানায়।

হরিপদ ঢুকে যায় বাগানে। সাইড পকেটে হাত বাড়িয়ে ন্যাকড়া জড়ানো কাটারিটা খোলে।

—তোমার লোক কই ? একলা পারবে বাঁশ টানতে

কাছ গোড়ায় একখানা বাঁশে কোপ বসিয়ে বলল, আগে চিহ্নিত করে নিই তারপর ভ্যানওলা ডাকব।

ঠক্ ঠক্ ঠক্ শব্দ হয় তিনখানা। আর একটা বাঁশের গায়ে কোপ বসাতে যাবে, থামিয়ে দিয়ে ঘোষাল বলল—, টাকা পয়সা দিবি নি ?

—নিশ্চয়ই

বাগান থেকে উঠে এসে দশখানার জন্যে নগদ একশ চল্লিশ আর অগ্রিম ষাট টাকা ধরে মোট দুশ টাকা বাড়িয়ে দেয়।

একদম টাটকা তৈরি নোট। ঝকঝকে রঙ। নতুন নোটের গন্ধ বাতাসে পাক মেরে নাকে ঘুলিয়ে ওঠে ঘোষালের। হাত পেতে নেয় টাকাগুলো। হরিপদ জানায়, আজ দশখানা, কাল যতগুলো কাটাই হবে তার দাম হিসেব করে মিটিয়ে দুবো—

—দাও দিখি কত দিচ্ছো। ঘোষালের মুখে চোখে লোলুপ ব্যগ্রতা ফুটে ওঠে। সারা শরীরে স্নায়ু শিরায় তাড়না অনুভব করে। একটা পাঁচ টাকার নোট আলাদা করে রেখে বাকি টাকা পেট কাপড়ের খুঁটে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে রাখে। তারপর পা ফেলে হাটমুখো। যতীশ আটার মদ দোকান বরাবর।

বাঁশ বাগানে শব্দ হয়—ঠক্…ঠক্… ঠক্…

তিনবারের বার বাঁশ চালান খেপ ফেলতে একশখানা পূরণ হল। হরিপদ ভ্যানের পয়সা মিটিয়ে দিতে গিয়েও দিল না, বরং বলল, দাঁড়া না একটু। তোর গাড়িতেই ঘর যাব। একশ খানা দিলুম একটা রসিদ নিই বিনোদ কাজী কোথায় দেখ দেখি—

সামনে পিছনে পাশে তিনশ একর সি পি টি-র মাঠটা মোটা ইটের দেওয়ালে ঘেরা পড়ে আছে। হরিপদর যোগান দেওয়া বাঁশের ভারায় দাঁড়িয়ে মুর্শিদাবাদী রাজমিস্ত্রিরা শেষ দশ ফুটের ইট গাঁথছে। এক নাগাড়ে ফুরোনের কাজ। যোগাড়ে লেবারগুলো দেশের ছেলে, শুধু মুখের হাসি আর চোখ নাচিয়ে কথা কয়ে যায়। দাঁড়াবার ফুরসত নেই। সামনে প্যান্ট-শার্ট পরা ব্যানার্জী কনসট্রাকশনের বাবু দাঁড়িয়ে। কাজ তুলতে হবে।

একখানা বড় লরি আস্তে ফ্রি-ট্রেড জোনের মাঠে ঢোকে। লরির ডালা উপচিয়ে লোহার চকচকে অ্যাঙ্গল। অবিকল ইংরেজি ওয়াই।

হুড়ুম দুড়ুম হাঁটছিল বিনোদ। লক্ষ্য ব্যানার্জীবাবুর ম্যানেজার। মানুষটা রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখছে আর সিগারেট ধরাচ্ছে বারবার। হরিপদ ডাক দিল, বিনোদদা

নাদুসনুদুস বেঁটেখাটো দেহটা পাক মেরে থমকে দাঁড়াল। হরিপদকে দেখে কাছে এসে খুব তোষামুদে গলায় বলে, ভাই, তুই তুই-ই আমার মান রেখেছিস—। তা নাহলে এই সাপ্লাইটা বাতিল হয়ে যেত। এখনও ছশ। তার একটাও এলো নি—। নগেনকে পাঠিয়েছি সবং, বাগনান, গাঙে ভরা ভাসিয়ে আনবে। বিকেলে গাঙ ধার একবার দেখতে যাব, যাবি?

গড় গড় করে অনেক কথা বলে গেল, হরিপদ চুপচাপ শুনে এবার বলল, একটু লিখে দাও একশখানা পেলে—

গাল ফুলিয়ে হাসে বিনোদ।—দূর কিছু দেখতে হবে নি। তুই না আনলে এই জেলখানার মত পাঁচিল গাঁথা পিছিয়ে যেত।

—জেলখানা···

—না ত কি? পালটা শুধোয় বিনোদ। পরে ব্যাখ্যা করে, আরে বাউণ্ডারির মধ্যে মাল তৈরি হবে, বেচাকেনার ব্যবস্থাও এই পাঁচিলের মধ্যে। তারপর ওই ওই, গাঙ ধরে জাহাজ-দিশারা স্তম্ভটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, ওখেনে জাহাজ থামবে মাল বোঝাই হয়ে চলে যাবে চীন জাপান লণ্ডন আমেরিকা—কত দেশে।

—উ! লাভ নেই? কত জায়গার লোক কলে কারখানায় চাকরি পাবে

—পেলেই বা।

—কি যে বলিস।

—আচ্ছা—যে জিনিশ তৈরি হবে সেরকম জিনিশ কলকাতা ব্যারাকপুর হেথায় সেথায় তৈরি হয় নে?

—কেন হবে নি? তুই যেমন হাবাগোবা—এই পাঁচিলের মধ্যে যা হবে সব ট্যাক্স ফিরি···আর যেন ম্যানেজার কী বলতেছিল···ওহ হো ডিউটি ফ্রি।

ট্যাক্স ডিউটি এইসব কথায় ধাঁধায় হরিপদর মাথাটা ভারি হয়ে যায়। শুধু জানতে ইচ্ছে করে হরিপদর এমন পাঁচিল ঘেরা কল ফল···বিকিকিনির জায়গা দেশময়, না পৃথিবীময়, কতগুলো আছে···!

লরিটার সারা শরীর নাচলেই ঝন ঝন শব্দ। লরির ডালা ছাপিয়ে লোহা পাতের হোঁচকা তে-কাঠার মত জিনিশগুলো। হরিপদ শুধোয়—বিনোদ ওগুলোও তুমি আনাচ্ছো?

—কীটা?

দেখল ওয়াই অ্যাঙ্গেল। বাউণ্ডারির মাথায় গাঁথা হবে। সেগুলো দেখে বিনোদ বলে, ধুস্। ও তো স্টার কোম্পানির হেভি অর্ডার। এদিকে আসবি নি আর জানবি কি? খালি ঢোল খোল নিয়ে পড়ে থাকবি—

চোট খায় বুকের মধ্যে হরিপদ। তার ব্যথায় ঘা দিয়ে ফেলেছে বিনোদ। আর বিনোদকে ভাল লাগে না।

লরি থেকে দুজন কোট প্যাণ্ট পরা লম্বা কিন্তু বেশ রোগা রোগা চোয়াড়ে

চেহারার লোক নামে। বিনোদের চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যয়। বিড় বিড় করে নিজের মধ্যে, এইরে স্টার কোম্পানি এসে গেল। নগেনটা এল কই? এখনও বাঁশ আনতে পারল নি···ভারা না হলে দেওয়ালের মাথায় অ্যাঙ্গেল পুতে কাঁটা তার চালাবে কি করে? আজ ব্যানার্জীবাবুর ম্যানেজার না মুখ শোনায়, তার কৃপায় ত বাঁশের অর্ডারটা···। সুতরাং ম্যানেজারবাবুকে ধরতে যায় বিনোদ, এবারটা সামাল দিতে না পারলে যে সব গুবলেট। হরিপদ খানিক বোঝা, বাকিটা আন্দাজে ধরে নেয়। আরও ওপাশে গোল গোল পাইপে তৈরি রেলিং ফ্রেম। বড়সড় ত্রিভুজের মত চেহারা। নতুন রেড অক্সাইডে পানের খয়েরের রঙ। কারখানার মাথায় এ্যাজবেস্টার শেডের কাঠামো।

ভ্যানচালক ছেলেটা বলল, কই চলো না এবার। বিকেলে ভাড়া খাটতে বেরুবো নি?

—নে চল, বলে ভ্যানে চাপতে যাবে তখন দেখতে পেল জোনের পাঁচিলের ওদিকটায় শুধু মাটি। সি পি টি-র মাঠটা এখন জোনের ঘেরাঘেরি এরিয়া। তার এক কোণে লরি লরি মাটি ফেলে দোতলা পাকা বাড়ির মত উঁচু। শীতলবেড়ের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা সেই মাটির ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে গোটা পেরিফেরিয়ালটা দেখছে। ফেব্রিকেটার কোম্পানি সতের তালা বাড়ি বাঁধবে। একেবারে কাছে নদী। তাই মাটির ওজন রেখে তলার মাটিকে শক্ত করে নিচ্চে কোম্পানি। একটা কুকুর উঠতেই ছেলেগুলো হৈ চৈ ফেলে। আর কেউ দেখল কি হরিপদ জানে না, তবে হরিপদ মজা পেয়ে ভ্যানওলাকে বলে, ও যাবি ফেব্রিকেটের পোতায়?

—দুস্ হরিদা। চলো দিখি—

চেপে বসে ভ্যানে হরিপদ। এত বড় মাঠটায় বিরাট কর্মকাণ্ড। হরিপদ আর নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। বাঁ দিকে খোঁটা মেরে মাঠটার খানিক ঘেরা তারকাঁটায়—মাঝখানে দুটো বাঁশে ছোট্টবোর্ড "সাইট ফর ম্যাটান এক্সপোর্ট।"

ভ্যানটা উঁচু নিচু মাটিতে নেচে ওঠে। ঝাঁকুনি খায় হরিপদ। ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমা বসানো হয়েছে আকাশ ছোঁয়ানো লোহার পোস্টের তলায় লোহার মাচায়। তার পাশে কে ভি কন্ট্রোল রুম। নতুন কলি দেওয়ার গন্ধ। ভ্যানটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। বেরোতেই লিংক রোড। লিংকরোডের ঢালে ভ্যানটা পড়ে, স্বপন ছেলেটা প্যাডেল মারে না। ভ্যান রিকশাটা সড়

সড় করে নিচের দিকে চলে যায়। নতুন তৈরি ঝকঝকে পাকা পথ। কেমন নিচে নামার আয়েস পেয়ে বসে।

লিংক রোডের বাঁ-দিকে ফ্রি-ট্রেড জোনের গা ছুঁয়ে হিটু শ্রমিক ইউনিয়ন অফিস ঘর। টালি ছাউনি চালা ইটের দেওয়াল পিলারের উপর পিঠ ফেলে ছায়া দিচ্ছে ভিতরে লোকজনকে। কুড়ি পয়সায় ছাপানো দরখাস্ত হাতে প্রায় পঞ্চাশজন ছেলেছোকরা। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। দামি শাড়ি মিহি চুলের রাশি মাথায় কটা মেয়েও দাঁড়িয়ে পিছনে। হরিপদ অবাক!—এই স্বপন এরা!

—নাম লেখাচ্ছে ঠিকানা দিচ্ছে ইস্কুল কলেজের সার্টিফিকেট দেখিয়ে কাজ পাকা করে যাচ্ছে।

—ইট বওয়া লোহা বওয়া…ওরা কি করবে?

—তুমি যেমন, পরে সব চালু হলে ওদের আগে ডাকবে।

ইউনিয়ন অফিসের পতাকায় হাওয়া লেগে কাপড়ের পত্‌পত্‌ শব্দ। এখনও সামনে খোলা মাঠ। হাওয়া অনেক।

ডান দিকে মিষড়ার মাঠ থেকেই যেন চীৎকারটা এল হঠাৎ—এই-এই-এ ভ্যান দাঁড়া—

হরিপদ দেখতে পায় দু-তিন জন লোক বউ বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সাত আট জনের দল। ওপাশে শীতলবেড়ের শেষ, তারও পিছনে কাঁকলমেঘ, মৈনান ত বেশ তফাতে। সুতরাং না চেনার ত কিছু নেই। তাই আর একটুও দেরি না করে বলল, ও স্বপন থাম।

স্বপন আগেই থেমে গেছিল। একবার জোরে হর্ন টিপল। লোকগুলো যেন হুমড়ি খেয়ে পা ফেলছে। এখন পায়ে পায়ে মাঠ পথ পেতে দিয়েছে।

পাশের মাটি কেটেই লিংক রোডের জন্ম। তাই ঢালে পড়ে লোকগুলো হাঁপায়—ভাই ভ্যান যাবি বাস মোড়ে?

স্বপন ঘাড় ফেরায় হরিপদর দিকে। যেন হরিপদ রাজি থাকলে স্বপন ভ্যানটা চালিয়ে বাস মোড়ে প্যাসেঞ্জার কটা দিয়ে আসে। মাথা পিছু একটা করে টাকা।

লোকগুলো কাছে এসে দাঁড়ায়।

হরিপদ বলে, যাবে ত ঠিকই। তোমাদের হয়েছেটা কি? ডাক্তার হাসপাতাল?

—দূর বাপু। তার চেয়ে বেশি।

—কেমন ব্যাপার··· !

—শীতলবেড়ের উপর দিয়ে দু-নম্বর সেকটারের রাস্তা হচ্ছে—

—হচ্ছে ত, হরিপদ সায় দেয়।

—সকলে নোটিশ পেল ঘরবাবদ টাকা পয়সা পাবে, আমাদের বেলায় নয়।

—কেন? হরিপদর কেমন ঘা লাগে?

দলের ছোকরা লোকটা বলে,—ব্যাঙ্ক চিঠি মেরে আটকে দিয়েছে।

কেউ বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। না হরিপদ না স্বপন। লোক ক জনের অতবড় অসুবিধেটা, বিপদটা কারুর মুখে তেমন ছায়া ফেলে না।

ছোকরা লোকটা বলল,—গরমেন্টের কথায় ঘর দেখিয়ে কাঠা দশেক জমি দেখিয়ে কৃষিলোন নিয়েছিলুম। প্রধান সইও করেছিল। একন ব্যাঙ্ক বলতেছে আমাদের জমি ঘরদোরের ক্ষতিপূরণ আটকে দাও—কারণ লোন শোধ হয় নি।

হরিপদ যেন এতক্ষণে নিঃশ্বাস ফেলে। স্বপন বলে,—অ। তা তোমরা যাবেটা কোন চুলোয়?

ছোকরা লোকটা বলে, ব্যাঙ্ক—ব্যাঙ্কের ম্যানাজারের কাছে। আমরা লোন শোধ করবু নি বলেছি? বেচতে চেয়েছি? নিয়ে নিচ্ছে ফিটার জোনের কর্মকর্তারা—তারা টাকা শোধ দিক। আমাদের ঘরদোরের পয়সা আমাদের দিক—তা না খাব কি?

হরিপদ নেমে পড়ে। ভ্যানটা এখন ফাঁকা। মাত্র এক পলক। তারপর কটা মানুষ, সমস্ত মানুষ জায়গা করে নেই। পরে বাচ্চাদের ডাকে—আয়··· আয় রে কোলে বসবি।

হরিপদ এখন বাচ্চাগুলোকে দেখে। ভ্যানে বসার জায়গা নেই। কোলেই অবস্থান। মানুষগুলোর জায়গাই বা কোথায়··· আর বাচ্চাগুলোর··· ! হাঁটতে হাঁটতে তে-মাথানি মোড়।

পয়মালের চা-দোকানের পাশে রঙিন বোর্ডে লেখা লেবার ইউনিয়ন অফিস। ওয়াই এন টি ইউ সি···। পতাকাটা দু-তিন রঙে রঙিন। গাছপালার আড়ালে এখানে হাওয়া অনেক আটক। বাঁশের ডগায় জিনিশটা নেতিয়ে ন্যাতা হয়ে আছে।

পদ্মমালের চা দোকানের বাতা বেঞ্চিতে চার পাঁচ জন লোক আধ ময়লা প্যান্ট হাওয়াই শার্ট গায়ে বসে বসে শিস মেরে চা খাচ্ছে। থাক্। অমন লোক এখন কত যে আসছে ডেলি। কিন্তু চার পাঁচখানা গাড়ি কেন! গাড়ির মধ্যে লোকজন ত নেই! দুখানা জিপ, দুখানা সাদা এ্যামবাসাডার! জিপ দুটোর কাচের তলায় অশোক স্তম্ভের শাদা সিংহগুলোর গোল গোল চোখে আগ্রাসী দৃষ্টি। হরিপদকে যেন আঁচড়াতে আসছে।

পদ্মমাল চায়ের গেলাস ধুতে বাইরে এসে হরিপদকে দেখে বলে,—আরে হরিদা তোমার ত এখন সময় ভাল।

হকচকিয়ে হরিপদ বলে,—উঁ।

—আরো বাবা যার গেঁটে টাকা তার কথা বাঁকা, যার গেঁট ঢুঢু তার কথা সরু

হরিপদ পদ্মমালের কথায় হাসে। শুকনো হাসি।

হরিপদ বলে,—মাটি কোপাকুপির বদলে আছিস ভালো।

উপরের হাত ঘুরিয়ে পদ্মমাল বলে,—সব তাঁরই ইচ্ছে।

পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে বাসি চুল বাসি কাপড়ে দাঁত মাজতে মাজতে ঝুমরি এমনি তাকাল আকাশের দিকে। ঘন নীলে খাবলা খাবলা শাদা মেঘ। মনে হল তার, অত থকথকে চর্বি গোটা আকাশময়। বোঁদা গন্ধ নাকে আসে। মাজনের থুথু ফেলে গায়ে ঘিনঘিনে ভাব কাটায়।

শির শিরে হাওয়া বয়ে যায়। খেজুর গাছের চেরা পাতায় কাঁপন। পুকুরের জলে তির তির রেখা আঁকে। ঘাটে নেমে জলের দিকে তাকাতেই ফেরিওয়ালার বড়-দেওয়াল আয়না। গোটা মুখটা জল কেটে বসেছে। ফরসা মুখ, চোখের কোনে শুকনো পিচুটি অব্দি ফুটে ওঠে। আঁচল হটে কালো ব্লাউজের এক বুক আলগা। ইচ্ছে করে না গুছিয়ে ঢেকে নিতে। আলগা ঢলঢলে আশ্লেষ। মুখটা ধোয়। চোখে জল দেয় অনেকক্ষণ ধরে।

কপালে ভিজে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবে, আর একটা টাকা কমালে, ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আয়নাটা কিনে নিতুম। ঘরের ছোটো আয়নায় বেলাউজের হুক আঁটতে পাঁচবার পিঠ বেঁকাতে হয়।

জল ঝাপটানির শব্দ। চমকে ওঠে ঝুমরি! তাকিয়ে দেখে, পাড়ের কোণে নীল ডানায় জল ছিটিয়ে লালচে ঠোঁটে চকচকে চুনোমাছ খাপটে মাছরাঙাটা উড়ে গেল খিরিসের মোটা ডালে।

ঝুমরি থির হয়ে দেখে, মাছরাঙাটার বুভুক্ষু দেহ উপচিয়ে শিকার ঘায়েলের খুশি, গলার খয়েরি রঙ। চোখ জুড়িয়ে যায় ডানার চিত্তির বিচিত্তির ছটায়। তখন ভেতরটায়, আঁচল ব্লাউজেরও ভেতরটায় মুচড়ে ওঠে। কিছু একটা ধরার কামনায়। রক্ত নাচে, কণায় কণায় বিজবিজে কামড়।

আর একবার জলে হাত ভিজিয়ে কপাল চোখ মুখে হাত বোলায়। আঁচলে জল মুছতে মুছতে ঘাট ফেলে উপরে ওঠে।

পাশ দিয়ে রাস্তা। চলে গেছে নেপালপুরের নতুন মাটি ফেরা আশি একর হাইল্যাণ্ডের গা ছুঁয়ে সোজা মুলোতলা হাট ফুঁড়ে। বছর তিনেক আগে পঞ্চায়েত ইট বিছিয়েছিল কাঁকাল মেঘের ক ঘরের চলাচলের জন্যে। তারপর যেমনকে মাটি তেমনকে মাটি।

হাইল্যাণ্ডের বালি মাটি শুকিয়ে শাদা। মাঝখানের বড়বড় পুকুর বরাবর ঝলমলে আলো। ঠিক সোজাসুজি আকাশে সূর্যটা জ্বলছে। হাইল্যাণ্ডটা দেখতে গিয়ে আরও দু-এক পা এগয়।

হাইল্যাণ্ডের ওমুড়ো থেকে একসঙ্গে অত লোক! একটু ভাল করে নজর ফেলে ঝুমরি, হাইল্যাণ্ডের ও মুড়ো থেকে এক সঙ্গে অত লোক! প্রায় বার চোদ্দজন মানুষ। সকলে ফুলপ্যান্ট পরা বাবু। তিন চারজন ফিতে ফেলে মাপছে। হাইল্যাণ্ডের উত্তর দিক। খাতা পেনসিল হাতে একজন দাঁড়িয়ে হিশেবটা লিখে নিচ্ছে।

আট দশ জন প্যান্ট শার্ট পরা লোক, চকমকে বুটজুতোয় হাতে ঘড়ি মাথায় বড় বড় চুল লোকটাকে পাঁচ ছজন ঘিরে ওটস্থ। লোকটার ছায়া গায়ের হাওয়াকে মান্য করে হাঁটে সঙ্গের লোকজন।

বিয়ে-দেওয়া বট অশ্বত্থর ছায়ায় সবাই দাঁড়াতে চায়। একটু জিরিয়ে দম নেবার ইচ্ছা, কিন্তু চকমকে বুট জুতো, হাতে ঘড়ি বড় বড় চুলওলা সাহেব এগিয়ে চলে। সুতরাং সঙ্গের বাবুরা পিছু নেয়।

লোকজন কঁাকালমেঘের রাস্তায় পা ফেলে। এগিয়ে আসছে কঁাকালমেঘের গাছপালার ছায়ায় ছায়ায়। বড় চুলওলা সাহেব টেপা কলে সিগারেট ধরাল। বাবুটাকে দেখতে হয়ে গেল অন্যরকম। বড় করে টেনে ধোঁয়াটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দেয়। পরে বলে, এরাই তাহলে আনঅথরাইজড্।

পাশের খাতা পেনসিল হাতে লোকটা বলল, হ্যাঁ সার।

সাহেব খুব অবাক হয়ে নিজেকেই শোনায়, স্ট্রেঞ্জ! এদের ঘর করতে দিল কে? পোর্টট্রাস্টের এ্যাকোয়ার্ড ল্যাণ্ড! সেই ড্রেসিংয়ের সময়ই নেওয়া। এখন গাছপালা গোরু ছাগল বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সংসার। ওঠানোর দায় আমার— !

মুষড়ে পড়ে সাহেব। অনেকক্ষণ ধরে সিগারেটটা টানে। সঙ্গে লোকজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে। সাহেব এদিক ওদিক তাকিয়ে পিছনে দেখল, ঝুমরি ছুটে পালাচ্ছে।

সাহেব সঙ্গের লোকজনকে বলল, নিন শুরু করে দিন।

ইট গেঁথে দো-চালা টালির ঘরে পঞ্চানন কালী মনসার মন্দির। তারপর থেকে খান কয়েক ঘর।

ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে খাতা ফাইল হাতে বাবুটা বলল, ও রমেন ভিতরে গিয়ে ডাকো কাউকে।

খাকি প্যান্টের উপর ফুল হাতা শার্ট। মাঝে মাঝে কাপড়ের সঙ্গে পরে মানিয়ে কাজ সেরে ফেলে। এখন প্যান্টের মধ্যে গুঁজে বাবু বাবু লাগে।

রমেন বলল, বড়বাবু হাঁক দেব, না ঢুকে যাব—

—ডাকতে ডাকতে ঢুকে যা না। কাজ সেরে ত কলকাতায় যাবি, নাকি জেলা পরিষদের বাংলোয় থাকবি?

রমেন চেঁচায়—কে আছেন ভাই? কোনো উত্তর নেই। আবার ডাকে—, কে আছো গো—আমরা অফিস থেকে এসেছি।

খড় চাপানো চার চালা। মাটির চাপ কেটে কেটে বসিয়ে মোটা দেওয়াল। খেঁটে বাতায় পেরেক মেরে জানালার গরাদ, আগড়ের দোর। ন্যাতা পোঁছে পরিষ্কার দাওয়া উঠোন। উঠোনে নারকেল পাতার ছাউনিতে রান্নাশাল।

ময়লা কাপড়ে গা জড়ানো থুত্থুড়ে বুড়ি। দেওয়াল ধরে ধরে বাইরে

আসে। ঘোলাটে চোখ, কপালে চারখানা বলির ভাঁজ। গালের মাংস কুঁকড়ে কুঁচকে বাসি কাপড়। বললো—কে রে বাপ্‌।

—আমরা গো, দিদিমা বলতে গিয়ে রমেন সামলে নেয়,—ঠাকুমা।

শুধু মাড়ি পিষে আলগা উচ্চারণ,—কোথ্‌কে এ্যায়চো?

—গরমেন্টের অফিস থেকে?

পৃথিবীর বুকে আর কটা দিন তার ঠিক নেই। তবে এমন করে ঘর বয়ে কোনোদিন ত গরমেন্টের লোকজন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ায় নি। সুতরাং বিস্ময়ে আর আতঙ্কে ঘোলাটে চোখজোড়ায় আকুল দৃষ্টি।

রমেন বলল,—বাড়ির লোক, তোমার ছেলেবউরা কোথায়?

বুড়ি ভয় পায়। তবুও বলে, ছেলে ত গরমেন্টের কারখানায় মাটি বইতে গেছে—

—তোমার বউ নাতিপুতি?

—বউ গেছে গাঙ-ধারে জ্বালুন কাটতে নাতিপুতিরা তার সঙ্গে।

—তোমাদের যে উঠতে হবে।

—কোথায়?

—এখেন থেকে হাইল্যাণ্ডে যেতে হবে।

বুড়ি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। খানিক শোনে, খানিক বোঝে, তারপর সব গোলমাল হয়ে যায়।

চেঁচিয়ে ওঠে হঠাৎ,—মাথা গুঁজব কোথায় রে আবাগীর বেটা—

—বললুম ত হাইল্যাণ্ডে।

বুকের মধ্যে জল ঘুলোয়, এত ভিক্ষে দুঃখু করে তৈরি ঘর দোর দাবা উঠোন—গাছপালা…এসব ছেড়ে আবার কোথায়? সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে জানায়—হ্যাঁ বাপ্‌ খাব কি? পুইসা কোথায়, ঘর বাঁধব?

—চেক দুবো টাকা পাবে। ঘর বাঁধবে—

বড়বাবু হাঁক মারে, নোটিশ মার দিখি।

রমেন খাকি হাত ব্যাগ থেকে দশ ইঞ্চি বাই ইঞ্চি টিনের বোর্ড বের করে। কালো জমিনের বোর্ড। উপরে তিনটে সিংহের মুখ, শাদা রঙে লেখা।

প্রপার্টি অফ কলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন।

গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া।

পেরেক মেরে বোর্ডটা দেওয়ালে সেঁটে দেয়। জোরে জোরে ঘা পড়ে। বুকটায় বড্ড লাগে।—কবে যেতে হবে বল দিখি বাপু?

—সাত দিনের মধ্যে।

হাতুড়ি ঠুকে শেষ পেরেকটা মেরে দেয়। কখানা ইংরেজি অক্ষরের জোরে এত ঝড়ঝাপটা কষ্ট দুঃখের মধ্যে টিকিয়ে রাখা আশ্রয়টুকু এক্ষুনি ফ্রি-ট্রেড জোনের দখলি সম্পত্তি হয়ে গেল।

ঝুমরি ছুটছে। বাসি চুল আলগা হাওয়ায় উড়ছে। উড়ন্ত আঁচল যতবার বাগে আনে, আবার খসে গিয়ে বার বার বে-আব্রু হয়ে যায়। খেয়াল হলেও আঁচল ঢেকে চেঁচায়—, ওই ওই যে ওরা ভাঙতে এসেছে।

একটানা প্রলম্বিত বিপদ ঘোষণার মত শোনায় ঝুমরির গলার আওয়াজে। বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে বউরা মায়েরা ঘর ছেড়ে উঠোনে সদরে বেরিয়ে আসে।

ঝুমরির এমন পাগলামির মত চিৎকারে, বেহায়ার মত দৌড়ে, সকলের বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ আশঙ্কা উশকে দেয়।

ছুটতে ছুটতে একেবারে দাওয়ায় উঠে আসে। হাঁই ফাঁই দম টেনে বলে,—মাসি হরিদা কই গো?

মাসি অবাক হয়ে উত্তর দিতে ভুলে যায়।

—ডেকে দাও না।

—থাকলে্তো।

—কোথায় গেছে?

—ফিটার জোনে।

—ফিটার জোনে, না যমে।

—বুড়ি ঝাঁঝিয়ে ওঠে,—মুখ সামলে রে ছেনাল মাগি।

—বিশ্বাস যাও মাসি, তুলতে এ্যায়চে।

—সে কিরে? শেতলবেড়ের লোকেরা উঠেছে?

তখন নিম গাছটার পাতা দুলিয়ে হাওয়া। উঠোন বেয়ে দাওয়ার দিকে যায়। বড় বড় হাঁ করে দম নেয়। একটু জিরিয়ে বলে,—না গো মাসি।

—তবে যে দিনরাত শুনি ওরা আগে হাইল্যাণ্ডে যাবে। ওরা ফিটার জোনের গায়ের কাছে—

—আর পরে···। মাকে দেখছ—

মাডগার্ড চাকায় ঝন ঝন বাজনা। বিছোনো ইট সরে ধসে পথ বেহাল। স্বপন প্যাসেঞ্জার বাস মোড়ে খালি করে ফিরেছে। এখন হরিপদকে নিয়ে চালিয়ে যেতে হিমশিম। মাঝে মাঝে কোমরে খিল লাগে হরিপদর। কোণ মোচড় ঘুরতেই চোখে পড়ে অফিসের লোকজন। হরিপদ ভ্যানওলা স্বপন ছেলেটাকে বলল—এই থাম ত।

কাচানো শাদা পা-জামা গায়ে বড় পকেটের হাওয়াই শার্ট। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। খুব জোরে হাঁটে হরিপদ। বুড়ির ঘর ডান দিকে। বাঁকা কোমর সোজা করে পেরেক সাঁটা নতুন চকচকে নোটিশ বোর্ডটায় হাত বুলোয়। ঘোলাটে চোখে দেখে, আবার হাত বুলোয়।

হরিপদ থমকে দাঁড়ায়। জিনিশটা···কোত্থেকে এল···! কারা মারল! সকালে ত ছিল নি!

দু-পা এগিয়ে যায়। বুকের মধ্যে নড়ে ওঠে! সরকারি ছাপ আঁকা নোটিশ। উত্তেজনায় শিরা দপদপিয়ে ওঠে দু-রগে। চেনা বর্ণমালাগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে সব ইন্দ্রিয় ঢেলে দেয়। তলার গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া—একদম এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যেন খেজুরকাঁটা। বুকটায় কণ্ট।

ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে আসে হরিপদ। বুড়িটা তখনও ঘোলাটে চোখে চেয়ে চেয়ে বর্ণগুলো দেখে।

তিন চারজন দাঁড়িয়ে সৃষ্টিধরের উঠোনে। রমেন হাতুড়ি পেরেক নিয়ে অশোকস্তম্ভ আঁকা কালো নোটিশ বোর্ডটা মেরে দিচ্ছে সৃষ্টিধরের দেওয়ালে।

হরিপদ এগিয়ে যায়। খাতা ফাইল হাতে বড়বাবুকে বলে,—আচ্ছা আমাদের ক্ষতিপূরণের টাকা?

—কিসের ক্ষতিপূরণ?

—বাহ্। শীতলবেড়ের লোকরা পাবে, আমরা নয় কেন?

—তোমরা ত এ্যাকোয়ার্ড ল্যাণ্ডে জবরদখলি। হাইল্যাণ্ডে জায়গা পাবে, তাই কত না—

—সে কি ঘরদোর বাঁধব কি করে···

গোটা কাকালমেঘ দাঁড়িয়ে পড়েছে হরিপদর পেছনে। উসকো চুলে ঝুমরিটা কেমন বে-মানান মেয়েছেলে। খালিগায়ে বাচ্চাগুলো অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। খাটো কাপড়ে বউ বুড়িরা হাঁ করে কথা শোনে।

বড়বাবু একবার ভাল করে পিছন ফিরে দেখে। মুহূর্তে গোটা গ্রাম ঝেঁটিয়ে এসেছে। অতগুলো বুড়ির চোখে মুখে এতদিনের বসবাসের মায়াটান নয়, শুধু নতুন করে বাস শুরু করার রসদ পুঁজির জন্যে ব্যাকুলতা। আর কথা টানতে ভাল লাগে না। হরিপদকে বলে,—ওই ওই যে ফরসা লম্বা বাবু, ওই সাহেবকে ধরুন গিয়ে।

চকচকে বুট জুতো, ওলটানো বড় বড় চুলে সাহেব, তাকে ঘিরে গ্রামের লোকজন দাঁড়িয়ে। হরিপদ বলল,—সার। সব ভেঙে চুরে নিয়ে হাইল্যাণ্ডে যাব, কিন্তু ঘর দোর বাঁধার পয়সা কই সার—

সাহেব ভিড়টার নাড়ি বুঝতে চেষ্টা করে। হালকা স্বরে বলে,—দেওয়ার ত কথা নয়। গরমেণ্টের জায়গায় ঘর বেঁধে আছেন আপনারা। তবুও বাঁশ কাঠামোর জন্যে বেশ কিছু টাকা পাবেন আপনারা—

সেটা পাবো কবে সার?

—আমাদের সব রেডি। আপনারা হাইল্যাণ্ডে চলে যান? ওখানে নামে নামে চেক দিয়ে দেবে, ব্যাঙ্কে টাকা পাবেন।

প্রায় সকলেই এক সঙ্গে এক গলায় বলে,—এখন সংসারটা নে-গিয়ে গুছোই কেমন করে—

আঁচলটা কোমরে গুঁজতেই বুকটা আঁটো সাঁটো। ভিড়টা ঠেলে সামনে মুখ খোলে ঝুমরি, স্যার। হুট বলতে সব টেনে হাইল্যাণ্ডে যাওয়া যায়? একটা কুটুমবাড়ি যেতে গেলে একদিন গুছোতেও সময় লাগে। লাগে নে?

মেয়েটার ফরসা নাক মুখ, অমন ডাঁটো চেহারা, ফস করে সাহেব বলে ফেলে,—ঠিকই বলেছ। মনে মনে ভাবে, তুমি বলা ঠিক হবে। পরক্ষণে কথার রশি ধরে রাখে, কিন্তু উপরের অর্ডার যে। সাত দিনের মধ্যে কাঁকাল মেঘ খালি করে দিতে হবে।

হরিপদ গোঁয়ারে গলায় বলে, সার যদি আমরা যেতে না চাই—সাহেব হাসে। হাসি থামিয়ে বলে,—যাবেন না কেন? যেতে হবে—কত বড় প্রোগাম এখানে। নতুন রাস্তা হবে, এটাও একটা সেকটার হবে যে—

তবু যদি না যাই?

গোটা গ্রাম জব্বর প্রশ্নে নাড়া দেয়। ঠিকই ত। সাহেবের চোখ মুখ পালটে যায়। গম্ভীর স্বরে বললো, পুলিশ, পুলিশ আসবে একেবারে রিজার্ভড ফোর্স—

ভিড়টা আমূল টাল খায়।

হরিপদ দু-চোখে সাহেবকে দেখে। পাশে ঝুমরি, আঁটো সাঁটো বুক দ্রুত ওঠা নামা করে। বুকের ভিতর ঢিপ্ ঢিপ্ বাজনা।

বড়দের মুখ চোখ বাচ্চারা টের পায়। তারা দৌড়য় কালো শাদার নোটিশ বোর্ড মারা দেখতে।

হরিপদ নিম গাছের ছায়া মাড়িয়ে দাওয়ায় ওঠে। দোর গোড়ায় থমকে দাঁড়ায়, যেন সমস্ত পৃথিবী কেঁপে উঠে জানিয়ে দিচ্ছে,—এটা আর প্রবেশ পথ নয়। আর আশ্রয় নয়।

বড় হাতুড়ির প্রথম ঘা ওয়াহেদ ছাদের কোণায় মারতেই ভয়ংকর শব্দ করে কংক্রিট গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে নিচে। অমন গাট্টাগোট্টা মানুষটার চওড়া ছাতির হাড়গোড় ঠোকাঠুকি লাগে চামড়ার ভিতরে।

উপরে আকাশ। দু-হাতে রোদ ঢালছে আগুনের গোলকটা। গাছপালায় পাখি-পক্ষী বাসা ছেড়ে পালিয়ে যায় শব্দ কম্পনের আরও বাইরে। ওয়াহেদ বোট বোঝাই ধানের কিস্তি আনত চেতলার বাবুদের ধান কলে। তুঁষে চালে মিশিয়ে চালান দিলে বস্তা বস্তা টাকা। বোট ভরতি ইট এসেছিল বজবজ আখড়ার ইটভাটা থেকে, ভালো জাতের মিঠে মাটির ইট। মাপ জোকে ধরতে পারে নি, ঘরটা খিড়কির পুকুরটা কাঁকালমেঘের কোলে আর বাঁশ বাগান, নারকেল ঘেরি আম জাম বাঁশ বাগান শীতলবেড়ের মৌজাধীন। সেটা এতদিন কোনো বিপত্তির কারণ হয় নি। হল এই ঘরটা। শাদা চুনমারা দেওয়াল, দরজা জানালার কাঠে শালিমারের আশমানি রঙের কোটিং, রাস্তা থেকে দাওয়ার পৈঠে অব্দি জুতো পায়ে চলে যাওয়ার জন্যে খোয়া বিছানো রাস্তা।

কপাল ঝুঁঝিয়ে ঘাম, বুকের রোমে সাদা চপচপে নোনতা ঝারানি, হাতুড়ির ঘাটা জোরে তুলে ওয়াহেদ বাগে আনে, একটু আসতে মারতে হবে যে, ইট ভেঙে গেলে যে সব বরবাদ। তবু যেকটা আস্ত থাকে। মাত্র দু-দিন বাকি, ইট কাঠ বইতে হবে হাইল্যাণ্ডে। অন্তত বিশ্বেস জাগুক মাল বওয়া-ছওয়া হচ্ছে। হাত ফসকায়। হাতুড়িটা ছাদের পড়ে দমাস শব্দে।

প্রধান উপপ্রধান পঞ্চায়েত সভাপতি হেঁটে হেঁটে গ্রাম চষে। সঙ্গে হরিপদ, সৃষ্টিধরেরা। প্রধান বলল, কি আর করবি হরিপদ, আজ না হয় কাল যেতেই যখন হবে, চলে যা তাড়াতাড়ি। আকাশ ভালো আছে খুঁটি খাঁটা গাড় নতুন জায়গায়। সৃষ্টিধর বাধা দেয়,—কিন্তু···

—থাম না। ফ্রি-ট্রেড কমিটির মেম্বার হিসেবে যদি বি ডি ও-কে বলে দু-একটা তেরপোলিন যোগাড় করে দিতে পারি—

সৃষ্টিধর অবাক। তেরপোলিন···

—আরে পলিথিনের জিনিশ। একবার চালে চাপালে একটা বর্ষা কাটাতে পারবি, বলতে পেরে সভাপতি দম ফেলে। একটু তৃপ্তি পায়।

সৃষ্টিধরের চোখের মণি জুড়ে আশা।

হরিপদ পাশে হাঁটতে হাঁটতে শোনে। তেমনি টাকরি মেরে ঘাড় তোলে না। মিইয়ে যায় নিজের মধ্যে।

প্রধান বলল,—দাঁড়া রিলিফের কতটা কী আছে একবার দেখি। না হলে অর্ডার করে ঘর-পিছু কেজি আষ্টেক চাল গম দিতে পারি কি। অন্তত ঘর বাঁধাবাঁধি কটা দিন পেটের চিন্তা কাটবে—

দু-ম্-মস্ শব্দে সারা আকাশ যেন ভেঙে পড়ল তাদের সামনে। বড্ড জোরে হাতুড়ির ঘাটা পড়েছে দেওয়ালে। পাঁচটা একটা ভাগের বালি মশলায় জমাট দেওয়াল। ছেলেপুলে নাতিনাতনির আমল নিরাপদে কাটুক, এ আশায় তৈরি।

এক ঘাতেই ফাট নিল অনেকখানি।

প্রধান সভাপতি সরে দাঁড়ায়। হরিপদ হাঁ করে দেখে।

প্রধান সভাপতি বাবুরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় অনেকটা। হরিপদ যায় না। তখনও হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ঠায়। ওয়াহেদ সাহেবের কবজির জোর দেখে, আর ভাবে···, নিশ্চিন্ত নিরাপদ বলে সত্যি কি কিছু আছে···।

ওয়াহেদ সাহেবের বুড়ি মা একটা দুটো করে ছড়ানো ইট জমা করছে

রাস্তার ধারে বাদায়। সঙ্গে নাতি নাতনিরাও। ভ্যান রিকশায় টেনে নিয়ে যাবে হাইল্যাণ্ডে। আট শতক জায়গা দিয়েছে গরমেণ্ট। বুড়িমা বারবার বলে,—আমার বড় উঠোনের এক কোণও নয়। একদম পা ফেলা, কাপড় শুকুতে দেওয়ার জায়গা নেই।

হরিপদ হাঁটা ধরে।

ওয়াহেদের পুকুরপাড় ধারে একটু ভেতর বাগের রাস্তা। বাঁশ গাছ নুয়ে পড়েছে রাস্তার ফাঁকা দিকটায়। শুকনো পাতায় খড়খড় শব্দ।

অঘোর খুড়ো চালের মটকায় বসে খড় ছাড়িয়ে আটি বেঁধে বেঁধে ছুঁড়ে দিচ্ছে ছেলের হাতে। ছেলেটা একটু তড়বড় করতেই ভীষণ দাবড়ি দেয়,—ভাঙবি বাখারিগুলো ?

গোটা ছাউনি চালটা ধরে নিয়ে যেতে পারলে চারটে খুঁটিতেই ঘর খাটাতে পারবে—

হরিপদ পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে কথাগুলো শুনল। একবার দাঁড়িয়ে বলল,—সব গুছিয়ে ফেলালে ?

—না। বোধ হয় আজ দিনটাও যাবে।

আর একটু এগিয়ে যায় হরিপদ। বোটের মিস্ত্রির যোগাড়ে কাজ করে ধুলোপদ। কথায় কথায় বলে, দুব করাতি চালিয়ে। চাপ চাপ মাটি বসিয়ে মোটা দেওয়ালের ঘরটা ধুলোপদর। ছাউনি চালা কিছু নেই। দরজা জানলার চৌবন্দী কপাট গবরাট—সব কুপিয়ে কুপিয়ে তুলে নিয়ে একেবারে ফাঁকা। শুধু দেওয়াল কটা ঠ্যাং মাথা ছরকুটে দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ালের গায়ে অশোক স্তম্ভ আঁকা কালো শাদায় 'প্রপার্টি অফ ফলতা এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন' বোর্ডটা শেষবেলার রোদে ভীষণ রকম ঠিকরোচ্ছে।

হরিপদ আঁতকে দাঁড়ায়।

একদিনেই ঘরটা এত ভূতুড়ে। জানালার খোপে হাওয়া বাজে সোঁ সোঁ।

সামনে বুড়ি ঠাকমা লাঠি ঠুকে ঠুকে যতটা পারে এগয়। পিছনে খালি গায়ে নাতিরা রং-চটা ফ্রকে নাত্নি মাথায় বিছানা কাঁথা থালা বাটির আণ্ডিল ছেঁড়া চটে বেঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে হাইল্যাণ্ডে ঠাঁই গাড়তে। মুখে কল কল কথাবার্তা। পিছনে এক বছুরে কটা সুপুরি চারা, দু-খানা কলা গাছের তেড় মাথায় বড় নাতিটা বয়সী লোকের মত কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে এগিয়ে যায়। বাচ্চাগুলো বলে,—হরিকা যাবে নে— ?

সাড়া দিতে ভুলে যায় হরিপদ। বাচ্চাগুলোকে চলে যেতে দেখে। দেখতে দেখতে আচমকা দৃশ্যটা মনে পড়ে।

···ছেলেবেলায় বাবা গুনোপদর সঙ্গে গরম জিলিপির লোভে গুড়গুড় করে হাঁটছিল। কলতার বাজার আর কতদূর। এক লরি মানুষ নেমেছিল কেল্লার গড়পাড়ে। ঠিক এমন করে বাচ্চাকাচ্চার মাথায় কোলে-কাঁখে থালা বাটি বিছানা কাঁথা, হাঁড়ি-কুড়ি। সঙ্গের লোকজন ছেলে ছোকরাদের বিষাদ ক্লান্ত মুখ। একটু দ্রুত হেঁটে চলেছিল মানুষগুলো! জল চলাচলের চওড়া পোল ধরে একেবারে কেল্লার ফাটকের দিকে। জঙ্গুলে জায়গাটা হাওয়ায় দুলছিল। গড়ের জলে হাঁড়ি-কুড়ির ছায়া। কেল্লার টাওয়ারে তখন দিন রাত আলো জ্বলত··জাহাজ নিশানা পেত। দলের পিছু হাঁটা বুড়িটার বয়সী চোখে ঝিকমিক আলো···দীর্ঘ দেশান্তরের পর একটুক মাটির ভরসা।

সেই বুড়িটার সঙ্গে ঠুক ঠুক লাঠির শব্দে সামনে চলন্ত বুড়িটার কোথায় যেন গোলমাল করে ফেলে। ভাবতে ভাবতে স্মৃতির পলি ঘুলিয়ে কেমন কাদা জল। শুধু বুকের মধ্যে ঢেল ছোবল মারে, তফাতটা কোথায় এখন কলোনি পার্টির সঙ্গে···।

একলা দাঁড়িয়ে গাছপালার ছায়ায় পুড়তে থাকে হরিপদ। দহনে আগুন আংরা। ধিক্কারে কালি হয়ে যায় তার মুখ।

দরজা খুলে দাঁড়াতেই হরিপদ অবাক! পোঁটলা-পুঁটলি হাতে-কাঁখে ঝুমরি।

—তুই! এত রাতে···!

—আমাদের কাছাকাছি সব ঘর ফাঁকা। বড্ড ভয় করছিল—

ঝুমরির মায়ের হাতে বস্তায় বাঁধা বিছানা কাঁথা আরও কত কী। হরিপদর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় ঝুমরির মা। ফিসফিসিয়ে বলে,—ছাগল কটা ঘরে তুলে চাবি দিয়ে এসেছি। সকাল হতেই একবার দেখতে যাব—হরিপদ কোনো কৌতূহল দেখায় না।

চুপচাপ বসে থাকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। ঝুমরি ঝুমরির মা বসে আছে আর এক কোণে।

খুব আস্তে, পায়ে পায়ে এ ঘরে ঢোকে হরিপদর মা। হরিপদর গায়ের কাছে দেওয়াল ঠেসে বসে। চারজনের মধ্যিখানে বাতিটা জ্বলছে খুব চুপচাপ। দম কমিয়ে দেয় হরিপদ। ঝুপসি অন্ধকার ঘন হয়। কেউ কারও মুখ স্পষ্ট দেখতে পায় না। চারজন যেন কোণের মানুষ।

যখন প্রথম কাকটা ডাকল, হরিপদ চমকে ওঠে! তড়বড় করে বেরিয়ে আসে। দাওয়া পেরিয়ে উঠোনে দাঁড়ায়। রাতটা এখনও মুছে যায় নি শুধু পাতলা পরদার মত ঘিরে আছে চারদিক। মাথার উপর আকাশ, ঝিকমিক করছে নক্ষত্র বিশাল মহাকাশ জুড়ে।

ঝুমরি পাশে এসে দাঁড়ায়। আবছা আঁধার কেটে অচেনা গলায় বলে—, কাল এক টেম্পো তেরপল এসেছে।

হরিপদ ঘাড় ফেরায়। বোবা হয়ে শোনে।

—এবারে বেরবে হরিদা… ?

ভোর ফোটার আগে প্রথম কথা ফোটে হরিপদর—গেলেই হয়। ঝুমরি পেছন ফিরে দেখে, দাওয়ায় দাঁড়িয়ে মা হাতে থলে-পুঁটলি, হরিদার মা শুধু হাতে নির্বাক দাঁড়িয়ে।

—মাসি সব গোছানো আছে…।

—কদিন ধরেই ত গোছানো…

ওঘরে যায় হরিপদর মা। থালা বাটি মুড়ির কৌটো কন্ট্রোল ধরার বড় ব্যাগে ঠেসে ঠেসে ঢুকিয়েছে। জল খাওয়ার সিলভার ঘটিটা গলা বাড়িয়ে টলমল করে ব্যাগে। নামতে নামতে বলে,—তাই চল। সকাল হলে সৃষ্টি ধরেরা মটকা খুলতে আসবে। বাঁশ কাঠ বইবে ছইবে—

হরিপদ এগিয়ে যায়। দু-হাতে ব্যাগ থলে ধরে নেয়। হরিপদর মা বাতিটা নিভিয়ে ঘরের শিকল টেনে দেয়। এখন ঘরটা আশপাশে নিথর নিঃশব্দ পৃথিবীর সঙ্গে একাকার।

আঁচলের খুঁটটা গলায় বেড় দিয়ে হরিপদর মা দোর গোড়ায় কপাল ঠুকে গড় জানায়,—মা বসুমাতা গো অনেক দৌড়-ঝাঁপ করেছি তোমার গায়ে…শেষ কথাগুলো বলতে বলতে চোখ ভাসিয়ে জল আসে।

সামনে ঝুমরি, ঝুমরির মা, তারপর হরিপদ, পিছনে মা। শেষ রাতের উঠোনে চারখানা ছায়া। বিষণ্ণ ডালপালায় নিমগাছটা ঘন ছায়া জাল পেতেছে। হরিপদর পা আটকে যায়। মা বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে। দু-বাহু দিয়ে গাছটা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। উপচে উপচে খালি হয় নিজে। ধরা গলায় ডাকে,—হরি…

—উঁ

—হ্যাঁ রে এদিকটায় আসতে দেবে নে…

বাপের হাতে পোঁতা গাছটা যেন পৃথিবী হয়ে; চরাচর হয়ে, নির্বাক নিস্পন্দ দেখছে…তার আঁতের মানুষজন, সব কিছুকে।

—উঁচু দেওয়াল বাউণ্ডারি দিলে পুলিশ দারোয়ান থাকবে যে।

—তবে আর বেরবো নাই বা করলি…। হৃৎপিণ্ড নিংড়ে স্বরটা বেরোয়। চোখের কোণে জল।

—তাহলে…। বিপন্নতায় তলিয়ে যায় হরিপদ।

—থাক। দানা পাতায় বংশ নিয়ে বেঁচে থাকুক মানুষটা

নিমগাছটা ঘিরে ঘন ছায়া। নিশ্চুপ নৈঃশব্দ্যে সবাই এগয়। উত্তরের আকাশে চাপচাপ ফ্যাকাশে আলো। সোজা হাঁটলে স্লুইস খাল, খালের পাশে কেল্লা কলোনি। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ঝুমরি খুব আপন করে বলল—হরিদা, হাইল্যাণ্ডের মাটি খুব নতুন—হরিপদর কোনো সায় নেই।

কটা মানুষের পায়ের অবশ শব্দ। হরিপদর বুকের মধ্যে পিষে যায়। *নিজেকেই শোনায়—, আর একটা কলোনি হল এই ত! লোকে চেনাতে* বোঝাতে বলবে—ওই-ই হাইল্যাণ্ড কলোনির

ঝাঁকে ঝাঁকে কাক পাখির কলরব। পুবমুখো মানুষ চারজন। পাখি-গুলো ভোরের আভাসে বাসা ছাড়ে। মাথায় ডিঙিয়ে ডানা মেলে চলে শূন্যে, খাবারের খোঁজে।

হরিপদ হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে ভাবে,...সব ছেড়ে ছুড়ে ওখেনেই বা কেন। অন্য ঠিক কোথাও...

একটা মানুষের পায়ের শব্দ যেন হারিয়ে গেছে। ত্বরিতে পেছন ফেরে তিন জন। ছখানা চোখে বিদ্ধ করে আবছা ভোর ফুঁড়ে। ঝুমরি নিঃস্বের মত ডাক দিল,—হরিদা আ-সো—

নিত্য দেখা গাছপালা, প্রতিদিনের পথ, চেনা মাঠঘাট—ডাকটা একদম অচেনা।